বাড়ি-বদল

ও রি য়ে ণ্ট বু ক কো ম্পা নি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

॥ তৃতীয় সংস্করণ ॥
॥ বৈশাখ : ১৩৬৩ ॥

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিঃ
১২এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

বাড়ি-বদল

শ্রদ্ধেয় ভানুদাকে

সূচীপত্র

মা

জাম্বো জেটের মতোই, জাম্বো খাট। দোতলার ঘরের প্রায় আধখানা জুড়ে বুক পেতে রেখেছে। সেই খাটের আবার বাহার কত! চারপাশে সানমাইকার 'লেয়ার'। দুপাশে মাথার দিকে দুটো ফোকর। কাচ ফুঁড়ে দুধের মতো আলো ঠিকরোয়। শুধু একটি সুইচ টেপার মামলা। বিমান ছোট মতো একটা প্রেস করে সুমিতাকে বিয়ে করেছিল। প্রেস মানে, মেয়েটিকে পছন্দ হবার পর শ্বশুর মশাইয়ের 'পারমিশান' নিয়ে বিয়ের আগে বউকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছিল। আজকাল হচ্ছে এইরকম। নতুন নতুন এইসব নিয়ম চালু হয়েছে। এ যেন সেই নতুন জুতোর 'ট্রায়াল'। পরে বহু দূর যাবার আগে কাছাকাছি একটু ঘুরে বেড়ানো। ফোস্কাটোস্কা যা হবার হয়ে গেল। সয়ে গেল পায়ে। আড় ভেঙে গেল। পায়ের গঠন অনুসারে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ফিট। এবারে যেখানে যাবে যাও মহা ফুর্তিসে। বিমান সেইরকমই একটা কিছু করেছিল। ছাত্রজীবন থেকেই তার একটু প্রেমট্রেম করার ইচ্ছে হয়েছিল। সাহসে কুলোয়নি। ভেবেছিল সে এগোতে না পারলেও, কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে অপর পক্ষ থেকে। তেড়ে ব্যায়াম করে দেহটা বেশ ভালোই বাগিয়েছিল। মেয়েদের সামনে দম বন্ধ করে বুকটাকে আরও চওড়া করে ট্রাইসেপ, বাইসেপ দেখাতে দেখাতে চলে যেত। তাতে ঘোড়ার ডিম হত। কেউ ফিরেও তাকাত না। প্রেমপত্র লেখা তো দূরের কথা। কমান রুমের সামনে কাচ কদম গাছের তলায় নানা ডিজাইনের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে জটলা করত। হ্যাংলা 'ডিসপেপটিক' চেহারার ছেলেরাই প্রেমের বাজার 'ক্যাপচার' করে বসেছিল। চোখে সব পুরু কাঁচের চশমা। হজমের অসুখ। ছুকু ছুকু চা খায়। ন্যাকা ন্যাকা কথা বলে। তালব্য'শ'কে ডবল তালব্য করে উচ্চারণ করে। নাকী সুরে কবিতা কপচায়। মলিরেয়ার বোদলেয়ার প্রভৃতি। নিজের দেশের খবর তেমন রাখেই না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে না, বলে 'টাগোর'। এইসব কাটের ছেলেদেরই মেয়েরা বেশি পছন্দ করে। অম্বল, চোঁয়া ঢেঁকুর, হেডেক, লিভার,

হাল্কা কাশি, মাঝে মাঝে ছিঁৎ করে হ্যাঁচি, আমরা এমন ছেলে ভীষণ ভালবাসি। বিমানের প্রাণের বন্ধুরা বলেছিল, ব্যায়ামটা একটু বেশি হয়ে গেছে ভাই। এই শরীরে প্রেম পেতে হলে ইউ. এস এ-তে যেতে হবে। এ 'ফ্রেমে' এদেশে প্রেম হবে না। আমেরিকায় ওরা মানুষকে 'গাই' বলে। 'গুড গাই', 'ব্যাড গাই'। তুই বরং দাড়ি রেখে দেখ কি হয়। বিমান প্রথমে ফ্রেঞ্চকাট করল। ফ্রেঞ্চকাট মুখ মিলে না। কেমন যেন ডউরে কলার মোচার মতো হয়ে গেল মুখটা। চার-পাশ দিয়ে কামিয়ে দাড়িটাকে যখন বের করে আনত তখন মনে হত হবিষ্যি খাওয়া বিধবা। সে এক উল্টো উৎপত্তি হল। তখন বিমান চাপ দাড়ি রাখল। চাপদাড়িতে তাকে দেখতে হল হেমিংওয়ের মতো। বন্ধুরা বলল এ দেশে তোর আর প্রেম হবে না। তুই বিহারে যা। কোনও ভোজপুরি প্রেমিকা জোটে কিনা দেখ। বিমানের তখন থেকেই বেশ ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। ডন বৈঠক মারা শরীর। সাংঘাতিক ক্ষিদের জোর। সকালে আড়াইশো গ্রাম ছোলা মারে। মায়ের আদুরে ছেলে। রাতে একবাটি ক্ষীর 'রেগুলার' বরাদ্দ। যেই ব্যায়ামে ভাটা পড়ে, হু হু করে ভুঁড়ি বাড়ে। জামা ঠেলে বেরিয়ে আসে সামনে। মেয়েদের 'ম'ও জানে না বিমান। মেয়েরা ভুঁড়ি একেবারে সহ্য করতে পারে না। নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে, পেটটা যেন দশমাসের করে রেখেছে। চেহারার ছিরি দেখ। বিমানের ছাত্র 'জীবনটা' বেকার কেটে গেল। সহপাঠিনী সেবাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। ধারালো কাঠ কাঠ চেহারা। মোমের মতো গায়ের রঙ। যখন চোখ তুলে তাকাত মনে হত দূর সমুদ্রের নাবিক যেন লাইটহাউসের আলো দেখছে। সেবাকে সে একশোটা চিঠি লিখেছিল, সাহস করে একটাও হাতে ধরাতে পারেনি। সেবার বাবা ছিলেন ডি. এম.। ভয় হত, যদি হাত-কড়ি পরিয়ে ছেড়ে দেন। বিমান গ্রে সায়েবের এলিজি পড়েছিল, কত ফুল অলক্ষ্যে ফুটে নিভৃতে ঝরে যায়! আসলে প্রেম জিনিসটা সাহসী মানুষের 'সাবজেক্ট'। প্রেমিকার মুখোমুখি হতে হলে বাঘশিকারীর সাহস চাই। বিমান একটা বোম্বাই শরীর অর্জন করলেও ভীতু ছিল। ভীষণ ভীতু। সিনেমা হলে পাশের আসনের অপরিচিতা এক মহিলার হাতে অসাবধানে একবার হাত ঠেকিয়ে ফেলেছিল, একশোবার 'সরি' বলার পর মহিলা উত্যক্ত হয়ে বলেছিলেন, ডাকবো, টিকিটচেকারকে

ডাকবো, আপনি আমাকে 'টিজ' করছেন। বিমান আরও ভয় পেয়ে বলেছিল, মা কালীর দিব্যি, আমার কোনও বদ মতলব ছিল না। হাতটা সরাতে গিয়ে লেগে গেছে। মহিলা শেষে মহাবিরক্ত হয়ে বিমানের হাতে একটা চকোলেট দিয়ে বললেন, দয়া করে এটা মুখে ভরে ফেলুন। বিমান তখনও বলে চলেছে, বিশ্বাস করুন, আমার বাবা ছিলেন রেলের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই। বোধহয় বোঝাতে চেয়েছিল, হেডমাস্টার মশাইয়ের ছেলে জেনেশুনে অচেনা মহিলার হাতে অকারণে খোঁচা মারতে পারে না। ওদিকে সিনেমা বেশ কয়েক শো ফুট হড়কে গেছে। বিমানের ওপাশের ভদ্রলোক বিমানের বকবকানির উত্তরে বলে উঠলেন, তাতে আমার বাবার কি? চুপ করে বসবেন, না গলায় 'হাফ মুন' দোবো!

এই বিমান, দেড়েল বিমান ভাল চাকরিতে ঢুকেও প্রেস ভুলতে পারল না। জীবনের একটা অভাববোধ। জীবন্ত একটা মেয়ে, যার নিঃশ্বাস পড়ে, বুক ওঠানামা করে, তার পাশে পাশে ঘুরছে, বিয়ে করা বউ নয় কিন্তু! টাটকা একটা মেয়ে। তার সঙ্গে সিনেমায়। কাঁধে কাঁধ। হাতে হাত। ময়দানে গাছতলায় বসে মুক্তোর মতো দাঁতে কুটুসকুটুস করে সে ঘাস কাটছে, চাঁপার কলি আঙুলে ধরে। যখন উঠে আসছে মনে হচ্ছে কেউ যেন জায়গাটায় লনমোয়ার চালিয়ে গেছে। এক কেজি চিনেবাদামের খোলা পড়ে আছে। ঝরা শিশিরের মতো ঝরা প্রেম। সে সব কিছুই হল না। বুকভরা বেদনা। একমুখ দাড়ি। ভুঁড়ো একটা পেট। একগাদা টাকা মাইনে। বিমান ইঞ্জিনিয়ার। রোজ অফিস যায়। রোজ বাড়ি আসে। সেবা সেনকে স্বপ্নে দেখে। সেবা তিরিশ জন প্রেমিককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত। কেউ তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিত। কেউ তার মুখে আইসক্রিম পুরে দিত। কেউ তার সিল্কের শাড়ি বয়ে নিয়ে যেত শালকরের কাছে। সেই বৃত্তে বিমান ছিল না। অথচ বিমান সেবার খোঁপায় দেবার জন্যে ছাদে চন্দ্রমল্লিকা করেছিল।

পশ্চিমবাংলার বিয়ের বাজারে বেকারদেরও চাহিদা। পড়তে পায় না। হট কেক। বলে, বিয়ে করলেই ভাগ্য ফিরে যাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্রী টেনে আনে। চাকুরিরতা পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। দাবিশূন্য। পাত্র 'সমাজসেবী'। বারোয়ারি পুজো

চালায়। পাড়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত। পিতা সরকারী চাকুরে। উপরি আছে। সেই পশ্চিমবাংলায় কতদিন বিমান পাশবালিস সঙ্গী করে রাত কাটাতে পারে! বিমান অবশ্য হতাশায় ওই সময়ে আর একটু হলেই কবি হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েদের নিষ্ঠুরতায় প্রেমিক হতে না পারলেও, কবি হওয়া কে আটকায়! তার দাড়ি ছিল। এক নম্বর প্লাস পয়েন্ট। হাতের লেখা দুর্বোধ্য। দু' নম্বর পয়েন্ট। বাংলা সাধারণ বানানও তার ভুল হত। বাড়িতে 'র'-হবে না 'ড়', বসে বসে ভাবত। শেষে লিখত গৃহ। তিন নম্বর পয়েন্ট। জীবনের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে, তিন লাইন লিখে ফেলেছিল। যতদূরে যাও, কেউ না থাকুক, চটিই তোমার সঙ্গী হবে। চটিকে চটিও না। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলে, পকেটে রেখ কাঁটা পেরেক। হাতুড়ি কোথাও না কোথাও অবশ্যই পাবে। চটিকে চটিও না। জীবনসঙ্গী হবে।

বিমানের এক মাসি, তাঁর কাজই হল বিয়ে দিয়ে বেড়ানো। পুণ্য ব্রতও বলা চলে। বুড়ো বুড়ো ছেলেরা ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাঁর দু চক্ষের বিষ। এতে সব চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ক্ষয়া ক্ষয়া হয়ে যায়। ত্বকের চেকনাই কমে যায়। সেই মাসি তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের ডাগরডুগুর মেয়ের ছবি এনে বিমানকে বললেন, দেখ তো বুড়ো, মনে ধরে কিনা! বিমান চমকে উঠল, একেবারে সেবা সেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। চাঁছা, ছোলা চেহারা। সব ব্যাপারে নাক গলাবার মতো লম্বা একটা নাক। রাগী রাগী দুটো চোখ। দেখলেই মনে হচ্ছে, ফ্যাঁস করে ছোবল মারবে। পাতলা দুটো ঠোঁট। সামান্য লম্বাটে মুখ। যেন অভিমান করে আছে। এক কথায় বিমান কাত। মাসি ভাবস্থ বিমানকে বললেন, এখন একটু রোগার দিকেই আছে, তবে আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি, বিয়ের জল পড়ার তিন মাসের মধ্যেই মুটিয়ে যাবে। মোটার বংশ। যেমন মায়ের গতর, সেইরকম বাপের। একটু সাবধানে প্রতিপালন ক'রো। গাছের গোড়ায় বেশি সার ঢেলো না। ঘি, তেল, মিষ্টির দিকে একটু নজর রেখো। দেখবে, একেবারে মেমসায়েবের মতো ফিগার থাকবে। সকাল, বিকেল একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে। তেতো খাওয়াবে। বছরে একবার করে বায়ু পরিবর্তন। মোটা গদার মতো বউ আমার দু'চক্ষের বিষ। আজকাল

শুনছি আমেরিকায় মেয়েরা সব ডাম্বেল ভাঁজছে। তোমার বারবেল, ডাম্বেল দুইই আছে, কেবল একটা জাঙ্গিয়া কিনে দেবে। বিমানের মাসি চোখটাকে সামান্য তেরছা করলেন। নিঃসন্তান মহিলা। কথায় কথায় একটু আদিরসের দিকে যাবার প্রবণতা।

বিমান এক রবিবার মেয়ে দেখে এল। নেশা ধরে গেল চোখে। নীল ফিনফিনে শাড়ি। লম্বা কালো চুল। টানা টানা, ছলছলে চোখ। যেন সিনেমার নায়িকা, চোখে গ্লিসারিন দিয়েছে। হাত দুটো যেন শালুক ফুলের ডাঁটা। মেয়ে দেখার সময় বিমানের মাসি মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়ের মা-ও সুন্দরী : তবে গুঁজিয়া খেয়ে খেয়ে একটু মোটার দিকে চলে গেছেন। পৃথিবীতে তাঁর এখন একটিই দুর্বলতা, নিমাই মোদকের গুঁজিয়া। স্বামীর ফার্নিচার তৈরির কারখানা। বিশাল রোজগার। ঘুরছেন ফিরছেন আর হাত আড়াল করে মুখে টুপ করে একটা গুঁজিয়া ফেলে দিচ্ছেন। বিমানের মাসি যেন দূর থেকে নিজের আঁকা ছবির ক্যানভাস দেখাচ্ছেন। বিমানকে বললেন, কি, কেমন দেখছো ? কান দুটো দেখেছো ? এই দ্যাখ্যো, চুল সরিয়ে কান বের করলেন। টুলটুল দুল দুলছে। গজকর্ণ নয়। বুদ্ধকর্ণ। লতি দেখেছো ! প্রায় ছ'ইঞ্চি ঝুল। লতিটাই দেড় ইঞ্চি। ভারি সুলক্ষণ। এইরকম কান হলে মানুষ উদার হয়। তোমার আর কিছু দেখার আছে ? বিমান একটা আঙুল তুলে মাসিকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বললে, লাজুক লাজুক মুখে, দাঁত ! দাঁত দেখতে ইচ্ছে করছে। মাসি বললেন, তুমি কি ডেন্টিস্ট ? ও মেয়ে, একবার দাঁত খিঁচোও তো !

দেখে আসার তিন-চার দিন পরে বিমান একটা প্রেমপত্র লিখে বসল। সুমিতা অবাক। এমনও হয় নাকি। বিয়ের বাজারে বিমানের দর তখন ক্রমশই বাড়ছে। চাকরিতে তখন তার খুব সুনাম। ভিক্টোরিয়ার মাথার ওপরের পরী ঘোরাবার কমিটিতে তার নাম ঢুকেছে। মাইনে বাড়ছে হু হু করে। সুমিতার মা বললেন, শিগগির উত্তর লেখ, বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে। মাছটাকে চারে ভেড়া। ফসকে না যায়। সুমিতার মা এইভাবে অবশ্য বলেন নি ; তবে তাঁর মনের ভাবটা এইরকমই ছিল। বিমানের মতো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে একটা কম ভাগ্যের কথা। বিমানের বলতে গেলে কেউ নেই। একান্নবর্তী পরিবারে থাকে।

আরও তিন ভাই আছে। বিমানের বড়। তিন ভাইয়ের তিন হাঁড়ি। বিমানের ব্যবস্থা সেজোর সঙ্গে। সেজো বিমানের মতোই ভোলেভালে। কুচুটে নয়। সেজোর বউটা একটু পাগলি পাগলি। এই রাগছে, এই হাসছে। কোনও একসময় নাচত। সংসার এখন নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিমানের ঘরে এসে আপনমনে ঘুরে ঘুরে নাচে। বিমান তখন হয় তো কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং করছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সেজ বউদির দিকে। সেজ বউদি নাচতে নাচতে হঠাৎ একসময় পেছন থেকে বিমানের গলা জড়িয়ে ধরে আচমকা। বাচ্চা মেয়ের মতো বিমানের চওড়া পিঠে শরীর এলিয়ে দিয়ে দোল খেতে থাকে। বিমানের ড্রইং-এর বারোটা বেজে যায়। লাইন-ফাইন বেঁকেচুরে একাকার। সেজ বউদি কুটুস করে বিমানের কান কামড়ে দেয়। দাড়িতে গাল ঘষে আর বলে—কি সুরসুড়ি লাগছে গো, কি সুরসুড়ি! বিমানের পিতা চলে যাবার পর ভাইয়েরা মাকে সামনে রেখে বাড়িটা চারভাগ করে নিয়েছে। বিমান দোতলায় রাস্তার দিকের একটা বারান্দা ঘেরা ঘর পেয়েছে আর পেয়েছে ঠিক তার তলার ঘরটাও। ভাগটা এই ভাবেই হয়েছে। ভাইয়েদের মধ্যে এই নিয়ে কোনও খেয়োখেয়ি হয়নি। তিন বছর হল মা চলে গেছেন। ফাঁকা মাঠ। মরূদ্যান এই সেজ বউদি। গলাটি ভাল। রবীন্দ্রসংগীত করত। এখন গুনগুন করে। এমন একটি মুক্তপুরুষকে জামাই করা কম ভাগ্যের কথা! শীতের শুরুতেই শেষ করতে হবে। সুমিতার দুটো মারাত্মক ব্যামো আছে, টনসিল আর অ্যালার্জি। শীত বাড়ে টনসিল বাড়ে। খ্যাঁক খ্যাঁক ছাগুলে কাশি। যারা শোনে তাদের বিরক্তি ধরে যায়। অ্যালার্জিও শীত-অ্যালার্জি। ফর্সা শরীরে লাল লাল গুটি বেরোয়। পায়ের গোছে। হাতের তালুতে। পিঠে। চিড়বিড় করে চুলকোতে থাকে। যত চুলকোয়, তত লাল হয়। ও ওষুধবিষুধে তেমন কোন কাজ হয় না। চিকিৎসক বলেছেন, এ হল গিয়ে মেন্টাল কেস। এই বয়েসের মেয়েদের নানা ব্যাপার হয়। বিয়ে দিলেই দেখবেন সব ভিরকুটি চলে গেছে। সুমিতার মা ভাবেন, আমরাও তো এই বয়েস পেরিয়ে এসেছি! আমাদের কালে তো এইসব ছিল না।

বিমান একটা চিঠি পেল দিন-তিনেকের মধ্যে। মধুর আমন্ত্রণ। আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে! বাড়ির পিছনে একটা

ঝিল আছে। ঝিলে বক আসে। জলপিপি। মাছ ঘাই মারে। আম, জাম, লিচু গাছ আছে। কৃষ্ণচূড়া, কদম। বাবার ছিপ আছে, হুইল আছে। ইচ্ছে করলে মাছ ধরতে পারেন সারা দিন। সুমিতা সাধ্যমতো সাহিত্য করে করে চিঠি দিয়েছে। বিভূতিভূষণ তার প্রিয় সাহিত্যিক। চিঠিতে তাঁরই প্রভাব। আরও দুচার লাইন লেখার ইচ্ছে ছিল। লোডশেডিং হয়ে গেল। ল্যাম্পো জেবলে ইতি লিখে শুয়ে পড়ল।

বিয়ের আগেই বিমানের দরজা খুলে গেল। বিমান ঠিক গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে নয়। গুছিয়ে, বেংধেছেংদে কথা বলতে পারে না বলে কম কথা বলে। চিঠিটা পাবার পর বিমানের গলায় সুর এল। বাথরুমে জল পড়ছে বিমান গান গাইছে, তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হুংহুংহুং, হুং উংহু। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে তাকে চিঠি লিখেছে। সম্বোধনটা তেমন রোম্যান্টিক হয়নি। পাওনাদারের মতো—প্রিয় বিমানবাবু। ইতি সুমিতা, না লিখে ইতি তোমার সুমিতা লিখলে জিনিসটা আরও জমে যেত। যাক গে 'সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং।'

কলকাতায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের যতগুলি বিচরণ ভূমি আছে বিমান মনে মনে ঠিক করার চেষ্টা করল, ভূতঘাট, জগন্নাথঘাট। না, ও দুটো জায়গা প্রেমের স্পট নয়। ওখানে যত বেতো আর হাঁপানি রুগীর ভিড়। তেল মালিশ আর বুটপালিশঅলার ভিড়। ওই লাইনে আর একটা ঘাট আছে। কিছুতেই নাম মনে আসছে না। সেজ বউদিকেই শেষে জিজ্ঞেস করল, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। অ্যাডভাইসার। সেজ বউদি জীবনে একবারই প্রেম করেছিলেন। অতিশয় লুক্কায়িত ব্যাপার। কাক-পক্ষীও টের পাবার কথা নয়; কিন্তু সেজ বউদির মা ঠিক পেয়েছিলেন। সব মায়েরই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভয়ঙ্কর সজাগ। সিগারেট খাওয়া, প্রেম করা, স্বামীদের পরনারীতে গমন। সকলের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, যায় না মায়ের চোখে। সেজ বউদি তিন মাস গৃহবন্দী। আর সেজ বউদির বাবা পাগলের মতো ছেলের খোঁজ করতে করতে সেজদাকে ধরে ফেললেন। প্রেমের সমাধি তীরে সেজদা এখন হাবসী খোজা। বিমান ঘটনাটা জানে না, জীবনে জানতেও পারবে না। পারলে সেজদাকে সে বেল্লিক বলত।

সেজ বউদি বলে দিলেন, ভূতঘাট নয়, প্রিন্স অফ ওয়েলস ঘাট। ম্যান অফ ওয়ার জেটি। পানিঘাট। স্ট্যাণ্ড ব্যাঙ্ক রোড। নৌকো। বিমানের খুব ইচ্ছে, নির্জন জায়গায় শেষ সন্ধ্যায় বসে প্রেম করবে। প্রথমে আসবে ছিনতাই পার্টি। ফিল্মি কায়দায় মারামারি। মেরে একেবারে পাটপাট করে দেবে। বিমান মারামারি খুব সুন্দর পারে। একেবারে ছবির মতো। বংশগত গুণ। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এরপর একদিন পুলিসে ধরবে। সারারাত দুজনে লকআপে কাটাবে। কি রোম্যাণ্টিক ব্যাপার! প্রেম হো তো অ্যায়সা! কেলেঙ্কারি ছাড়া প্রেম জমে না। এই শ্রীকৃষ্ণের কেসটাই দেখ না। অবতার পুরুষ। অর্জুনের সারথি কাম অ্যাডভাইসার। অত বড় একটা গীতা গড়গড় করে আওড়ে দিলেন। হাঁ করে দেখিয়ে দিলেন গোটা বিশ্বটা তাঁর দাঁতে আটকে আছে চিউইং গামের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যদি রাধার মাকে, রাধার ননদকে বলতেন, দ্যাখো বাপু, রাধাকে আমি ভালবাসি। আর রাধাকে যদি বলতেন, যাও ডিভোর্স করে পুঁটলি পোঁটলা নিয়ে চলে এসো, তাহলে কিছু করার ছিল! তাহলে কে বাজাত বাঁশী! কে লিখত গীতগোবিন্দ! বৈষ্ণব পদকর্তাদের কি অবস্থা হত! কীর্তনীয়ারা কেমন করে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতেন, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা! রার পরে ধা, ধার পরে রা। ধারা, রাধা। লীলাখেলাই হল জীবন। একটু লুকোচুরি। কলঙ্ক, কেলেঙ্কারি।

বিমান একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সুমিতাকে পাশে বসিয়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াল। সুমিতাকে যত কাছে টানে সুমিতা ততই সরে যায় জানালার দিকে। শেষে বিমানকে বলতেই হল, প্রেমের একটা ব্যাকরণ আছে। গায়ে গা লাগিয়ে বসতে হয়। কাঁধে মাথা রাখতে হয়। বিপজ্জনক নানারকম কাণ্ড করতে হয়। সুমিতা বলেছিল, আপনার সঙ্গে আমার প্রেম! আমাদের তো বিয়ে হবে! প্রেমের কি আছে! প্রেম করলে মা ভীষণ রাগ করবে! বাবা জুতোপেটা! বিমান বলেছিল, আমি তো সেইটাই চাই। তোমাকে আগে জয় করব প্রেম দিয়ে রসিয়ে বিয়ে করে ঘরে সেট করে দোব। তুমি কি প্রেম ছাড়া ড্রাই বিয়ে করতে চাও। তুমি চাঁপ চাও না কোর্মা। আমি কোর্মা চাই। আমি প্রেমের ভিখারি, প্রেম বিলায় কে নদীয়ায়!

সুমিতা তখনই বুঝেছিল, নাট বল্টু ঢিলে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাকা মাথা হলেও ব্যবহারিক বুদ্ধিতে এক নম্বরের গবেট। আবার এও বুঝেছিল দেড়েলটাকে চরাতে সুবিধে হবে। ওঠ বললে ওঠ। বোস বললে বোস। মাঝে মাঝে আড়চোখে বিমানের দিকে তাকাচ্ছিল। সরল একটা মুখ। বেশ স্বাস্থ্যবান, তবে ওই দাড়ির জঙ্গলটাকে নামাতে হবে। লোমে, যে কোনও লোম জাতীয় জিনিসে সুমিতার অ্যালার্জি আছে। ভীষণ বেড়াল ভালবাসে; কিন্তু কোলে বেড়াল নেবার আগে পঁচিশ মিলিগ্রাম অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ট্যাবলেট খেতে হয়। তা বলে বিমানের গালে গাল ঘষার আগেও সেই একই জিনিস করতে হবে! সে তো সম্ভব নয়। দাড়ি আর গোঁফ দুটোকেই শেষ করতে হবে। মনে মনে বিমানকে সে ভালই বেসে ফেলল। এই সব ছেলে বেশ আন্তরিক হয়। জীবনে সুখ আর শান্তি দুটোই পাওয়া যায়। রেসকোর্সের কাছাকাছি সুমিতা নিজের ইচ্ছেতেই বেশ কিছুটা সরে এল বিমানের দিকে। আর বিমান ভয়ে সরতে চাইল তার দিকে। দরজায় সেঁটে গেল। সুমিতা বললে, কি হল! দরজা লক করা আছে তো! দেখবেন পড়ে যাবেন না। আপনার ভয় করছে?

—না মানে, আপনি সরে আসছেন তো!

—আপনি বলছেন আমাকে?

সুমিতা সাহসী মেয়ে। সাহস পেয়ে গেছে। একালের মেয়েরা বোকা-বোকা ছেলেদের চেয়ে একটু চালুই হয়। বিমান আমতা আমতা করে বললে—তুমি বললে আপনি যদি রেগে যান!

—সারা জীবন আপনি বলবেন?

—না, তা কেন! কাছাকাছি এলেই ফট করে একদিন তুমি বেরিয়ে আসবে।

—যেমন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়!

—বাঃ, আপনি কবি!

—তিরিশটা কবিতা বেরিয়েছে। বড় পত্রিকাতেও বেরিয়েছে।

—কি হবে! আমার যে কিছুই বেরোয়নি!

—আপনার হাত থেকে ব্রিজের নকশা বেরোবে। বেরোবে ড্যাম, রিজার্ভায়ার।

সুমিতা বিমানকে দরজার সঙ্গে চেপ্টে থাকতে দেখে হাত ধরে তার

দিকে টেনে আনল। বিমান কাঁপছে। মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। সুমিতা জিজ্ঞেস করলে—হল কি?

বিমান উত্তরে তিন চার বার ঢোঁক গেলার চেষ্টা করল। গলা শুকিয়ে কাঠ। বিমান বেশ বুঝতে পারল, ভূত আর নারী একধরনের জিনিস, অন্তত তার কাছে। শেষরাতে সোনারপুরে মামার বাড়িতে একবার মাঝরাতে ভূত দেখে তার এই অবস্থা হয়েছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে মেলেরিয়া রোগীর মতো।

সুমিতা বললে—জল খাবেন?

বিমান বললে—জ।

তারা ভিক্টোরিয়ার সামনে নেমে পড়ল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তারা যখন জলার ধারে পৌঁছল তখন বিমানের গলা ভিজে উঠেছে। সরোবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—কি সুন্দর!

বিমানের বিয়ে হয়ে গেল। সেজ বউদির ভীষণ ক্ষোভ, গালপাট্টা দাড়ির জন্যে লবঙ্গ দিয়ে সারা মুখে চন্দনের টিপ পরানো গেল না। সুমিতা জানত বাসরে বিমান তার গালের কাছে গাল আনবে; কারণ বিমানের ভয় ভেঙে গেছে। পঁচিশ মিলিগ্রাম অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ট্যাবলেট খেয়ে পিঁড়েতে বসেছিল। শুভদৃষ্টির সময় চাদরের তলায় আর চোখ খুলতে পারে না কিছুতেই। গোটাতিনেক হাই উঠে গেল বড় বড়। হাই জিনিসটা সংক্রামক! বিমানেরও সমসংখ্যক হাই উঠল। হাই তোলাতুলি করে দুজনে বেরিয়ে এল চাদরের তলা থেকে। তারপর, সুমিতা হাই তোলে, বিমান হাই তোলে, পুরোহিতমশাই হাই তোলেন, সম্প্রদান করতে বসে সুমিতার মামা হাই তোলেন। মামার চিরকালের অভ্যাস, শব্দ করে হাই তোলা। তিনি প্রতিটি হাইয়ের শেষে বলতে লাগলেন—আঃ বাবা, বাবা! মন্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে মন্দ শোনাল না। পুরোহিতমশাই আবার টুস্কি মারেন। খালি পেটে অ্যান্টি-অ্যালার্জিক। একসময় সুমিতার নাক ডাকতে লাগল। সবাই বললে, কখনও উপোস করেনি তো, মেয়ে আমাদের ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গো!

বিমানের সঙ্গে বাসর জাগল সুমিতার বান্ধবীরা। বিমান সারা রাত তাদের অ্যাঙ্গেল বোঝালো সেণ্টার অফ গ্র্যাভিটি বোঝালো। তাদের একটু আদিরসের দিকেই যাবার ইচ্ছে ছিল। বিমানের কোল

ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সুন্দরী সুমিতা। বুকের আঁচল সরে গেছে। লাল বেনারসীর ব্লাউজ। এক জোড়া লাল আপেল। বিমান বোকা হলেও ফলমূলে তার ভালই লাগে। সুমিতার বান্ধবীদের জন্যে ফলার করতে পারছে না। মন যত দুর্বল হচ্ছে, বিমান ততই চলে যাচ্ছে জটিলতর গণিতের দিকে। শেষে একটি মেয়ে বললে, আপনি কি অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না! পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, ইডেন-গার্ডেন!

বিমান বোকার মতো বলে বসল—যে সব পাহাড়ে সিঁড়ি থাকে, সেই সব পাহাড়ে আমি উঠতে পারি।

—পাহাড়ে কখনও হাত বুলিয়েছেন?

—না। আমি দূর থেকে পাহাড় দেখেছি। আমার ভাল লাগে সমুদ্র।

—সাঁতার জানেন?

—তা জানি।

—বেশ তাহলেই হবে। ডোবার ভয় তাহলে নেই। সুইমিং কস্টুম আছে?

—না ভাই।

—এবার তাহলে কিনতে হবে।

বিমানের মনে হয়েছিল, মেয়েগুলো সোজা ভাষায় কথা বলছে না। হেঁয়ালি করছে। কথার খোলসে অন্য কথা আছে। এইভাবেই রাত ভোর হল। সুমিতা সকালে উঠেই সোজাসুজি বললে—বাড়ি গিয়েই তোমাকে দাড়ি ফেলতে হবে; তা না হলে ফুলশয্যায় আমার হাঁপানির টান উঠবে।

—তোমার হাঁপানি আছে?

—অ্যালার্জি। কুকুর বেড়ালের লোমে, কম্বলে।

—আমাদের বাড়িতে বেড়াল কুকুর নেই।

—তুমি!

—আমি কি ওই শ্রেণীতে পড়ি?

—তোমার দাড়ি। দেখলে না অ্যান্টি-অ্যালার্জিক খেয়ে কাল আমার কি হল!

বিমান স্ত্রীর অনুরোধে সেইদিনই জঙ্গল সাফা করে ফেলল। প্রথমে

মনটা কেমন একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল। সেই ছাত্রজীবনের সঙ্গী। গালে চেপে ঘুরছিল। তারপর ভাবলে, দাড়ি তো আর এমনি রাখেনি। একটা কারণ ছিল। কাননে কুসুমকলি কেন? ভ্রমরা, বাহারি প্রজাপতি আকর্ষণ করার জন্যে। এ দাড়ি তো আর ধর্মীয় দাড়ি নয়। প্রেমের দাড়ি। প্রেমিকা লালশাড়ি পরে বসে আছে খাটে।

বিমানের সেজ বউদি তেমন খুশি হতে পারলেন না। বিমানের বিয়েটাকে তিনি ভাল মনে মেনে নিতে পারেন নি। প্রাণের বন্ধুটিকে বিসর্জন দিতে হল। ছেলেগুলো এত গবেট, পরিষ্কার করে বলে না দিলে মেয়েদের মনের কথা পড়তেই পারে না। একেবারে নিরক্ষর। প্রেমে একটু পরকীয়া, সামান্য লুকোচুরি, অল্প একটু পাপের ছোঁয়া না থাকলে হয়! দরজা বন্ধ করলুম, খাটে গিয়ে শুলুম, আলো নেবালুম, বউকে জড়িয়ে ধরলুম। এর মধ্যে কোনও ইয়ে আছে! প্রায় অফিস যাওয়ার মতো, আরও ভাল উপমা বাথরুমে যাওয়ার মতো। সেই আলো নেবা, বর্ষার ঝোড়ো সন্ধ্যা জীবনে আসবে না। সেই দাড়িতে গাল ঘষা। বিমানের ভয়, সেজদা দেখে ফেললে একেবারে বেইজ্জত হয়ে যাবে বউদি। বিমান তাকে বলত, তরুণী ইরানী বালা। রোজগেরে ছেলে বিয়ে করেছে বেশ করেছে। তা বলে বউয়ের কথায় দাড়ি বিসর্জন! এক রাতেই বউয়ের ভেড়া বনে গেল। অবশ্য ছেলেটা একটু ভেড়াটে মার্কাই ছিল। ভেড়াটে মার্কা ছিল বলেই ভালো লাগত। যা খুশি তাই করানো যেত।

সেজ বউদি দাড়িবর্জিত বিমানকে দেখে বললেন, মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। তোমার সর্বনাশ করে দিলে। ঠিক যেন মেনি বেড়ালটি। একেই তোমার দেহের তুলনায় মুখটা একটু চোপসানো। মাথায় তুলছো তোলো, পরে সামাল দিতে পারবে তো! শোনো, প্রেমিকা এক জিনিস বউ আর এক জিনিস। প্রেমিকা থাকে বইয়ের পাতায়, আর বউ থাকে হিসেবের খাতায়।

সেজ বউদির কথায় বিমান একটু ঘাবড়ে গেল। বিমানের চোখে সেজ বউদি একজন আদর্শ মহিলা। সেজ বউদি তাকে মেয়েদের অন্তর্জগতের অনেক কিছু শিখিয়েছেন। সে সব বিস্ময়কর ব্যাপার। যত জানবে তত পাগল হবে।

বউভাতের রাতে বিমানের শ্বশুরমশাই জামাইকে চিনতে পারেন

না। তুমি কে ? তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের শুভ বিবাহ হয়েছিল ? কে একজন টিপ্পুনি কাটল, বিয়ে হচ্ছিল না বলে দাড়িটা মানসিক রেখেছিল, বিয়ে করেই দেবীর চরণে।

সুমিতার বাবা সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলেন। বুঝলেন, কাজের বাড়িতে কিছু ফচকে ছোঁড়ার আমদানি হয়েছে। বিমান কিছুই চায়নি, তবু ব্যবসাদার শ্বশুরমশাই দিয়েছেন অনেক। এক তো খাটেতেই ফাটিয়ে দিয়েছেন। বিমানের ঘরে পাতা রয়েছে, মনে হচ্ছে, এখুনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ এসে এক গেলাস জল খেয়ে দুর্গা বলে শুয়ে পড়বেন। কিছু পরেই গিন্নি আসবেন মুখে পান দোক্তা। সাধারণত কর্তারাই আগে আসেন। নিদ্রা যখন মধুর আমেজে সারা শরীর প্রায় ঘিরে ধরেছে তখন গৃহিণী আসেন খাট কাঁপিয়ে। শয়নের প্রাক্কালে শেষ ভূমিকম্প। কারণ রাতের মতো কোম্পানি ক্লোজ হচ্ছে। এসেই কর্তাকে এক খোঁচা মেরে বলেন—সরে শোও। কি বিশ্রী শোয়া ! যত দিন যাচ্ছে তত যেন কচি খোকাটি হচ্ছেন। পাশ ফেরো, নাক তো প্রায় ডাকতে শুরু করেছে। নাক নয় তো কামান। দিবসের শেষ তোপটি দেগে তিনি মশারি গোঁজা শুরু করেন। বাঘের মতো হামা দিয়ে দিয়ে। বাজে কোম্পানির খাট হলে জাহাজের মতো দুলতে থাকে। রোলিং, পিচিং দুটোই অনুভব করা যায়। যেন, এম· ভি· রত্নগিরি ভারত মহাসাগরের ভয়ংকর টেন ডিগ্রি চ্যানেলে ঢুকেছে। শ্রীপঞ্চম জর্জ তখন ঘুমজড়ানো গলায় বলতে থাকেন, শ্রীরাধিকে এলে ?

সুমিতার বাবার এই অভিজ্ঞতা আছে। তিনি তাই স্পেস্যাল খাট দিয়েছেন। দুপাশের দুই ঘুলঘুলি দিয়ে আলো বেরোচ্ছে। ভেতরে আবার ইলেকট্রনিক সিসটেম ভরা। বোতাম টিপলেই মিউজিক। পেয়ার আ রাহা হই, মেরা পেয়ার। খাট আবার সকালে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘুম থেকে তুলে দেবে। ওঠো শিশু, মুখ ধোও ! পরো নিজ বেশ। শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই হলেও এখাট নড়বে না। সবাই খাট দেখতে লাগলেন আর বিমানের শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কোথা থেকে পেলেন এমন আইডিয়া ? একেবারে জাপানী ব্যাপার।

এই খাটেই বিমানের সংসার বড় হল। বিমানের ছেলের আগমন হল। একটি কেন একসঙ্গে চারটি এলেও খাটে জায়গা পড়ে থাকত। চারটে দেয়াল তুলে দিলে আর একটা ঘর। অতিথি এসেই কিঞ্চিৎ

খেলা দেখালেন। সুমিতার স্বভাবটি ততদিনে স্পষ্ট হয়েছে। বউরা সব জল রঙে আঁকা ছবি। না শুকোলে জ্বলজ্বলে হয় না। সুমিতা খুবই ভাল মেয়ে, তবে একটু রাগী। রাগলে চিৎকার-টিৎকার করে না, গুম মেরে যায়। কথার কনস্টিপেশান। আর তখন সে মাত্রাতিরিক্ত কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলে। তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। তখন শরীরের তুলনায় গায়ের জোরও বেড়ে যায় সাংঘাতিক। যেমন, ভাগের বাড়ি, ঠিক আছে যে যার নিজের বিচরণভূমি ছিমছাম রাখবে। রাগত সুমিতা ঝাড়ু চালাতে চালাতে নিজেদের ঘর থেকে সেজ বউদির, সেজ থেকে মেজ, মেজ থেকে বড়তে গিয়ে ঠেকে গেল ; কারণ বাড়ি ফুরিয়ে গেছে। দেয়াল না থাকলে পাশের বাড়িতেই চলে যেত। আর সুমিতা কিসে যে রাগবে আর কিসে রাগবে না বলা কঠিন। কেউ একটার বেশি তিনটে হাঁচলে সুমি ফায়ার। একবারে কেউ কথা বুঝতে না পারলে সে দ্বিতীয়বার আর বলবে না রেগে গিয়ে। খেতে বসে জল চেয়েছে। হেঁচকি উঠছিল। কাজের মেয়েটি শুনতে পায়নি। কি বললে মা ? খাওয়া ছেড়ে উঠে গেল সুমিতা। বাঁ হাতে জল গড়াতে গেল। কলসী উল্টে এসে পড়ল পায়ে। সুমিতার সব ভাল ; কেবল একটু বেশি মেজাজী। মেজাজ যদি ভাল থাকে সুমিতা দেবী। মেজাজ খাট্টা থাকলে ধারেকাছে না যাওয়াই ভালো। রাগের স্বভাব হল, রাগ ভাঙাতে হয়। মিষ্টি মিষ্টি দু'চারটে কথা বলে একটু তোল্লাই দিয়ে দিলেই রাগ জল হয়ে যায়। স্নেহের উষ্ণতা। সুমিতার ক্ষেত্রে কেস উল্টো। যত সাধবে, যত বোঝাতে যাবে ততই তার জ্বলুনি বাড়বে। তাকে একা থাকতে দাও। সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে। হয় কয়েক ঘণ্টায়, না হয় কয়েক দিনে। এটাও কোনও নিয়মে পড়ে না। রাগে থাকার সময় তার অনশন। আর সেইসময় সে ঘড়িঘড়ি বিমানকে খেতে দেবে। তুমি খাচ্ছ না, আমিও খাব না, তা বলা চলবে না। তাতে রাগ আরও সাংঘাতিক বেড়ে যাবে। জোর করে মুখে ঠুসে দেবে। জামা খামচে ধরবে। মানে, তখন লোক জড়ো হয়ে যাবার দৃশ্য। সুমিতার সব ভালো, তবে একটু আড় বোঝা মেয়ে। যেমন, বিমান বলেছিল, খাটটা একটু মারোয়াড়ী টাইপ হয়ে গেছে। সুমিতা তার বাবাকে চিঠি লিখে বসল, তোমার জামাইয়ের খাট পছন্দ হয়নি। তোমার

মারোয়াড়ী টেস্ট। খাট নিয়ে যাও। এক জোড়া চৌকি পাঠিয়ে দাও। বিমান বলেছিল, তুমি যখন আস্তে কথা বলো, তোমার গলাটা খুব মিষ্টি শোনায়। সুমিতা বললে, তার মানে আমি যখন জোরে কথা বলি তখন মনে হয় গাধার গলা। বিমান বলেছিল, সেজ বউদির হাতের ডাল রান্না যে খেয়েছে, সে আর ভুলবে না। সুমিতা মাস-খানেক ডালই আর রাঁধল না। বিমান বলেছিল নিতম্ব না থাকলে সিল্কের শাড়ি মানায় না। সুমিতার গড়ন-পেটন খুবই ভাল। তবু সিল্কের শাড়ি সব বাকসোয় তোলা হয়ে গেল। বিমান বেচারা তাই এখন ভয়ে মরে। মাঝে মাঝে মনে হয় কথা বলছে বউয়ের সঙ্গে নয়, অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে।

ছেলেটা হবার পর সুমিতার রাগ আরও বেড়েছে। সে রাগের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। মেজ বউদি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলেটা কেন এত কাঁদে বলো তো! সুমিতা অমনি বললে, যেমন মা তার তেমনি ছেলেই হবে তো। অমনি চিঠি চলে গেল বাপের বাড়িতে। আমার ছেলে কাঁদুনে, বিশ্রী, থার্ড ক্লাস। এদের ঘুম চলে গেছে। আমাকে এসে নিয়ে যাও। চলে গেল বাপের বাড়ি। মেজ বউদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে খাঁচার পাখিকে বললেন, দেখিস, অত দেমাক সহ্য হলে হয়! বড়লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল।

বাপের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটির জণ্ডিস হয়ে গেল। যমে মানুষে টানাটানি। বিমানও একটু রেগে ছিল। সংসার এমন জায়গা—অহেতুকী প্রেম, সম্পর্ক টেঁকে না বেশি দিন। এটা ওটা সেটা নিয়ে লাগবেই লাগবে। এমন কি মশারির ভেতর মশা ঢুকেছে বলে দুজনে ফাটাফাটি হয়ে যেতে পারে। ছেলেবেলায় বিমান কথায় কথায় রেগে যেত। এমন রাগত যে সময় সময় কিছু না পেয়ে নিজেকেই নিজে খামচে রক্তারক্তি করত। কোনও কিছু চেয়ে না পেলে রাগে ক্ষোভে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কপালে তারকেশ্বরের আলু তৈরি করে ফেলতো। এক কবিরাজ এসে দেখেশুনে বললেন, বাবা, পিত্ত কুপিত। তিক্ত সেবন করাও। পরে এক ব্যায়ামবীর বললেন, বদহজমে এইরকম হচ্ছে। ডন-বৈঠক মার, বারবেল ভাঁজ। ব্যায়ামের ফলে বিমানের শরীর ফুলল, মেজাজ হয়ে গেল হিমশীতল। কোনও কারণেই বিমান রাগত না। সেই বিমান অভিমানে তিনদিন বউয়ের কোনও খবর

করেনি। এ কেমন মা! ছেলেটা একটু কাঁদুনে হয়েছে ঠিকই। তা মাকে তো সহ্য করতেই হবে। সুমিতার তো অদ্ভুত ব্যবহার! হলটা কি! দু'জনে পরিপাটি শুয়েছে। মাঝখানে শিশুটি। চোখ যেই বুজিয়েছি, প্রথমে শুরু হল খুঁতখুঁত, তারপর চিল-চিৎকার। জীবটি হাতখানেকও বোধহয় হবে না, কি সাংঘাতিক সাউন্ডবক্স! ইলেকট্রিক হর্নের মতো শব্দ ছাড়ে। সুমিতা উঁ উঁ করে যত থাবড়ায় ততই তার দাপট বাড়ে। শেষে, মরগে যা বলে উঠে পালায়। সোজা বারান্দায়। সেখানে একটা বেতের মোড়ায়। বসে গজগজ, হনুমান, বাঁদর, গাধা, জাম্বুবান। চিল্লেই যাচ্ছে, চিল্লেই যাচ্ছে। ইডিয়েট। বিমানের ঘাড়ে তখন সব দায়িত্ব। শেষে করলে কি! পরপর কয়েকদিন আর শুলোই না। কি হল! শোবে এসো। কি হবে শুয়ে। বারোটা বাজলেই তো সানাই শুরু হবে। তার চেয়ে বসে থাকাই ভালো। কান্নার ঠেলায় নিজেই ক্ষেপে যাচ্ছে অথচ মেজ বউদি বলাতেই দোষ! বিমান ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল। তিনি বললেন, কিছু কুকুর থাকে ঘেউঘেউয়ে। কিছু বাচ্চা থাকে কাঁদুনে। কি করা যাবে বলুন! বিমান এক জাপান-ফেরত ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করেছিল—কিছু বেরিয়েছে কিনা! যেমন ন্যাপি ভিজে গেলে পিঁক পিঁক সিগন্যাল শোনাবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেইরকম কোনও সাইলেন্সার। গলায় ফিট করে দেওয়া হল। কমে গেল কান্নার তেজ। না, সেরকম কিছু মার্কেটে আসেনি এখনও।

তিন দিনের দিন খবর এল, কেস সিরিয়াস। বিমানের মন আঁকুপাঁকু করছিলই। সব ফেলে দৌড়ল। ছেলেটাকে প্রায় ইঁদুরের মতো দেখতে হয়ে গেছে। সুমিতা উদ্‌ভ্রান্ত। বিমান জিজ্ঞেস করলে—কি যা-তা খাইয়েছিলে?

—চানাচুর।

সুমিতা বিমানের ওপর রেগেই ছিল। বোকার মতো প্রশ্নের রাগী উত্তর।

বিমান সামলে গেল। নিজের মনেই বললে—জল থেকে এসেছে।

—কি জল খাইয়েছিলে?

—খাবার জল।

বিমান এরপর আর না বলে পারল না—এ তোমার কি ধরনের

উত্তর দেবার ছিরি? খাওয়াবার সময় হাতটাত পরিষ্কার করো তো?

—না, তোমার ছেলেকে আমরা মারার তালে ছিলুম।

—তোমার মানে? ছেলে আমাদের দুজনের। যৌথ প্রচেষ্টা। যাই বলো, তোমরা একটু নোংরা আছ। নোংরামি ছাড়া এই অসুখ হতে পারে না। তুমি নিজের হাতে খাওয়াও?

—না, তোমার আর এক বউ এসে খাওয়ায়।

বিমান রেগে গেল। মুখে প্রকাশ করল না। উঠে পড়ল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে শান্ত করে ঘুরে দাঁড়াল।

—যে ভাবেই হোক এ-বাড়ির জল দূষিত হয়ে গেছে। আর থাকা চলবে না।

—আমি তা মনে করি না।

—আমি তাই মনে করি।

কিছুক্ষণ এই তর্জা চলল। শেষে বিমান নিজেই থেমে গেল। যে জিনিসটাকে সে সবচেয়ে ভয় করত, দাদা বউদির মাঝরাতের ঝগড়া, সেইটাই দেখা দিচ্ছে তার জীবনে। নকশাল আমলে সে একটা শব্দের সঙ্গে ভীষণ পরিচিত হয়েছিল—অ্যাকশান। দমাদ্দম বোমা, ধোঁয়া। ধোঁয়া কেটে গেল, তিনটে লাশ। অত কথার কি আছে!

বিমান সুমিতার দিকে তাকাল। মা হয়েছে। আরও সুন্দরী। বেশিক্ষণ তাকালে ভেড়াটা আবার বেরিয়ে আসবে। সন্ধি হয়ে যাবে এখনি। বিমান বেগে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেল বাজারের মোড়ে। বোকাসোকা এক ট্যাক্সিচালককে পেয়ে গেল। এক কথায় যেতে রাজি। গাড়ি নিয়ে ফিরে এল বিমান। সুমিতা না যাক, সে ফিরে যাবে ছেলেকে নিয়ে। সুমিতা মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল, কিন্তু নিজের পাড়ায় এলে তার হাবভাব অন্যরকম। সুমিতার সত্যিই তুলনা হয় না, তবে তার বাবাটা আর মাটা একেবারে ক্যালাস। অলসপ্রকৃতির। হেল্‌থ-হাইজিনের কোনও জ্ঞান নেই। তা না হলে মাংসর সঙ্গে কেউ পায়েস খায়! কেউ খায় এক সিটিং-এ এক কৌটো চানাচুর!

বিমান বললে—গাড়ি এনেছি চলো।

—আমি যাবো না।

—কারণ ?

—এই শরীরে এতটা দূর যেতে গেলে ছেলেটা মরে যাবে।

—এখানে থাকলে সারবে না।

—এখানে ভালো ডাক্তারই দেখছেন।

—আমি আরও ভালো ডাক্তার দেখাতে চাই।

—যা ভালো বোঝো করো।

সুমিতা রেগে বেরিয়ে গেল। বিমান একটু দোনামোনা করে, তোয়ালেসুদ্ধ ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে নিল। সেই বলে না, খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে। সুমিতার সেই অবস্থা। বাবা-মার জোরে লড়ছে। দেখা যাক। মা যদি মারাই যেত, তাহলে কি হত! বিমান নিজেকে ধমক দিল—না না, সে এ কি ভাবছে! মা মারা গেলে একটা ছেলের কি আর থাকে জীবনে! সুমিতার বাবা আর মা দুজনেই বাড়ি ছিলেন না। কর্তা-গিন্নি ওই রকমই। শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। সারাদিনই টোটো কোম্পানি। নাতির কথা কে আর মনে রাখে। একা বালিকার ঘাড়ে চাপিয়ে কেটেছেন। বিমানের অবশ্য সুবিধেই হল। বাধা দেবার কেউ নেই।

সারাটা পথ ট্যাক্সিতে তার কোলে ছেলেটা বেশ ভালই রইল। এইটুকুটুকু হাত, সেই হাতে আবার মুঠো পাকিয়েছে। ব্যাটা যেন বীর হনুমান। দু-একবার হাত-পা ছুঁড়ে একটু খেলার ভাব করল। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল বিমানের দিকে। ব্যাটা বাপকে চেনার চেষ্টা করছে। একসময় মনে হল হাসছে। তার মানে বিমানের দলে ভিড়ছে। মুখটা অনেকটা মারাদোনার মতো হয়েছে। বড় ফুটবল প্লেয়ার হলে মন্দ হয় না। ইঞ্জিনিয়ার না হওয়াই ভাল। বড় ঝামেলা। বিমান মুখে চুসুক চুসুক শব্দ করল। শব্দটা ঠিক হচ্ছে না। হলে খলখল করে হাসত। এরই মাঝে স্টপ স্টপ বলা সত্ত্বেও এক লিটার জল ছাড়া হয়ে গেল।

সেজ বউদি বললেন, এ কি করলে, দুধের বাচ্চাটাকে গোঁয়াতুর্মি করে নিয়ে এলে! সামলাবে কি করে!

—তুমি তো আছ।

—অ, এখন আমি আছি! সোহাগের বেলায় সুমিতা, আর প্রেম চটকে গেলেই সেজ বউদি।

—তুমি বউদি আমাকে একটু মদত দাও তো, সুমিতার খুব তেল হয়েছে ইলিশ মাছের মতো।

—তোমাকে তখনই বলেছিলুম, অত মাথায় তুলো না। তোমার দাদাদের দেখে শেখো।

অনেকদিন পরে বিমান আবার তার সেজ বউদির সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ফিরে পেল। সেজ বউদির জীবনটা ভালই। একটাই দুঃখ, ছেলেপুলে হচ্ছে না। না হলেই বা ক্ষতি কি। হাজারটা ঝামেলা। অসুখ। কান্না। বড় বাইরে। ছোট বাইরে। ছেলেরা বড় হয়ে গেলে বোঝাই যায় না শৈশবটা কি কেলেঙ্কারিতে কাটে! প্রবীণরা এখনও সুযোগ পেলেই বিমানের ছেলেবেলার কথা বলেন। ইচ্ছে করে বলেন। বিমানকে অপদস্থ করার জন্যে। তুমি আজ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারো, কিন্তু ছেলেবেলায় তোমার কেলেঙ্কারির লম্বা ফিরিস্তি আছে। যেমন অনেক বড় বয়েস পর্যন্ত বিমান বুকের দুধ খেত। বিমানের এক পিসিমা এখনও জীবিত আছেন। তাঁর একটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছিল। বিমান তখন শিশু। শিশু বিমান পিসিমার দুধ খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। করেছে করেছে, এখনও সে কাহিনী ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে কেন? আরও আছে। পেটআলগা পেটুক বিমানের নানা লজ্জার গল্প। পারিবারিক সম্মেলনে আজও শুনতে হয় মাথা নিচু করে। দামড়া বিমানকে শুনতে হয় শিশু বিমানের কাহিনী।

রাত যত বাড়ে, বিমানের ব্যাটা তত খঁতখঁত করে। গাটাও সামান্য গরম। রাতজাগা ছেলে। প্যাঁচার বংশধর। রাত এগারোটায় শুরু হল চিলচিৎকার। নাচিয়ে, দুলিয়ে কোনও ভাবেই ছেলেকে ভোলানো যায় না। কোলের কাছে আনলে বুকে মুখ ঘষতে থাকে। মাকে খুঁজছে। খুঁজছে মায়ের বুক। বিমানের ব্যাটা। স্বভাব তো একই রকমের হবে। বাপকা ব্যাটা।

বিমান ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেল। এ তোমার গিয়ে ব্রিজ তৈরি নয়, ড্যাম বাঁধা নয়, মা-খোঁজা শিশুটিকে শান্ত করা। বিমান ছেলেকে দুহাতের ওপর ফেলে মোচার খোলার মতো দোলাচ্ছে। বারান্দায় পায়চারি চলেছে। মুখে শব্দ করছে—আঁ, আঁ, আঁয় আঁয়। অতই সোজা! লোকে তাহলে যুগ যুগ ধরে মা খুঁজত না ছেলে করার জন্যে। পায়চারি করতে করতে ইঞ্জিনিয়ার বিমানের মনে হল, ঈশ্বরের

তৈরি পুরুষ যন্ত্রটি অসম্পূর্ণ। বুকে একজোড়া স্তন ফিট করে দিলে মহাভারত কি এমন অশুদ্ধ হত! ঈশ্বর নিজেই মহিলাসক্ত। তা না হলে এমন দুই দুই করলেন কেন? স্বর্গে ফিরে গিয়ে একটা আন্দোলন করতে হবে। কম্পিউটারের মতো নেক্স্ট জেনারেশান মানুষের ডিজাইন চেঞ্জ করাতে হবে। মেয়েরা ওই একটা অ্যাডভান্টেজের জোরে চিরটা কাল ছড়ি ঘুরিয়ে গেল। বুকে ধরে বসে আছে শিশুর খাদ্য, রোগীর পথ্য।

ছেলে শেষে এমন চেল্লাতে শুরু করল, বিলেত হলে প্রতিবেশীরা পুলিস ডাকত। এদেশ বলেই সহ্য করে যাচ্ছে। এর মাঝে একবার সামনের বাড়ির প্রতিবেশী বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলে গেলেন—আপনারও বারোটা বাজল, আমাদেরও বারোটা বাজল। বিমান খুব অপমানিত বোধ করছে। বাচ্চাটার হল কি! ভূতে ধরেছে! খেলুম দেলুম, তোফা রাবার ক্লথে কাঁথার বিছানায় শুয়ে রাত কাবার করে দিলুম—তা না, চ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাঁ হ্যাঁ। ব্যাটা ছেলে হলে হবে কি! মায়ের পক্ষে। ওই কাল ভোরেই, যার বাচ্চা, তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে এসো, মাথা হেঁট করে। পরাজয়। বিমান ছেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—এই, তুই আমার বাচ্চা না! আমি হেরে যাই এইটাই তুই চাইছিস! ছেলে আরও জোরে চিৎকার ছাড়ল। বিমান সঙ্গে সঙ্গে বললে—না না, তুই সুমিতার বাচ্চা।

বিমানের মনে হচ্ছিল—এ এমন এক সমস্যা যার কোনও সমাধান নেই। দুম করে ফেলে দিয়ে পালাবে সে উপায়ও নেই। এ যেন নিজের লেজে নিজেই আগুন লাগিয়ে বসে আছে। বিমান আরও জোরে জোরে দোলাতে লাগল। তার একটা উপলব্ধি হল সেই মুহূর্তে—প্রেম ভালো, খুবই ভালো, গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে। বিয়ে মন্দের ভালো, ছেলেপুলে অতি কুৎসিত ব্যাপার। সৃষ্টি ধ্বংস হয় হোক, তবু ঈশ্বরের ফাঁদে পা না দেওয়াই ভালো।

ছেলের চিৎকারে সারা পরিবার ছুটে এল। মেজ বউদি বললেন—বাথটাবে বসিয়ে দাও, পেট ফেঁপেছে। তিনি একই সঙ্গে মেজদাকে দাবড়ালেন—খাট ছাড়লেন তো অমনি ঠোঁটে সিগারেট। ফ্যালো, ফেলে দাও।

বড় বউদির বাত। বাত বড় মজার জিনিস—হয় মুখে, না হয়

হাঁটুতে। তিনি হাঁটু ধরে কঁকাতে কঁকাতে এলেন। সিম্পটম দেখে স্পেস্যালিস্টের মতো রায় দিলেন—অ, এ যে দেখছি মাইয়ের নেশা। তা সে জিনিস যখন নেই কড়ে আঙুলে মধু মাখিয়ে ঠোঁটের কাছে ধরো দিকি।

বিমান ড্রাগ-অ্যাডিক্ট শুনেছে, মাই-অ্যাডিক্ট তো শোনে নি! জীবনে শিক্ষার কতই না বাকি আছে। পথ দিয়ে যাচ্ছিল মাঝরাতের মাতাল। মুখ তুলে বলে গেল--ফায়ার ব্রিগেডে খপর দাও। ভোলা মন।

সব শেষে এলেন সেজ বউদি। তিনি পড়েছিলেন স্বামীর খপ্পরে। মুক্তি পেয়ে ছুটে এসেছেন। এসেই ভিড় হটিয়ে দিলেন। বড় বউদি পূর্বের কায়দায় ফিরে যেতে যেতে বললেন—অ্যায়, এইবার ঠিক লোক এসে গেছে।

মেজদা বললেন—দি ম্যান।

বড়দা কারেকশান করলেন—দি ওম্যান।

বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে সেজ বউদি সরে গেলেন একপাশে আড়ালে। হঠাৎ কান্না থেমে গেল। থামার আগে অদ্ভুত একটা শব্দ হল। বাচ্চাটা এতক্ষণ টাটা করছিল। জন্তুটা অদ্ভুত এক শব্দ করল। পরম তৃপ্তির শব্দ। ভালমানুষ সেজদা খুশির গলায় বললেন—আসল জিনিস ঢুকেছে।

মেজ বউদি অমনি টুক করে ছোবল মেরে দিলেন আসল জায়গায়—কতক্ষণ! নেই তো কিছু, শুকনো!

পরিবেশটা কেমন যেন হয়ে গেল। কালভুজঙ্গ দংশিল যারে। এতক্ষণের কান্না থামার ফলে চারপাশে নেমে এসেছে অপ্রাকৃত নিস্তব্ধতা! পথ দিয়ে তিনটে কুকুর ছুটে গেল। পায়ের শব্দ। ঘরের কোণে আঁচলের তলায় শিশুটিকে বুকে নিয়ে বসে আছেন সেজ বউদি। অসীম সুন্দরী এক মহিলা, যেন ম্যাডোনা। চোখের দু'কোণে জল।

বিমান খুব কাছে গিয়ে বললে—তুমি কাঁদছ বউদি?

এই কথাটুকুর অপেক্ষাতেই যেন জলটুকু দুলছিল। গাল বেয়ে গড়িয়ে এল ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা।

স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ

'পি. এম. আসছেন। পি. এম।'

চার লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে সুবিশাল এক তোরণ। সারা ভারতে যেখানে যত তোরণ আছে সেইসব তোরণের ডিজাইন জগাখিচুড়ি করে বিরাট এক ভাস্কর এটি নির্মাণ করেছেন দেশলাই কাঠ আর কাগজ জুড়ে। টেম্পোরারি ব্যাপার তো। ঘণ্টা তিনেক পরে এই তোরণের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। তখন এইটাতে আগুন ধরিয়ে 'বনফায়ার' হবে। অলিম্পিক 'বনফায়ার'। সাত মণ ঘি ঢেলে একটা মহাযজ্ঞও হবে। চলবে তিনদিন। ভারতবর্ষের নামে সংকল্প করে শুরু হবে 'হুমন'। প্রার্থনা করা হবে পরবর্তী অলিম্পিকে ভারতের খোলনলচে যেন একেবারে খুলে পড়ে। খুলে পড়ে মানে, টেংরি খুলে দৌড়তে হবে। গোল্ড, গোল্ড না হলে সিলভার, সিলভার না হলে ব্রোঞ্জ। তাতে যদি টেংরি কাঁধে করে দেশে ফিরতে হয় সেও ভি আচ্ছা। খালি হাতে ফিরলে পশ্চিমবাংলায় নির্বাসন।

প্রেস অ্যাডভাইসার বিনীত ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পি. এম. স্যার, পশ্চিমবাংলায় কেন স্যার!'

পি. এম. বলেছিলেন, 'সারা ভারতে ওইটাই একমাত্র রাজ্য যা কেন্দ্রের বাইরে। কেন্দ্রের বাইরে মানে ভারতের বাইরে। সেণ্টারের স্টেপডটার। সৎমায়ের কন্যা। নরক বলা চলে। সারা দিন রাত ওখানে ধেই ধেই নৃত্য আর হরিনাম সংকীর্তন চলেছে। ওখানে রিভলভারধারী পুলিস মস্তানের ভয়ে ছুটে পালান। সেখানে পুলিসে চোর ধরে না। চোরে পুলিস ধরে। নেতায় নেতায় লেজ কামড়া-কামড়ি হয়। সর্বোচ্চ অফিসার ইউনিয়নের ক্লাস ফোর নেতাকে স্যার বলে সম্বোধন করেন। না করলে তাঁর চেয়ার চলে যায়। সেই রাজ্যের সমস্ত রাজপথ ঢেউ খেলানো। সাত হাত অন্তর পলিটিক্যাল বাম্প। আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিল কোন এক চেম্বারের জুবিলিতে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা এসে খবর দিলে, যে পথে যেতে হবে সেই পথে মোট দেড়শোটা পলিটিক্যাল বাম্প আছে।'

'স্ট্রেঞ্জ, পলিটিক্যাল বাম্প, সেটা কি জিনিস ?'

'উঃ, আপনাদের অজ্ঞতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। পশ্চিমবাংলায় একটা বামজোট দেশ শাসন করছে, জানেন কি তা ?'

'ইয়েস স্যার।'

'জানেন কি, ওয়েস্টবেঙ্গলে কোনও গাড়িই ট্র্যাফিক রুল মানে না। মানানো যায় না। জানেন কি, সেখানে গীতা, বেদান্ত, মার্কস, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, সব এক সঙ্গে পরিপাক করে একটা হাঁড়িকাবাব তৈরি হয়েছে। লোক না পোক ভেবে, ড্রাইভাররা রোজ দু'দশটাকে জামা পাল্টে ছেড়ে দেয়।'

'জামা পালটানোটা কি স্যার !'

'অ, আপনি তো আবার ইংলিশ-মিডিয়াম। কাল থেকে দু'পাতা করে গীতা পড়ার অভ্যাস করুন। পড়া উচিত। কাজে লাগবে। কবে আছি মশাই, কবে নেই। পশ্চিমবাংলার যুবকরা ভারি সুন্দর একটা কথা বলে, মায়ের ভোগে চলে যাওয়া। ব্যাপারটা কি জানেন, মরে যাওয়া। গীতা, বেদান্ত আর মার্কস তিনটেকে ওরা একেবারে গুলে খেয়েছে। গীতা বলছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। শরীর হল একটা জামা। সেই জামা পরে আছে একটা আত্মা। এই আত্মা আবার কোন্ আত্মা। সেই অখণ্ড আত্মার অংশ। যাকে আমরা বলি পরমাত্মা। আপনি তো আবার ইকনমিকসের লোক। আপনাকে আত্মা বোঝাতে হলে ইকনমিকসের উদাহরণ দিতে হবে। আত্মার ব্যাপারটা বোঝানোর সহজ উপায় হল, আমাদের মনিটারি সিসটেম। আমাদের কারেনসি হল পরমাত্মা, আর এই ষাটকোটি আত্মা হল, টাকা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা, পঁচিশ পয়সা। নানা মূল্যের কয়েন্স আর কি। সেই একের সঙ্গে যার সম্পর্ক। এক হইতেই বহু, বহু হইতেই এক। আত্মার সর্বাধুনিক মনিটারি ডেফিনিশান। শরীররূপ জামা পরা আত্মা চাকার তলায় পড়া মানে দুঃখের কিছু নয়। জামা পালটানো। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আবার নানা জাতে বিভক্ত, যেমন কংগ্রেস, সি. পি. এম, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. অ্যাণ্ড সো অন। চাপা পড়লেই আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ সমাধান, হাম্প। কংগ্রেস হাম্প, সি. পি. এম হাম্প, ফরোয়ার্ড ব্লক হাম্প। একে বলে বাম্পইজম বা হাম্পইজম।'

'তা আপনি স্যার সেই হাম্পের ওপর দিয়ে জাম্প খেতে খেতে গেলেন ?'

'না হে না। আমাদের ক্ষৌরকার গিয়ে সব চেঁছে সাফ করে দিয়ে এল। যাক্, কাল থেকে গীতা পড়বেন। মনে রাখবেন আমাদের পিছনে শমন। পাঞ্জাব-টেররিস্ট। যে কোনও দিন আমাদেরও মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিতে পারে। গীতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। গোর্বাচেভও কিছু নয়, বোফর্সও কিছু নয়। আসল হল সেই, নৈনং ছিন্দন্তি.... পরের লাইন নেকস্ট লাইন, কাম অন, কাম অন।'

'পরের লাইনটা স্যার, দাঁড়ান আমি লিটারারি অ্যাডভাইসারকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

'দেখেছেন, আপনারা আমাকে ঠিকমতো ব্রিফ করতে পারেন না। এটা আমার ফরেন প্রেস কনফারেন্স হলে, আমার ভাবমূর্তিটা কি দাঁড়াতো, একবার ভেবে দেখেছেন ? ফাম্বলিং ফর লাইন্স। আবার আমাকে একটা রিশাফলিং করতে হবে। আপনার জায়গায় আমাকে গজেন্দ্রগজাবিরকে আনতে হবে। না, ছেলেরা হোপলেস। রোহিণী ক্যাটাপুল্টকেই নিয়ে আসি।'

পি. এম. একেবারে খাপ্পা হয়ে আছেন। সর্বব্যাপারে তিতবিরক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে গেছেন। স্বপ্নের ভারত, তাঁর দু' হাজার এক অব্দের ভারত গ্রাউণ্ড কন্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণ হারা স্পেস ক্র্যাফটের মতো মহাকাশের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। অর্থনীতি ধেবড়ে গেছে। রাজনীতি জেবড়ে গেছে। সমাজনীতি থেবড়ে গেছে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার বোমকে গেছে। আদর্শ চটকে গেছে। জাতীয়তা হড়কে গেছে। সম্প্রীতি সড়কে গেছে। সংস্কৃতি ল্যাংটো হয়ে গেছে। আর স্পোর্টস পটকে গেছে। সব যেন মামারবাড়ি ভেবে বসে আছে। তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই। মামি দিল নীল পাখি গীত শুনি ভাই। আমার স্ত্রী কি হোল কান্ট্রির মামি। ভোট দিয়ে তক্তে বসিয়ে এখন ভোটকম্বল চাপা দিয়ে কিলোবার চেষ্টা। 'ফায়ার' !

প্রেস অ্যাডভাইসার চমকে উঠে বললেন, 'কোন কামানে স্যার ! বোফর্স গান !'

পি. এম. এমনি ভীষণ মিষ্টি মানুষ। জোর করে দেশ-শাসনে বসিয়ে না দিলে এক নম্বর ফিল্মস্টার হতে পারতেন। তখন সাউথ-এর সি.

এম.-দের আর জারিজুরি খাটতে না। দেবতা সেজে ভোট কামড়ানো বেরিয়ে যেত। সন্ন্যাসী সেজে ত্যাগী ভোগী আর হতে হত না। কিন্তু পি. এম একবার রেগে গেলে তখন আর তিনি কারোর নন। তখন একমাত্র ফার্স্ট লেডিই তাঁকে সামলাতে পারেন। ক্যাসিক্যাল গান শুনিয়ে ইতালিয়ান রাগিণীতে।

পি. এম. পাথরের মতো মুখ করে প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'প্রথম গোটা দুয়েক লাইন ভুলে গেছি, মোদ্দা কথা হল, মুর্খরা যত কম কথা বলে ততই তাদের মানায়। আপনি দয়া করে আসুন। রাত হয়েছে। পারেন তো একটু হোম-ওয়ার্ক করুন। আপনাদের অজ্ঞতা মানে আমার অজ্ঞতা। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট।'

রাত আড়াইটের সময় পি. এম. আরামকেদারায় বসে একটা ডিকটেশান দিলেন ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির কাছে।

'আপনাদের অপদার্থতায় আমার পিত্তি চটে গেছে। গদি টানাটানি, আঁকড়াআঁকড়ি কামড়াকামড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকি সত্য। বিরোধীদের সঙ্গে বকসিং আমাকে এক মুহূর্তও রিং ছেড়ে বেরোতে দেয় না, ও ভি সত্য; কিন্তু জেনে রাখুন স্পোর্টস-ওয়ার্লডের সব খবর আমি রাখি। আমি ভারতকে যত এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, আপনারা সদলবলে ততই তাকে পেছিয়ে দেবার তালে আছেন। যেদিকটা আমি না দেখবো, সেই দিকটাই হড়কে যাবে। আবার সব ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে বিরোধীরা সমালোচনা করবেন—ব্যাটা ডিকটেটার। এখন, বোর্ডের মহামান্য সদস্যরা বলুন, সোলে আপনারা কি করে এলেন? বেশ বেড়িয়ে এলেন, তাই না! ভাল ফুর্তি হল, কি বলুন! একটা ঘুঁটের মেডেলও বরাতে জুটলো না। উত্তম। অতি উত্তম। রাশিয়া হলে আপনাদের কি করা হত জানেন? গুলাগে চালান দেওয়া হত। ভারত বলে বেঁচে গেলেন। কম্যুনিস্ট কাণ্ট্রি হলে কামড়ে ছিঁড়ে দিত। এই হল লাল আর সাদার পার্থক্য। এখন দেখছি সাদা দেশে আপনারা সব সফেদ হাতী। যাক, এই শেষ রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলুম খেলার ব্যাপারে আমি নাক গলাবো। ঘণ্টা কয়েক ঘুমোতুম, সেই ঘুমও আমি বিসর্জন দিলুম দেশজননীর স্বার্থে। পুরো সিসটেমটাকে আমি ঢেলে সাজাবো। আপনাদের কোনও কথা শুনবো না। আপনাদের মুরোদ বোঝা গেছে। আমি

এদিকে পলিটিকস করছি, আপনারা করছেন ওদিকে। আমার পলিটিকসে দেশ এগোচ্ছে, আপনাদের পলিটিকসে দেশ পেছোচ্ছে। কি খেলাই খেলছেন। আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশবো। প্রয়োজন হলে আমি নিজে ট্রেনিং দোবো। আমি সব পারি। প্রয়োজনে আমি ডিকটেটার হতে পারি, মাফিয়া হতে পারি, কম্যুনিস্ট হতে পারি। সোলে আপনারা আমার থোবনায় চুনকালি মাখিয়ে এসেছেন। আমি সব কর্মকর্তার টায়ার পাংচার করে দোবো। আমি আসছি।'

পি এম. আসছেন।

কর্মকর্তাদের একমাত্র ভরসা এই তোরণ। আমাদের পি. এম. শো-বিজনেস পছন্দ করেন। তোরণটি একেবারে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। এক ব্যাটেলিয়ান ব্ল্যাক-ক্যাট 'সিকিউরিটি চেকআপের' ঠেলায় তিন চার জায়গা ড্যামেজ করে দিয়েছে। সেই সব জায়গায় সোল অলিম্পিকের লোগো দিয়ে তালি মারা হয়েছে। পি. এম-এর পিতৃপুরুষদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়েছে। লাল গোলাপ দিয়ে চারপাশ লালে লাল করা হয়েছে। গোলাপের প্রতি এই পরিবারের একটা দুর্বলতা আছে। মাতামহের বাটন হোলে শত দুঃখের দিনেও একটি লাল গোলাপ গোঁজা থাকত। গোলাপ, সুন্দরী রমণী, হৃষ্টপুষ্ট টাঁ্যাপোরটোপোর শিশু, তিনটি দুর্বলতাই সাজানো হয়েছে। সুন্দরী চিত্রতারকা। বাদ সেধেছে এক ব্যাটেলিয়ান লম্বা লম্বা ব্ল্যাক-ক্যাট। কাঠখোট্টা চেহারা। মাথায় ঘাসকাটা চুল। ধূর্ত নেকড়ের মতো মুখ। কমনীয় আয়োজনে বাবলাকাঁটা।

কে এক কর্মকর্তা পরামর্শ দিয়েছিলেন, ইন্দিরাজীর কণ্ঠস্বর শুনলে রাজীবজী প্রসন্ন হবেন। তাঁর মন বেদনাবিধুর হয়ে উঠবে, তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার থেকে মন চলে যাবে স্বর্গীয় লোকে। সব গলতি মাপ করে দেবেন। আরে ইয়ার, খেলমে তো হারজিৎ হায়ই হায়। গেম ইজ এ গেম।• এ তো চীন-জাপান যুদ্ধ নয়। একসপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস নয়। রেগনের স্টার-ওয়ার নয়। খেলকুদমে এইসি হোতাই হায়। স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট কালটিভেট করো। পি. এম.-কে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, যা সারা পৃথিবীর লোক ত্রেতা দ্বাপর থেকে বলে আসছে। রাম বলেছেন, রাবণ বলেছেন, কৃষ্ণ

বলেছেন, কর্ণ বলেছেন, যীশু বলেছেন, জরথুস্ত্র বলেছেন। আমার বাবা বলেছেন, বাবার বাবা বলেছেন, তাঁর বাবার বাবা বলেছিলেন, বাপুনে ভি কহা!

'আরে ঘোড়ার ডিম, কথাটা কি বলো না। ভ্যানতাড়া না করে।'

'কথাটা হল ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস। ফেল করতে করতে, ফেল করতে করতে সাকসেস-এর কুতুবমিনার।'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি ইয়ার। আমার আর একটা ডায়ালগ মনে আসছে। লর্ড কৃষ্ণ বলেছিলেন—কর্মণ্যে ইয়ে, কর্মণ্যে অকর্মণ্যে....।'

'আর চেষ্টা কোরো না, পি. এম. স্যাংস্কৃটে ভেরি স্ট্রং। মনে হয় আদ্য, মধ্য পাশ করা। কথাটা হল, কর্মে তোমার অধিকার কর্মফলে নয়। সেকেণ্ড কথা হল, কর্ম হল যোগের কৌশল। কি যোগ সেটা লর্ড পরিষ্কার করে বলেননি। আমার যদ্দূর মনে হয় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সে যোগ। ওদিকে যোগ না হলে শেষজীবনে চিবোবোটা কি? আখের ছিবড়ে!'

'গেট রেডি। পি এম. আসছেন।'

ঘোষণা হল। সবাই তটস্থ। সকলেই স্পোর্টস সুট পরে এসেছেন। বেস্নজারের বুকে বিভিন্ন পণ্য-প্রস্তুতকারক সংস্থার এমব্লেম। এইটাই বর্তমানের রেওয়াজ। কেউ ব্রেড কোম্পানির। কেউ শেভিং-ক্রিম কোম্পানির। কেউ টিভি। কেউ জুতো। কেউ জাঙ্গিয়া, কেউ পানমশালা।

পর পর একই রকম সাত-আটটা গাড়ি ঝড়ের বেগে তোরণ ফুঁড়ে চলে এল। সাতটা গাড়িতেই সাতজন পি. এম.। এর মধ্যে একজন আসল। বাকি ছ'জন নকল। এর নাম ধোঁকাবাজি। এই দেখে টেররিস্টরা ভড়কে যায়। তিনজন কর্মকর্তা তিন দিক থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে তিনজন নকল পি. এম.-কে 'আইয়ে জাঁহাপনা আইয়ে জাঁহাপনা' বলে গাড়ি থেকে নামাতে গেলেন, ওদিকে আসল পি. এম. পাঁচ নম্বর গাড়ি থেকে নেমে সিকিউরিটিকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কারা?'

'তিনজন কর্মকর্তা স্যার।'

'দৌড়টা লক্ষ্য করলে!'

'ইয়েস স্যার।'

'তিনটেকে আলাদা করে স্টেপলার দিয়ে পিঠে নম্বর সেঁটে আলাদা করে রাখো। নেকস্ট অলিম্পিকে একশো মিটার ইভেন্টের জন্য তিনটেকেই পাঠাব। গোল্ড হয়তো পাবে না; তবে ব্রোঞ্জ একটা আনবেই।'

'সন্দেহ আছে স্যার। এরা মন্ত্রী দেখে দৌড়োয়। অলিম্পিক কোর্সে পারবে না স্যার।'

'মন্ত্রী দেখে দৌড়য় মানে?'

'আজ্ঞে মন্ত্রী, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী হল ভবিষ্যৎ। যে আগে ছুটে গিয়ে নামাতে পারবে তার ভবিষ্যৎ ফিরে যাবে। এই দৌড় দেখে আপনি বিচার করবেন না। এই দৌড়ে ভারতীয়রা অতুলনীয়। এর নাম আখেরের পেছনে দৌড়নো।'

পি. এম. তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই টাকার শ্রাদ্ধটা করল কে? কোন্ ব্যবসাদার! এ তো মনে হচ্ছে দু' নম্বরী পয়সার খেল।'

পাশেই এক কর্মকর্তা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'পি. এম. স্যার, এটা প্রোভার্বিয়াল পিলার।'

'সেটা কি বস্তু!'

'আজ্ঞে, ফেলিওর থেকে সাকসেসের যে পিলার হয়। ফেলিওর ইজ দা পিলার অফ সাকসেস। এটা সেই পিলার।'

'তোমার মুণ্ডু।'

পি. এম. রাগে গনগন করতে করতে সভাকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রায় শ'তিনেক কর্মকর্তা ছুঁচোবাজির মতো এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। সকলেই চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি আসতে। পরের বারের ব্যবস্থাটা তো এখনই করে রাখতে হবে। সেটাই তো আসল স্পোর্টস। অ্যাথলিটদের চেয়ে অফিসিয়ালস বড়। তার চেয়ে বড় গম্ভীরমুখো আমলারা। পি. এম.-এর সামনেই দুই কর্মকর্তার ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে গেল।

পি. এম. থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'কি হচ্ছে, বক্সিং?'

সিকিউরিটি চিফ বললেন, 'দিশি বক্সিং স্যার।'

'দুজনকে আলাদা করে দেখে রাখো, পরের বার পাঠানো যাবে।'

'এটা স্যার ইণ্টারন্যাশন্যাল বকসিং নয়, একে বলে খাবলাখাবলি, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, আপনার নজরে আসার জন্যে। এটা স্পোর্টস নয়, পলিটিকস।'

'এনাফ অফ পলিটিকস। তুমি আমাকে পলিটিকসের কথা আর মনে করিয়ে দিও না। ঘেন্না ধরে গেছে। মা যে আমাকে কি মুকুট পরিয়ে গেলেন! এ যেন সেই সাপের ছুঁচো গেলা।'

এর মাঝে একজন কোমরসমান উঁচু জেভোনিয়া ভিসকোমার ঝোপ এক লাফে টপকে পি. এমের সামনে এসে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলেন। পি. এম. থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনি কী সোলে গিয়েছিলেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'কি নিয়ে এলেন?'

'বেশি কিছু পারি নি স্যার। ডলারে টান পড়ে গিয়েছিল। গোটা তিনেক টেপরেকর্ডার, একটা ক্যামেরা, তিন বোতল পারফ্যুম, দশটা শার্ট, দুটো স্যুটকেস, ছটা প্যাণ্টপিস, একটা ইলেকট্রিক সেফটি-রেজার, ছ টিউব শেভিং ফোম, এক ডজন মোজা, কিছু জুয়েলারি, আরও অনেক কিছু ছিল, পাগল করে দেবার মতো সব জিনিস। আপনার কাছে একটা অনুরোধ, সামনের বার ওই দৈনিক দশ ডলার পকেটখরচটা অনুগ্রহ করে দশগুণ বাড়িয়ে দেবেন স্যার। তাহলে আমাদের আর কোনও অভিযোগ থাকবে না।'

'আপনি কি হার্ডলসে অংশ নিয়েছিলেন?'

'না তো! আমি তো স্পোর্টসম্যান নই। আমি তো অফিসিয়াল!'

'আই সি।'

পি. এম. হনহন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। এই ধরনের দ্রুত হাঁটায় তাঁর পরিবারের সকলেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দাদু, তাঁর মা। জনৈক অফিসিয়াল তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে আর একজনকে বললেন, 'কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমাদের পি. এমকেই তো পরের অলিম্পিকে পাঠিয়ে দিলে হয়।'

পি. এম. সোজা মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ বাইশ কেজি ওজনের বিশাল একটা মালা তাঁর গলায় এসে পড়ল। মুখের নিচের দিক তলিয়ে গেল ফুলদলে। নাক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। একটু শ্বাস নেবার জন্যে তিনি ছটফট করে উঠলেন। একজন ব্ল্যাক-ক্যাট

ছুটে এসে মালাটা খুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে হাততালি দিতে লাগলেন আর কোরাসে বলতে লাগলেন, 'সেভড্, সেভড্।'

পি. এম. তো ভীষণ স্মার্ট, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সেভ দি কান্ট্রি, নট মি।' বলেই তিনি মাইক্রোফোনের টুঁটিটা চেপে ধরে বললেন, 'কে দায়ী! কারা দায়ী! সোলে ভারতের ক্রীড়া-প্রদীপ কারা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল? কোন্ হতভাগারা?'

সভার দুধারে দু'সার মানুষ বসে আছেন। মাঝে প্যাসেজ। পি. এমের ডানধারে অফিসিয়ালস। বাঁধারে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটরা।

ডানধার একজোটে বলে উঠল, 'আমরা না স্যার।'

বাঁধার একযোগে বলে উঠল, 'আমরা না স্যার।'

পি. এম বললেন, 'ঠিক এইটাই আমি আশা করেছিলুম। একটা দামী ফুলদানি ভেঙে গেলে বাড়ির সকলে এইরকমই বলে—আমি ভাঙিনি। তবে কি ভূত ভেঙেছে!'

খেলোয়াড়রা বললেন, 'কর্মকর্তারা দায়ী। দায়ী আমলারা। বিদেশে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে ছাগলের মতো ব্যবহার করেছে।'

কর্মকর্তারা চিৎকার করে বললেন, মিথ্যেবাদী স্যার। ওদের কেউই আর ফর্মে নেই। সব জাঙ্ক।'

দু তরফে লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। এরা বলে তোমরা, ওরা বলে তোমরা।

পি এম কিছুক্ষণ সহ্য করলেন। শেষে বললেন, 'স্পোর্টস আর পলিটিকস এক হয়ে গেছে। আর কোনও আশা নেই।' নিজের পি এ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ট্যাটিস্টিকস প্লিজ। কত টাকার শ্রাদ্ধ আমরা করে এলুম সোলে!'

'অ্যাকচুয়াল ফিগারটা আপনাকে কাল দিতে পারবো স্যার, তবে এবারের বাজেটে প্রচুর টাকা ছিল। আমরা কোনও অভাব রাখিনি। একেবারে ঢেলে নিয়েছিলুম।'

'সব তুলে নাও।'

'কি করে তুলবো স্যার। সব তো ফুঁকে দিয়ে এসেছে।'

'যে যার ভিটে-মাটি বিক্রি করে ইনস্টলমেণ্টে টাকা শোধ করুক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার বারোটা বাজাচ্ছে। রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বরে বিদ্যুৎ করছে। আমার মানসম্মান, আমার ফ্যামিলির মানসম্মান নিয়ে

টানাটানি। টাকা দিতে না পারে তো এক বালতি করে রক্ত দিয়ে আসুক। কোনও ক্ষমা নেই! কই, টাইম ম্যাগাজিনটা দেখি!'

'এই যে স্যার।'

পি. এম. ম্যাগাজিনটি বাতাসে দুলিয়ে বললেন, 'আমাদের পারফরমেন্স সম্পর্কে আমেরিকার এই কাগজ কি লিখেছে আপনারা পড়েছেন?'

'বিদেশী কাগজ যা-তা লেখেই স্যার। আমাদের পলিটিকস নিয়ে লিখছে, আমাদের স্পোর্টস নিয়ে লিখছে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সাংবাদিকদের ওই কাজ। আপনি তো জানেনই স্যার। কেন উত্তেজিত হচ্ছেন! আপনি রেগে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার!'

'আমার রাগার আর দরকার নেই, ভবিষ্যৎ এমনিই অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের পপুলেশান কত?'

'কয়েকদিন পরে বলব স্যার। ওই টিভির কুইজ কনটেস্ট হবে, শুনে বলে দোবো। কোটির খবর আমরা তেমন রাখি না। মানুষের কি দাম স্যার! মানুষ তো আর টাকা নয়। আমার মাস্টার মশাই বলতেন, মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস। মানে নিজের ব্যবসায় মন দাও। ব্যবসা মানে টাকা। যে ব্যবসায় কোনও টাকা নেই, তাকে আমার পিতাশ্রী বলতেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। আর আমার মাতাশ্রী বলতেন, নিজের চরকায় তেল দাও।'

পি. এম. তাঁর উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মালটা কে?'

'এইরকম মাল আপনি কত চান স্যার! মালের মালা হয়ে আছে। ছেড়ে দিন ওদের কথা।'

'বেশ ছেড়েই দি। ছাড়তে ছাড়তে তো সবই প্রায় ছেড়ে দিলুম, এইবার গদিটা ছেড়ে দিলেই হয়। কি জ্বালায় যে পড়েছি! আর আমার পলিটিক্যাল স্ট্রং হোল্ড উত্তরপ্রদেশটাই যেতে বসেছে। পাঞ্জাবের তো ওই ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা! কোনও রকমে একটা মিলখা সিং ছেড়ে, মার্কেটে ছেড়ে দিলে জার্নাইল সিং। কোথায় ডিসকাস ছুঁড়বে, ছুঁড়বে লোহার বল, তা না বোমা ছুঁড়ে আমার ফিউচারের বারোটা বাজাচ্ছে।'

'আপনার ফিউচার কেন বলছেন স্যার! এইটাই তো ভুল করেন। বলুন দেশের ফিউচার। এই আমি, আমি করেন বলেই জনগণ আপনাকে

ভুল বোঝে, ফিউডাল লর্ড বলে। পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল জনসভায় আপনাকে রাবণ বলেছে। আবার বলে কি, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেনি। রাবণ প্রাসাদে, সীতা অশোককাননে ইনট্যাক্ট। কিন্তু আপনি রাবণের হাতে সীতা পড়লে, হিহি, হয়ে যেত।'

'কি অসভ্য! স্টপ ইট। স্টপ ইট। এখানে আমরা এসেছি অলিম্পিক আলোচনা করতে। পশ্চিমবঙ্গ আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারে, আমার সে স্বাধীনতা দেওয়া আছে। সি এম ইজ মাই ফ্রেন্ড। এটা আমাদের কততম অলিম্পিক গেল?'

'আমার ছেলে জানে।'

'সে কি, ছেলের বাপ জানে না?'

'আজকাল স্পোর্টসটা স্যার আর অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট নয়! অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট হল ফিল্ম, পলিটিকস। স্পোর্টস ছেলেদের একেবারে কণ্ঠস্থ। যতদূর মনে হচ্ছে এটা ছিল চব্বিশতম অলিম্পিক।'

পি. এম. সভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা আজ পর্যন্ত কটা পদক পেয়েছি! কাম অন, কাম অন স্ট্যাটিসটিকস প্লিজ।'

'হকি। হকিতে আমরা পরপর কয়েকবার গোল্ড মেরে দিয়েছি। সোনা আমরা পাইনি এমন অপবাদ কেউ আমাদের দিতে পারবে না কোনও দিন। আওয়ার গ্রেট ধ্যানচাঁদ। আওয়ার উইজার্ড অফ দি স্টিক। হিটলার পর্যন্ত যাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হোয়্যার ইজ আওয়ার নেকস্ট ধ্যানচাঁদ?'

'প্রতিভার কি ডুপ্লিকেট হয় স্যার! দুটো রাজীবজী হয়, না দুটো ইন্দিরাজী!'

'ওসব তেলতেলে কথা ছাড়ুন। আমাদের সেই একটি মাত্র সোনা, ছাপ্পান্ন সালের পর থেকে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আশিতে লাস্ট, তারপর কাঁচকলা! এবারে আপনাদের দল কি করে এল?'

'খেলেছে স্যার। হাড্ডাহাড্ডি লড়েছে। তবে জানেন তো, খেলায় হারজিত থাকবেই। আমাদের একটা হিট গানই আছে, কোই জিতা, কোই হারা। একেই বলে স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট। খেলায় কোনও কিছু সিরিয়াসলি নিতে নেই। পলিটিকসেও তাই। এই ধরুন, ইন্দিরাজী হেরে গেলেন। গেলেন গেলেন। পরের বার জিতে ফিরে

এলেন। নো প্রবলেম। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো।'

'হোয়াটস অ্যাবাউট পদক!'

'আবার সেই পদক। আপনাকে দেখছি পদকে পেয়েছে। আমাদের গীতায় আমাদের কৃষ্ণজী বলেছেন, কর্মে তোমার অধিকার নট ইন কর্মফল। এই যে ধরুন সাত-সাতটা পরিকল্পনা ভারতের ওপর দিয়ে চলে গেল, তা কি হল, ডিম হল। ফল না হলেও কর্মযোগ তো হল। সেইরকম পদক না হোক ক্রীড়াযোগ তো হল।'

পি. এম.জী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'গীতাটাকে বাইরে বের করে দিয়ে এসো।'

দুজন ব্ল্যাকক্যাট চ্যাংদোলা করে তাকে বাইরের ঝোপে ফেলে দিতে দিতে বললে, 'ব্যাটা বাঙালি হো গিয়া।'

পি. এম. ততক্ষণে দৌড়বীরদের চেপে ধরেছেন, 'কোথায়, কোথায় আমাদের সেই ফ্ল্যাইং এঞ্জেল। টাইম কি রকম ঝেড়েছে। ভারতের স্বর্ণপদক ভবিষ্যৎ অলিম্পিক ট্র্যাকে সকলের শেষে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছে। বুক ওঠানামা করছে, হাপরের মতো চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে ঠেলে। কি খবর তার?'

'সেই গোড়ালির ব্যথা। লন্ডন সারাতে পারলে না। ইন্ডিয়া ইনজেকসান দিয়ে দিয়ে ঝাঁঝরি করে দিলে। এক গোড়ালিই তাকে শেষ করে দিলে স্যার!'

'গোড়ালি ফোড়ালি বাজে কথা, আসল কথা বেলুনে একটু বেশি হাওয়া ভরা হয়ে গেছে। একটু বেশি পাবলিসিটি হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে-বিদেশে সম্বর্ধনা নিতেই ব্যস্ত। বই বেরিয়ে গেছে। নাম হয়েছে, ধাম হয়েছে, টাকা হয়েছে। আর কে দৌড়য়। তা তিনি এলেন না কেন?'

'ওই যে স্যার গোড়ালির ব্যথা। গোড়ালিতে ননস্টপ কবিরাজি দাঁতের মাজন ঘষে চলেছে।'

'মাজন?'

'ইয়েস স্যার। মাজনে ভয়ঙ্কর দাঁতের ব্যথা ভাল হয়, গোড়ালির ব্যথা ভালো হবে না! এখন আর নেই, আগে বেদেনীরা নাকীসুরে হাঁকত, দাঁত ভালো করে, পুকা বের করে।'

'ভারতের হয়ে এখন দৌড়বে কে!'

'বলবো স্যার। কথা দিন, রাগ করবেন না!'

'বলো, বলো।'

'স্লাইট অশ্লীল।'

'শ্লীল, অশ্লীল রাখো। আমি পি. এম.। আমি মডার্ন ম্যানেজমেণ্ট এনেছি। ভারতকে কম্পুটার এজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভারতমাতার গলায়, আই মিন মাতাশ্রীর গলায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক আমাকে দোলাতেই হবে।'

'এবার আমরা কিছু জিয়ার্ডিয়া রোগগ্রস্ত বাঙালিকে পাঠাবো। ইভেণ্টের আগের দিন রাতে ঠেসে খাওয়াবো। ক্ষীর লুচি মেঠাইমণ্ডা, সকালে আর বড় বাইরে করতে দেওয়া হবে না। এইবার স্টার্ট পোজিশানে নীচু হয়ে দাঁড়াবে। পেটে চাপ। আর যায় কোথায়। ওদিকে গুড়ুম। এদিকে জিয়ার্ডিয়ার নিম্ন কো। যাদের জিয়ার্ডিয়া আছে তারা আবার ভয় পেলে কো ধরে রাখতে পারে না। দেখবেন এইবার দৌড় কাকে বলে! কোথায় কার্ল লুইস, বেন জনসন! স্পিড কাকে বলে! কোনও ট্রেনিং-এর দরকার নেই। কিচ্ছু নেই। শুধু টাচলাইনে আসা মাত্রই টাল মেরে—টু লেভেটারি। অ্যান্ড গোল্ড। সিওর সোনা।'

'তখন যদি না পায়।'

'ও পাবেই স্যার। পেতেই হবে। একেই বলে গোপালভাঁড় টেকনিক।'

'ওয়েট লিফটিং-এর কি হবে! সেখানেও তো আমরা গেছি তলিয়ে।'

'ও আড়াই হাজার ডিম আর আস্ত দুম্বা মারা পালোয়ান দিয়ে হবে না স্যার। আমাদের যেতে হবে কলকাতার বড়বাজারে। ধরে আনতে হবে এক ডজন মুটে। তারা যা লোড তুলতে পারে, আপনার ওই বাহারি রিস্টব্যাণ্ড পরা, তেলচুকচুকে গালগোব্দা ওয়েটলিফটাররা পারবে না। আপনার কোনও ধারণা আছে স্যার, একজন ঘি-চাপাটি-খেকো মারোয়াড়ির ওজন কত? বড়বাজারের মুটে তাকে ঝাঁকায় বসিয়ে অক্লেশে মাথায় তুলে স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত শুধু নিয়ে আসা নয়, সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলার খাটে শুইয়ে দিয়ে আসতে পারে।'

'থাক সমস্যার সমাধান। কিন্তু এবার বক্সিং-এ কি হল?'

আমাদের বকসারদের কোনও দোষ নেই। ঘুষি তারা ঠিকই চালিয়েছিল। কনট্যাক্ট করাতে পারেনি। সে হল গিয়ে টার্গেটের দোষ। কাওয়ার্ড। কেবল সরে যায়। পিছলে পালায়। টার্গেট স্লিপ করলে ঘুষি কি করবে স্যার!'

'তা হলে?'

'নেকস্ট টাইম আমরা বোম্বের হিরোদের পাঠাবো। অমন লাগাতার ঘুষি পৃথিবীর কেউ চালাতে পারবে না। একুশটা রিল ধরে কেবল ঘুষি। যে আসছে তাকেই মেরে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছে। এবার সেরা হিরোদের পাঠানো হবে। তিনখানা গোল্ড সিওর।'

'ফুটবলে কি করা যায়?'

'টিম আমাদের ঠিকই আছে স্যার, একটাই অভাব। সেটা হল সাপোর্টার। সাপোর্টাররা না মদত দিলে আমাদের টিম খেলতে পারে না, তাও আবার কলকাতার সাপোর্টার। পরেরবার টিমের সঙ্গে হাজার দশেক কলকাতার সাপোর্টার পাঠাবেন। এমনিই তো হাজার দুয়েক ফালতু লোক টিমে ঢুকেই পড়ে। আরও হাজার দশেক না হয় ঢুকবে, তবু তো একটা গোল্ড আসবে।'

'টেনিসে কি হবে!'

'নো প্রবলেম। আবার কলকাতা। দমদম আর বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির কিছু লোক আর হাল্কা একটু ট্রেনিং। যারা সারা দিনরাত মশা মারতে পারে তারা টেনিস বলও টেরিফিক মারতে পারবে। মশা মারায় যা ব্যাকহ্যাণ্ড আর ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ লাগে, আপনার কোনও ধারণা নেই। শুধু সারভিসটা একটু শিখিয়ে দিতে হবে!'

'জিমন্যাসটিকস?'

'আবার কলকাতা। সিটি অফ জিমনাস্টস। ডেলি প্যাসেঞ্জার আর বাসযাত্রীদের মতো জিমনাস্ট পৃথিবীর কোথাও নেই। ওখান থেকে আপনি ভাল রেস্টলারও পেয়ে যাবেন।'

'হাইজ্যাম্প, লংজ্যাম্প আর পোলভল্ট!'

'দিল্লি স্যার! আপনার দলেই ট্যালেণ্ট আছে। তারা তো অনবরতই লাফাচ্ছে। এক্স রাজা, মহারাজার দল।'

'তা হলে কটা গোল্ড হল?'

'তা মন্দ হল না! দশ-বারোটা নিশ্চিত।'

'সাঁতারে কিছু করা যাবে না?'

'কেন যাবে না স্যার! মধ্যবিত্ত বাঙালি। একমাত্র সলিউশান। দুঃখসাগরে অমন সাঁতার কোনও জাত কাটতে পারবে না।'

'তাহলে হকিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়।'

'হয়ে যাবে, আমরা প্ল্যানচেটে ধ্যানচাঁদকে ডাকবো। স্টিকে তাঁর কি আঠা ছিল আমরা জেনে নেবো।'

পি. এম.-এর মুখ দেখে মনে হল বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি মাইক্রোফোনের টুঁটি ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'একটা রিলিজ দিয়ে দিন, শতাব্দীর শেষের ভারতীয় চমক। ফাঁকা বুলি নয়, বারিগর্ভ, বজ্রগর্ভ মেঘ। পঁচিশতম অলিম্পিক আমাদের। নতুন পরিকল্পনা। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। নতুন বাছাই। পুরনো ছাঁটাই। আপাতত আমাদের মুঠোয় ষোলটি গোল্ড। ব্রোঞ্জ বা সিলভারের হিসেব আমরা করছি না। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।'

পি. এম. মাইক্রোফোনের কাছে মুখ এনে শেষ অভিলাষটি জানালেন, 'সর্বত্র এত শুটিং হচ্ছে, আমরা একটা গোল্ড....।'

'হবে, হবে স্যার, টিভি সিরিয়াল যাঁরা করছেন, তাঁদের মতো শুটিং কেউ করতে পারবে না। ওঁরাই আমাদের গোল্ড এনে দেবেন। বোম্বে না পারুক বাংলা পারবেই।'

গম্ভীর মুখ, উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন, 'এ শুটিং কি সেই শুটিং! আয় হ্যাভ ডাউটস।'

দাগ

কোর্টের রায় বেরলো, বাবা হেরে গেলেন। মা আর আমরা ভাইবোনেরা উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় ছিলুম। বাবা কখন হাসিমুখে জেতার খবর নিয়ে মিষ্টির প্যাকেট হাতে বাড়ি ফিরবেন। এ ছিল আমাদের জেতা কেস। আমাদের উকিল বলেছিলেন, 'বিষ্ণুবাবু, আপনি ভাববেন না। এই কেসে আপনার জিত অনিবার্য।' রাত প্রায় আটটার সময় বাবা এলেন। ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা। ছাতাটা জানালার কাঠে ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন, 'হেরে গেলুম।' সারা ঘরে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। আমার বোন সেলাই কল চালাচ্ছিল। সে কল থামিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মা ঝেড়ে ঝেড়ে কাপড় পাট করছিলেন, তাঁর হাত বন্ধ হয়ে গেল। সামনেই পরীক্ষা, আমি একমনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজি পড়ছিলুম। আমার পড়া থেমে গেল। সারা ঘর নিস্তব্ধ, শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলাম চলার শব্দ। মামলায় হেরে গেলে আমাদের কী হতে পারে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তবে মনে হলো সাংঘাতিক কিছু একটা হবে। আমাদের জীবনের সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে।

বাবা পাঞ্জাবিটা হাঙারে ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন, 'আমাদের উকিলটা একেবারে জঘন্য। ভালো করে কথাই বলতে পারে না তা কেস জিতবে কি!'

মা বললেন, 'তুমি একটু ভালো উকিল দিলে না কেন?'

'ভালো উকিল দিতে গেলে ভালো পয়সা চাই, সেইটাই তো আমার নেই। দেখছ তো, সংসারটা কী ভাবে চালাচ্ছি। তোমরা তো ভালো ক'রে খেতেই পাও না। আমার মতো অপদার্থ লোক এই পাড়ায় আর দুটো পাবে!'

'আমাদের এখন কী হবে?'

'আর কী হবে! বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে পথে নামতে হবে।'

আমার বোন আবার জোরে জোরে সেলাই কল চালাতে লাগলো। মা ভীষণ শব্দ ক'রে একটা কাপড় ঝেড়ে পাট করলেন। আবার সমস্ত

শব্দ ফিরে এলো। এই ভবিষ্যৎটুকু জানার জন্যেই যেন সময় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি আবার জোরে জোরে পড়তে লাগলুম। আমার মনে হলো, এখন আমার আরও ভালো করে পড়া উচিত। মানুষের ভেতর একটা উচিত অনুচিত বোধ থাকে সেই বোধ আমাকে জানিয়ে দিলে, জীবনে সুখ তো ছিলই না—সামান্য যেটুকু ছিল তাও মুছে গেল। আমাকে দুঃখের জন্যে শক্ত হতে হবে। আমার বাঁচার রাস্তা ভালো ক'রে লেখাপড়া করা। দু বছর পরে আমার বাবা রিটায়ার করবেন। আমার বোনের বিয়ের কথা চলছে। এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা কোথায় যাব তা জানি না। বাবার ওপর অনেক অনেক বেশি চাপ পড়ে গেল। বাবা একটা চেয়ারে বসেছিলেন, মা এক কাপ চা এনে দিলেন। বাবা একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর আপনমনে হাসছেন। আমার বোন সেলাই কলে ঢাকা পরাচ্ছে, তার আর সেলাই করতে ভালো লাগছে না। সে সব গুছিয়ে রেখে উঠে গেলো।

বাবা আমাকে বললেন, 'বুঝতে পারলে, আমাদের সামনে কী দিন আসছে ?'

আমি কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

বাবা বলতে লাগলেন, 'তুমিই আমার একমাত্র ছেলে, তোমাকেই এখন সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত হতে হবে কষ্টের জন্যে, পারবে তো ?'

আমি বললুম, 'কেন পারবো না ! আপনি তো আমাদের কষ্ট করতে শিখিয়েছেন।'

বাবা আমার বোনকে ডাকতে লাগলেন, 'বুড়ি, বুড়ি !'

আমার বোন একটু গম্ভীর প্রকৃতির, সংসারে কোনো কিছু ঘটলে সে একপাশে নির্জনে সরে গিয়ে আপনমনে ভাবতে থাকে। কী যে ভাবে কে জানে !

উত্তর না পেয়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেল বলো তো ?'

আমি বললুম, 'বোধহয় ছাতে চলে গেছে।'

'এই অন্ধকারে ছাতে !'

আমি ছাতে গেলুম দিদিকে খুঁজতে। ছাতে উঠেই প্রথমে চোখে পড়লো পুবাকাশে থালার মতো বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে আর দিদি

সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে আলসেতে গালে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, যা ভেবেছি তাই, দিদি কাঁদছে।

আমি বললুম, 'চল নিচে চল, বাবা ডাকছেন। তুই কাঁদছিস কেন?'

'এমনি। একটু কাঁদতে ভালো লাগছে, তাই।'

'তুই ভাবছিস কেন? আমরা এর চেয়েও ভালো একটা বাড়িতে চলে যাবো। এই বাড়িটা তো পুরনো হয়ে গেছে। বিশ্রী হয়ে গেছে।'

দিদি বললে, 'বাড়ি যতো পুরনো হয় ততই সেই বাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়, জানিস এ বাড়িতে কত কী আছে? কত বছর এই বাড়ির মধ্যে জমা আছে? তুই ছেলেমানুষ, তোর ওসব বোঝার ক্ষমতা নেই।'

দিদি আঁচলে চোখ মুছলো। আমার সঙ্গে নেমে এল নিচে। আমি নামার আগে চাঁদটাকে আর একবার দেখে নিলুম আর তখনই মনে হলো এত সুন্দর ছাত খুব কম বাড়িতেই আছে। মা এই ছাতটাকে রোজ ঝাঁট দেন। দিদি টবে টবে ফুলগাছ লাগিয়েছে। একপাশে ঠাকুরঘর। সেই ঘরে সকাল-সন্ধে পুজো হয়। আমার মনে হলো, ঠাকুর-টাকুর সব বাজে। বাবা আর মা রোজ কত পুজো করেন। সেই ঠাকুরের কি কোনো ক্ষমতাই নেই!

বাবা বললেন, 'মা, আমাকে এক কাপ চা ক'রে দাও তো। আমাকে এখুনি একবার বেরোতে হবে। সাতদিনের মধ্যে এই বাড়ি ছাড়তে হলে আজকালের মধ্যেই আমাকে একটা বাড়ি জোগাড় করতেই হবে। এই বাজারে বাড়ি পাওয়া মুখের কথা নয়।'

আমি বললুম, 'বাবা, আমি আপনার সঙ্গে যাব?'

বাবা বললেন, 'তুমি আর এই রাতের বেলা কোথায় যাবে? আর গিয়েই বা কী হবে?'

চা খেয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমরা তিনজনে চুপ করে বসে রইলুম। বসে থাকতে থাকতে মা বললেন, 'মামলা জিনিসটা কি সাংঘাতিক, যেন বরষার নদীতে নৌকো চাপা, এই ডুবছি, এই উঠছি, —আমরা ডুবেই গেলুম।'

আমি বললুম, 'তুমি অত ভেবো না তো মা। আমি বড় হয়ে তোমাকে এর চেয়েও সুন্দর একটা বাড়ি করে দেবো।'

মা হাসলেন। দিদি বললে, 'বোকা বোকা কথা বলিসনি তো!'

অনেক রাতে বাবা ফিরে এলেন। ক্লান্ত, অবসন্ন। এই দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে মনে হচ্ছে বাবার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। আমার বাবার পাশে দাঁড়াবার মতো তো কেউ নেই। সেই কবে আমার ঠাকুর্দা ব্যবসা করবেন বলে এক মাড়োয়ারির কাছে বাড়িটা বাঁধা রেখেছিলেন। ব্যবসাটা দাঁড়িয়েও যেত যদি আমার ঠাকুর্দা গাড়ি চাপা পড়ে মারা না যেতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সব এলোমেলো হয়ে গেল। নিমতলায় আমাদের কাঠের গোলায় আগুন লেগে গেল। যা কিছু খারাপ পর পর সবই ঘটে গেল। যে মাড়োয়ারির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোকও কবে মারা গেছেন। বছরের পর বছর মামলা চলতে চলতে সেই মাড়োয়ারির ছেলেরা এখন ডিক্রি পেয়ে গেল।

বাবা বললেন, 'তোমরা খেয়ে নাও, আজ আর আমি কিছু খাব না।'

মা বললেন, 'শোনো, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ছেলেমানুষি ক'রো না। তুমি যদি এখন শুয়ে পড়ো, তাহলে আমাদের কী হবে?'

বাবা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'সারাটা জীবন তোমরা শুধু নিজেদের কথাটাই ভেবে গেলে। আমার কথাটা একটু ভাবো। আমার অবস্থা তো হালভাঙা নাবিকের মতো।'

আমরা বাবার সঙ্গে সবাই মিলে একটা বাড়ি দেখতে গেলুম। ছোট্ট একানে বাড়ি। বাড়িটা দেড়তলা। যার বাড়ি তিনি দেড়তলা পর্যন্ত করেই ক্যানসারে মারা গেছেন। বাড়িটা সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। গৃহপ্রবেশ আর করতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী এখন ভাড়া দিয়ে সংসার চালাবেন। নিচে একটা মাত্র ঘর, রান্নাঘর, ছোট্ট একটা বসার ঘর, বাথরুম আর ছোট্ট একটু উঠোন। দোতলায় বেশ বড় একটা ঘর, বাকি জায়গাটা খোলা পড়ে আছে ছাদের মতো। একটু ঘিঞ্জি মতো জায়গায় বাড়িটা। গাছপালা নেই। পূবদিকটা খোলা। বাকি সব দিক চাপা। ছ'শ টাকা ভাড়া চাইছেন ভদ্রমহিলা। মা সব দেখে-টেখে বললেন, 'কিসে আর কিসে, তবে চলে যাবে।'

বাবা বললেন, 'ছ'শ টাকা ভাড়া দিতে হলে সংসার চলবে কিসে?'

মা বললেন, 'রাস্তায় তো আর পড়ে থাকা যায় না, খাই না খাই মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই চাই তো!'

ঠিক হলো বাড়িটা নেওয়া হবে। দিদি আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে, 'বুড়ো, ওপরের ঘরটা খুব সুন্দর, তাই না?'

আমি বললুম, 'বেশ লম্বা। দম দেওয়া মটোর গাড়ি চালাতে বেশ লাগবে।'

দিদি বললে, 'দেখবি ঘরটাকে আমি কি সুন্দর করে সাজাব।'

আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বাড়ি এসে বাবা বললেন, 'তোমরা একটা লিস্ট করে ফেলো। কোন কোন জিনিস যাবে আর কোন কোন জিনিস ফেলে দিতে হবে।'

মা বললেন, 'আদ্দেক জিনিসই ফেলে দিতে হবে। সেকালের এই এতো বড় বড় ফার্নিচার এসব ও বাড়িতে ঢুকবেই না।'

বাবা বললেন, 'যা হয় তোমরা ব্যবস্থা করো। আমি এখন চাকরি বাঁচাতে চললুম।'

ঠাকুর্দার কাঠের ব্যবসা ছিল। ভালো ভালো কাঠ দিয়ে মনের আনন্দে সব জিনিস তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়িটাও ছিল বিশাল। কোনো সমস্যাই হয়নি।

মা দিদিকে বললেন, 'একটা পরিবারের প্রয়োজনে যতটুকু লাগে তুই তার একটা লিস্ট করে ফেল।'

দিদি বললে, 'আমাকে ব'লো না, আমি পারব না। আমার মন খুব খারাপ হয়ে আছে। আমার মনে হয় এ বাড়ির কোনো কিছুই ফেলার নয়। তুমি বুড়োকে বলো, ও ভেবে ভেবে ঠিক করে দেবে।'

পরের দিন দুপুরবেলা আমি একটা খাতা আর পেন্সিল হাতে ছাত থেকে শুরু করলুম। তিরিশটা ফুলগাছের টব, প্রত্যেকটা টবে এক একটা সুন্দর গাছ। একটা টবে তুলসী গাছ। তুলসী গাছে মা রোজ জল দেয়। তুলসী গাছের টবটা ছাড়া আর কোন টব যাবে না। আমি আমার খাতায় লিখলুম ১, তুলসী গাছের টব। লেখার পর অন্য গাছগুলির জন্য ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। সেই কবে থেকে এই গাছগুলি আমার সঙ্গী। দুপুরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি ছাতে এসে একটা মোটা কাঠি দিয়ে টবের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে আলগা করতুম, তখন লক্ষ্য করতুম কোনো কোনো গাছে ছোট ছোট কুঁড়ি এসেছে। গাছের কাণ্ড বেয়ে অতি ব্যস্ত কোনো কালো পিঁপড়ে ওঠানামা করছে। শক্ত মাটির ঢেলা হাত দিয়ে গুঁড়ো করতে

গিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ত ছোট্ট শামুকের সাদা খোলা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম, মনে হতো পৃথিবীর অষ্টম কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখছি। আমি গাছগুলোর দিকে আর তাকালুম না। আমরা চলে যাওয়ার পর কেই বা জল দেবে পরিচর্যা করবে! একদিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। ঠাকুরঘরে গেলুম, কোনো কিছুই ফেলা যাবে না। আমার তালিকার দু নম্বরে লিখলুম, ঠাকুরঘরের সমস্ত জিনিস। নিচে নেমে এলুম। মা বলেছে বড় খাট নিয়ে যাওয়া যাবে না। তিন নম্বরে লিখলুম, দুটো ছোট খাট। দেখতে দেখতে আমার তালিকা বড় হয়ে গেল। একসময় আমি ক্লান্ত হয়ে দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঠিক হলো, রবিবার আর সোমবার এই দুটো দিনের মধ্যে আমরা নতুন বাড়িতে চলে যাব। সকলেই যত দিন এগিয়ে আসতে লাগলো ততোই যেন গম্ভীর, প্রয়োজন ছাড়া কেউ আর কারো সঙ্গে কথা বলে না। মা একদিন দুপুরে বললে, 'বাড়িটার যা কিছু আছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাক যাতে সব কিছু মনে থাকে। দ্বিতীয়বার তো আর আসা হবে না।' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতুম, আমার মা সব কিছু ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার গরাদে হাত বোলাচ্ছে। দেয়ালগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সারাঘরের একোণ থেকে ওকোণ পায়চারি করছে। অকারণে সিঁড়ি দিয়ে একতলা থেকে উঠে যাচ্ছে তিনতলার ছাদে। সিঁড়ি গুনে গুনে নেমে আসছে। বারান্দার যে জায়গাটা সবচেয়ে প্রিয় সে জায়গাটায় গিয়ে চুপ করে বসে থাকছে অনেকক্ষণ। মা জানে আজ বাদে কাল চলে যেতে হবে তবু ঝুল ঝাড়ছে, ঘরের মেঝে পরিষ্কার করছে। আমি বেশ বুঝতে পারতুম, মায়ের দুটো চোখে জল টলটল করছে। একটু নিচু হলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কী জন্যে এত খাটছ?'

মা বললে, 'তোর বোঝার ক্ষমতা হবে না।'

এর মধ্যে বাবা একদিন দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তাঁরা ফার্নিচারগুলো দেখলেন। একটা দর-দাম হলো। তাঁরা বললেন, 'আমরা কালই গাড়ি এনে সব তুলে নিয়ে যাব।'

তাঁরা যখন জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাবা বলেছিলেন,

'আমি ব্যবসাদার নই, আমি বিপদে পড়ে বিক্রি করছি। দাম বলার সময় একটাই অনুরোধ, একেবারে ঠকাবেন না, কারণ এই টাকায় আমাকে দু'একটা সামান্য জিনিস কিনতে হবে।'

ভদ্রলোক দুজন বললেন, 'এসব সাবেক আমলের জিনিস, এসব ডিজাইন এখন অচল, কিনতে হলে আমাদের কাঠের দামেই কিনতে হবে।'

বাবা বললেন, 'আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।'

দু কাপ চা খেয়ে ভদ্রলোক দু'জন চলে গেলেন। রাতে শোবার সময় মা বললে, 'আজ আমরা মেঝেতে শোব, ঐ খাটে শুলে মায়া বেড়ে যাবে, কাল সকালে খাটটাকে আর ছাড়তে পারব না।' সে যুগের খাট, কালো ঝকঝকে পালিশ করা। কি সুন্দর ডিজাইন! মেঝেতে শুয়ে খাটের ডিজাইন দেখছি। চারটে পায়া যেন বাঘের থাবা। ওপরে মাথা আর পায়ের দিকে ফুল ও লতাপাতা খোদাই করা। খাটটার দিকে তাকিয়ে থাকার মতই কারুকার্য। মা আলো নিবিয়ে দিলো। অন্ধকারে শূন্য খাট সমাধির মতো জেগে রইলো।

পরের দিন সেই ভদ্রলোক দু'জন এলেন। বিশাল একটা লরি এনেছেন। সঙ্গে আরও লোকজন। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। অত বড় খাটটাকে একেবার টেনে হিঁচড়ে দুমড়ে মুচড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললো। মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। ওরা যখন খাটটাকে দুমড়ে মুচড়ে খুলে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, দিদি একবার বলে ফেললে, 'কি করছেন, পালিশ চটে যাবে যে।'

মা দিদিকে হাত ধরে পেছনের বারান্দায় নিয়ে গেল। দিদি উত্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে লাগলো, 'কিছু জানে না সব। এইরকম জিনিস একালে আর পাবে কোথাও। রোজ আমি নরম ন্যাকড়া আর তারপিন তেল দিয়ে পালিশ করতুম।'

মা বললে, 'ওদের জিনিস, ওরা বুঝবে। আমাদের আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি!'

বাবা এসে বললেন, 'বাবার বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা কি রেখে দোব! অত সুন্দর টেবিল! কবেকার স্মৃতি! ওই টেবিলে বসে আমি চারটে পরীক্ষার পড়া পড়েছি।'

মা বললে, 'তুমি আমাদের পাশে দাঁড়াও। ওদিকে যেয়ো না। মায়া বেড়ে যাবে। তখন একে একে কোন জিনিসই আর ছাড়তে ইচ্ছে করবে না।'

বেলা দুটো নাগাদ ওরা সব নিয়ে চলে গেল। ঘরগুলো কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে! কথা বললে ঝঙ্কার দিচ্ছে। প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ঘরগুলো হঠাৎ যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। খুব আলো বাতাস খেলছে। যেখানে এত বছর ধরে এক একটা আসবাব ছিল, সেখানে সেখানে মেঝেতে পায়ার দাগ পড়ে গেছে।

দিদি বললে, 'দেখ বুড়ো, কি মজা, মানুষ চলে গেলে কোনও দাগ থাকে না। ফার্নিচার চলে গেলে কেমন দাগ রেখে যায়!'

'আমি বললুম, 'কেন বল তো! মানুষ যে চরে বেড়ায়, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা, আর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা।'

দিদি বললে, 'বাস, বাস! আর না, এইবার চুপ।'

সেদিন আমাদের আর বিশেষ কিছুই রান্না হল না। বাড়ি একেবারে লণ্ডভণ্ড। আমরা কলাপাতায় গরম গরম খিচুড়ি খেলুম। মা খিচুড়িটা খুব সুন্দর রাঁধে। সেদিন রাতে আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি। আমার পাশে দিদি। দিদি একটা নীল শাড়ি পরেছে। চাঁদের আলো এসে আমাদের বিছানায় পড়েছে। দিদির চোখের কোল দুটো চিকচিক করছে। আমরা একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম। একসময় ঘুম ভেঙে গেলে দেখি আমার পাশে দিদি নেই। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বারান্দা দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো। জাফরির ছায়া।

বাইরে বেরিয়ে এলুম। দেখি, মা, বাবা আর দিদি ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাবা বলছেন, 'বিয়ের পর তুমি এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালে। আর মা তোমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে বরণ করলেন। এই দেখ এই জায়গাটায় হোম হয়েছিল। মেঝেতে এখনও একটা দাগ পড়ে আছে। সিলিং-এ ওই কড়া চারটে কিসের বলো তো, তোমার ছেলে আর মেয়ের জন্যে দোলনা টাঙানো হতো। মৃত্যুর পর বাবাকে এইখানে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। আমার মা জানালার ধারে এই জায়গাটায় বসে খাওয়া-দাওয়ার পর পান থেঁতো করতেন।'

সব শেষে আমরা যখন ছাদে এলুম, তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে।

দিদি বললে, 'এই আকাশ আমরা আর কোনও দিন দেখতে পাবো না। সুপুরি গাছের সারি।'

আমি বললুম, 'এই আকাশ, সেই আকাশ বলে কিছু আছে নাকি! সব আকাশই এক। আকাশ ছাড়া পৃথিবী হয়! যেদিকে মুখ তুলবি, সেদিকেই আকাশ।'

ওদের লোক এসে গেল। মাড়োয়ারিদের গোমস্তা। তার সঙ্গে আরও অনেক কর্মচারী। আমরা রাস্তায় নামার আগেই তারা শাবল মেরে গেটের পাশের নামের ফলকটা খুলে ফেলেছে। মার্বেল পাথরের চৌকো টুকরোর ওপর লেখা—'জ্ঞানদা ভবন'। জ্ঞানদা আমার ঠাকুরমার নাম। আমরা আমাদের মালপত্র বোঝাই লরিতে উঠে বসেছি। ওদের একজন এসে সেই ভারি পাথরটা বাবার দু হাঁটুর ওপর রেখে গেল। বাবা সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দ্বারা তো সম্ভব হবে না বুড়ো, তুই যদি কোথাও কোনও দিন বাড়ি করিস—এই ফলকটা ভালো করে লিখিয়ে গেটের বাইরে লাগিয়ে দিস।'

আমাদের গাড়িটা যখন প্রায় ছেড়ে দেবে দিদি বললে, 'এই যা! গাড়িটা একবার থামান তো।'

দিদি গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। আমিও নামলুম। কী আশ্চর্য! আমার মনে হলো, ওই বাড়িতে দিদির আর একা ঢোকা উচিত হবে না। কোনও বিপদ হতে পারে। দিদি আগে আগে যাচ্ছে, আমি পেছনে পেছনে। মাড়োয়ারির লোকেরা দমাদ্দম বাড়িটাকে ভাঙতে শুরু করেছে। সবাই বলাবলি করছে, এখানে বিশাল বড় একটা বাড়ি হবে।

দিদি সোজা রান্নাঘরের দিকে চললো। রান্নাঘরটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। নির্জন। খাঁ খাঁ। মরা উনুন। শুকনো মেঝে। দিদি বললে, 'ওই দেখ, বোকা কাকে বলে একবার দেখ!'

আমাদের সাদা ধবধবে, লেজ মোটা, লোমঅলা বেড়ালটা উনুনের ধারে শুয়ে আছে আরাম করে। দিদিকে দেখে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দিদির পায়ে গা ঘষতে লাগলো আর খুব আদুরে গলায় মিউমিউ।

দিদি কোলে তুলে নিতে নিতে বললে, 'তোকে আমি ভুলে ফেলেই যাচ্ছিলুম রে টুসি।'

বাবার কোলে মার্বেল স্ল্যাব, দিদির কোলে বেড়াল, মায়ের কোলে তুলসীগাছের টব। আমরা কলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে গেলুম। আর অনেক অনেক পরে আবিষ্কার করলুম, 'মনে একটা দাগ পড়ে গেছে, সেই দাগের নাম—জ্ঞানদা ভবন।'

চোর

বিকাশ আজ বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাদের সাবেক আমলের জীর্ণ বাড়ির সামনে একটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর। ওই বন্ধুটিই তাকে ভাল জায়গায় সুন্দর ছিমছাম একটি ফ্ল্যাট ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভাড়া নেহাত কম নয়। মাসে আটশো। ভাড়ার কথা আর ভাবলে চলবে না। বিয়ে যখন করেছে, বউকে সুখে রাখতেই হবে। বিকাশের বউ শ্রাবণী শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে একেবারেই মানিয়ে চলতে পারছে না। বিকাশ একবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, 'এই বাজারে মাসে মাসে আটশো টাকা গলে যাবে। বছরে ন'হাজার দুশো। দশ বছরে প্রায় এক লাখ। ব্যাঙ্কে ফেলে রাখলে কত টাকা ইণ্টারেস্ট হবে একবার ভেবে দেখ। তুমি তো হিসেবী মেয়ে। আমার মায়ের কি একটা উপোসে দশ টাকার মিষ্টি কিনে এনেছিলুম বলে তুমি অসন্তুস্ট হয়েছিলে।'

শ্রাবণীকে বোঝানো সম্ভব হয়নি। অন্যের ব্যাপারে সে কৃপণ হলেও নিজের ব্যাপারে উদার। অনেকের অনেক কিছুতে অ্যালার্জি থাকে, কারুর চিংড়ি মাছ খেলে সর্বাঙ্গে ডুমো বেরোয়। কারুর নাকে বিছানার ধুলো ঢুকলে পর পর শ'খানেক হাঁচি। শ্রাবণীর সেইরকম শাশুড়ী-অ্যালার্জি। থলথলে চেহারার কাঁচাপাকা চুল মহিলাটিকে সে সহ্য করতে পারে না। ইললিটারেট। জ্ঞানের বহর রামায়ণ আর মহাভারত আর লক্ষ্মীর পাঁচালী। আবৃত্তি ওই একটি মাত্র স্তোত্র—ভবসাগর তারণ কারণ হে। আণবিক বোমা, লেসার বিম আর কম্পিউটারের যুগেও ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করেন, মা লক্ষ্মীর কৃপায় সওদাগরের ডিঙ্গা ধনরত্নসহ আবার ভেসে ওঠে। একাসনে ঠায় একঘণ্টা বসে দুলে দুলে পুরো একটা পাঁচালী পড়লে সংসার ধনেজনে ভরে যায়। সকালে উঠে শোবারঘরে দুর্গন্ধী গোময়ের ছড়া দিতে বলেন না, এই শ্রাবণীর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। বউভাতের পরের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। বারোমেসে লক্ষ্মীপুজোর দিন। নতুন বউ পেয়ে ভদ্রমহিলা আড়াইঘণ্টা পুজোর আসনে বসিয়ে রেখেছিলেন।

উঃ, সে কি যন্ত্রণা! এমন যন্ত্রণা একমাত্র লালবাজারের পুলিস লক-আপে স্বীকোরোক্তি আদায়ের জন্য অপরাধীদেরই দেওয়া হয়! মহিলা আবার আদর করে আদুরে গলায় বলেছিলেন--সংসারের লক্ষ্মী এসে গেছে, আর আমার ভাবনা নেই। এবার থেকে পুজো তুমিই করবে মা। তোমার সংসার, তোমার লক্ষ্মী—মা তোমার মঙ্গল করুন। এই কথা বলে শ্রাবণীর কপালে একধাবড়া সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। নুইসেনস! সামান্যতম সেনস অফ ডিসেন্সি নেই। তারপর ভদ্রমহিলা বলেছিলেন--শাঁখটা তিনবার বাজিয়ে দাও তো মা। আজ তোমার ফুঁয়েই আমার ঘরের শাঁখ বাজুক। শ্রাবণী জীবনে শাঁখে ফুঁ দেয়নি। তাদের বাড়িতে শাঁখ-ফাঁক নেই। তার বাবা মা মানবধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম মানে না। দেব-দেবতা বিশ্বাস করে না। জন্মান্তর মানে না। তাদের বিশ্বাস কর্মই হল ধর্ম। শ্রাবণী গাল ফুলিয়ে ফুঁ মারে। ফুঁ ফসকে যায়। শাঁখ পোঁ না করে হুলোর মতো ফ্যাস করে ওঠে। বার-পনের চেষ্টার পর শাঁখ যখন বাজলো না, তখন শ্রাবণীকে শাশুড়ী বললেন, 'ছি ছি, কি অলক্ষণ! এই প্রথম এক ফুঁয়ে আমার সংসারের শাঁখ বাজল না। তোমার মা কি তোমাকে এসব শেখান নি! স্বাস্থ্য তো তোমার ভালই মা, তাহলে তোমার ফুঁ কেন এমন এলেবেলে!'

একেবারে আনকোরা নতুন বউ, তাই শ্রাবণী সেদিন মুখ খুলতে পারেনি, তা না হলে বলত, 'বউ বলে তো আর বিসমিল্লা খাঁ নয় যে ফুঁ দিলেই শাঁখ সানাইয়ের মতো পোঁ মারবে। আর স্বাস্থ্য বলছেন, বাপ-মা ভালমন্দ খাইয়েছেন। ছেলের পয়সায় নিজের গতরটিও তো মন্দ হয়নি!'

সেদিন মাঝরাতে বিকাশের কি বিপদ! শ্রাবণীর গাল টাটিয়েছে। কেবলই বলে, 'গাল দুটো যদি পেকে যায়! তোমার মায়ের জন্যে শেষে গাল দুটো না ফুটো করতে হয়!'

বিকাশ বলেছিল, 'কোনও রকমে রাতটা কাটাও, সকাল হলেই ডাক্তারবাবুকে কল দোব।'

দুশ্চিন্তায় বিকাশ পুরো এক প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলল।

সকালে গাল অবশ্য সেরে গেল, দেখা দিল অন্য সমস্যা। চায়ের কেটলিতে হাত দেওয়া মাত্রই বিকাশের মা বললেন, 'তুমি বাসী কাপড় ছেড়েছিলে?'

'সে আবার কি ?'

'তুমি বাসী কাপড়ে আমার সৃষ্টি ছুঁয়ে দিলে! তুমি তো কিছুই শেখনি মা। একেবারে ম্লেচ্ছ স্বভাব।' বিকাশের মা তখনি ছেলেকে ডেকে বললেন, 'আমাদের সংসারের ধারা একে একটু শেখাবার চেষ্টা কর। এ তো আমাদের ধারার একেবারে বিপরীত। এইজন্যেই আমাদের কালে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত।'

শ্রাবণীর খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন। সে কি ঝি না চাকর!

সেই প্রথমদিনের ঠোকাঠুকি বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এল, দুপক্ষে বাক্যালাপ বন্ধ। ভদ্রমহিলা সবেতেই শ্রাবণীর খুঁত ধরতে লাগলেন, বাথরুমে ভিজে কাপড় জড়ো করে রেখে বেরিয়ে এসেছে। কল ভাল করে বন্ধ করেনি, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। চিনির কৌটোর ঢাকনা চেপে বন্ধ করেনি, পিঁপড়ে ঢুকেছে। মেয়েছেলের আবার অত জোরে হাসি কি? পাশের ঘরেই শ্বশুর পুজোয় বসেছেন। শব্দ করে ঢেকুর তুলেছে। হেঁচে আবার সুর টেনেছে। নাইয়ের নীচে পেট বের করে শাড়ি পরেছে।

শ্রাবণী শেষে বিকাশকে একটি কথাই বলেছিল—ধ্যাত্ তেরিকা!

বিয়ের পর মানুষের বন্ধুরাই বড় হয়। বিকাশের বন্ধুরা বললে, 'দু নৌকোয় পা রেখে জীবন চালানো যায় না। একটা ডিসিসানে আয়। একে বলে জেনারেসান গ্যাপের সমস্যা। এই গ্যাপের মাঝখানে কোনও সেতু দেওয়া যায় না। আলাদা হয়ে যাও।'

বিকাশ আজ আলাদাই হয়ে যাচ্ছে। বিকাশের পিতা আশুবাবু নির্বিরোধী মানুষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কম কথার মানুষ। একটি মাত্র ছেলে। কষ্ট করে মানুষ করেছেন। বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে ভাল চাকরি করে। সারাজীবন অনেক খেটেছেন। লোকে বলত, প্রতিষ্ঠিত সন্তান এইবার আপনাকে দেখবে, আর ভাবনা কি! শুনতে শুনতে মনে বেশ একটা বিশ্বাস এসেছিল। ভবিষ্যতের সুন্দর একটা আদল তৈরি হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলেন—যাটটা বছর আনইজি কাটল, এইবার একটা ইজিচেয়ার কিনবেন। দুপুরে সেই ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বউমাকে বলবেন, 'এডিটোরিয়ালটা পড়ো তো মা। চোখ বুজিয়ে শুনি।'

ভেবেছিলেন, শীতে সপরিবারে একটু চেঞ্জে যাবেন। যে জায়গার

যা ভালো, বউমাকে নিজে হাতে খাইয়ে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পাবেন, যখনই সে সমর্থন করবে—সত্যিই বাবা দেওঘরের পেঁড়া, কাশীর মালাইয়ের কোনও তুলনা হয় না। কোনও তুলনা হয় না লক্ষ্ণৌয়ের কুমড়োর বরফির।

ভেবেছিলেন, বউমার কাঁধে হাত রেখে শীতের সকালে গল্প করতে করতে এগিয়ে যাবেন দেউঘরে সেই নীল পাহাড়টির দিকে, যার নাম ত্রিকুট। যেতে যেতে প্রশংসা করবেন বউমার গায়ের কার্ডিগানটির। প্রশংসা করবেন তার রান্নার। প্রশংসা করবেন তার কণ্ঠের। প্রিয়জনের প্রশংসা যখন তার খুশি হয়ে ফিরে আসে তার চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কিছুতে নেই।

ভেবেছিলেন, নিজে পড়িয়ে বউমাকে ইংরেজিতে এম. এ.টা পাশ করাবেন। সারাজীবন বাইরের ছাত্রছাত্রী নিয়েই মেতেছিলেন, এতদিনে ঘরে একটি বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়েছেন। বড় আপনজন। সে আর হল না।

ভেবেছিলেন, শীতকালের দুপুরে ছাদে ইজিচেয়ারে তিনি বসবেন। কোলে বসে তাঁর ফুটফুটে নাতিটি কমলালেবু খাবে। তিনি একটি একটি করে কোয়া সাবধানে সুন্দর করে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে হাম খাবেন। মুখের শিশু-শিশু গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকবে কমলালেবুর গন্ধ। সে আর হল না।

স্ত্রীকে একান্তে ডেকে আশুতোষ রায়, বিন্ধ্যবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'সেকালে আর একালে অনেক তফাৎ। কেন তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে সংসারটাকে মরুভূমি করতে চাইছ!'

স্ত্রী সুরবালা বলেছিলেন, 'রায়বংশের গত একশো বছরের একটা ধারা আছে। আমিও পরের মেয়ে। আমি এ বাড়িতে এসে আমার শাশুড়ীর কাছে শিখেছি। বিকাশের বউ হতে পারে, আমার তো মেয়ে। সেকালই বলো আর একালই বলো, সবকালেই ভাল যা তা ভাল। খারাপ যা তা খারাপ। ধর্ম মানে তোমার ওই পট, পাঁচালী নয়, ধর্ম মানে একটা জায়গায় নিজেকে কিছুক্ষণ ধরে রাখা।'

আশুবাবু তর্ক পছন্দ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, জলের যেমন গতি আছে, সময়ের যেমন গতি আছে, সেইরকম জীবনেরও

একটা গতি আছে, যার নাম নিয়তি। তিনি শেষ যে কথাটি নিজেকে বলেছিলেন, তা হল—'যাকগে'। অসহায়ের আত্মসমর্পণের উক্তি। কারুর প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই, অভিযোগ নেই। তাঁর পিতা বলতেন—জীবন এক অরণ্য, হাতে শক্ত করে ধরে রাখ সময়ের কুঠার, ছেদন করতে করতে এগিয়ে চলো নিজের পথে, মাঝে মধ্যে অনাসক্তির পাথরে কুঠারের ফলাটি ঘষে ধার দিয়ে নাও। মানুষের কাছে চেয়ো না কিছু। সম্পর্ক গড়ে তোল প্রকৃতির সঙ্গে। মানুষের একমাত্র বন্ধু আকাশ ও বৃক্ষ।

দরজার সামনে গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। প্রয়োজনীয় নির্বাচিত জিনিসপত্র উঠছে। বিকাশ কিছুই তেমন নিয়ে যাচ্ছে না। সম্প্রতি তার অর্থ হয়েছে। নতুন জায়গায় নতুন করে সে সব কিছু সাজাবে। আশুবাবু সামনের বারান্দায় সময়ের ফুলগাছ লাগিয়েছেন টবে। একটি টবের সামনে উবু হয়ে বসে মোটা একটা কাঠি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করছেন। গাছটা লেগে গেছে। তলার দিকে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিন্দু বিন্দু পাতার ভ্রূণ বেরিয়েছে। মৃত্যুর সংসারে কোনও কিছু জন্মাতে দেখলে মন আশায় ভরে ওঠে। গাছকে তাঁর মনে হয়, নিরন্তর এক সাধক। এক আসনে বসে শুধুই যার ঊর্ধ্বারোহী সাধনা। গাছের আনন্দ, সবুজ পাতা আর অজস্র ফুল।

একমাথা সাদা চুল, আয়ত দুটি চোখ, ঋজু, শ্যাম চেহারায় আশুবাবু যেন এক ঋষি। দুঃখজনক একটা ঘটনা যখন ঘটতে চলে তখন মানুষের মনে অদৃশ্য কোনও উৎস থেকে ভীষণ একটা সহ্যশক্তি এসে যায়। আশুবাবুকে সেই কারণে মোটেই বিচলিত মনে হচ্ছে না। তিনি জানেন ছেলের রোজগারের মোটা একটা টাকার অঙ্ক সরে যাওয়া মানে বিশাল একটা শূন্যতা তৈরি হওয়া। তা হোক, জীবনযাত্রার মানকে নিজের সাধ্যসীমার ওপরে তিনি কখনই উঠতে দেননি। তখন নিজের রোজগার ছিল, এখন আর রোজগার নেই, সামান্য কিছু সঞ্চিত আছে, তাইতেই টেনেটুনে চালাতে হবে। বয়েস হয়েছে। দুবেলা খাওয়ার আর প্রয়োজন কি। না হয় একাহারীই হবেন। তাতেও যদি সামাল দেওয়া না যায়, তাহলে জীবনে কখনও যা করেন নি, তাই করবেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াবেন। ছাত্রের অভিভাবকরা চিৎকার

করে ডাকবেন, খোকা আয়, মাস্টার এসেছে। এ এমন একটা কাল, মাস্টারের পর মশাই বসাবার ভব্যতা ভুলেছে।

ছেলে আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবার ভয়ে সুরবালা ঠাকুরঘরে ঢুকে বসে আছেন। শেষ তিক্ত কাজ, বিদায়-পর্বটি সারার জন্যে স্বামীকে রেখে গেছেন। আশুবাবুর কোনও অভিমান নেই। ছেলের ভবিষ্যতের জন্যে কোনও উদ্বেগও নেই। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, আর ভাবনা কি। টবের ডেলা ডেলা মাটি ভেঙে ঝুরো ঝুরো, আরও ঝুরো করতে করতে আশুবাবু মাঝে মাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন আর ভাবছেন, বিকাশও একদিন এই টবের গাছটির মতো চারা ছিল। কত পরিচর্যা, কত রাত্রিজাগরণে সে বড় হয়েছে! মানুষ এমন এক গাছ, সহজেই এক জমি থেকে আর এক জমিতে শিকড় নামাতে পারে।

'বাবা কোথায়' বলে বিকাশ আর শ্রাবণী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আশুবাবু টবের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সামনে একটু ঝুঁকে আছেন। বয়েসের কোমর চট করে সোজা হতে চায় না। শ্রাবণী বললে, 'বাঃ, জাপানী মল্লিকা গাছটা তো বেশ লেগে গেছে। এ-বছর খুব ফল হবে।'

বিকাশ বারান্দাটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ির মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল এই বারান্দাটা। শীতের দুপুরে মাদুর পেতে ছাত্রজীবনে এইখানে বসে পাতার পর পাতা প্রশ্নোত্তর লিখত। অংক কষত। দেখতে দেখতে পথের ওপর শেষ দুপুরের ছায়া নেমে আসত। কত রকমের ফেরিওলা যেত। সামনের ঢালু আকাশটা ক্রমশ গাঢ় নীল হয়ে উঠত। দূরে ওই হলুদ বাড়িটার ছাদে, আলসেতে চুল এলো করে শীতের রোদ পোহাতো চিত্রা। এপাড়ার সবচেয়ে রূপসী মেয়ে। বাড়িটা আছে। চিত্রা নেই। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে টিভি অ্যান্টেনা। তার ওপর বসে আছে একজোড়া শালিখ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই পথ, এই আকাশ, পরিচিত বাড়িঘর মানুষজন আর দেখতে পাবে না বিকাশ।

আশুবাবু বললেন, 'তোমরা তাহলে চললে?'

তাহলে শব্দটা বিকাশের বুকে ধাক্কা মারল। শ্রাবণী বললে, 'হ্যাঁ

বাবা, আমরা আসছি।' তারপর প্রথামতো যোগ করল, 'সাবধানে থাকবেন। যখনই ইচ্ছে হবে আমাদের কাছে চলে আসবেন।'

বিকাশ নিচু হয়ে প্রণাম করল। আশুবাবু আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাতটি তুলে বললেন, 'মঙ্গল হোক।'

শ্রাবণীকে বললেন, 'আনন্দে থেকো।'

দু'জনে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। আশুবাবু দেখছেন। শুধু মেয়েই নয়, বিয়ের পর আজকাল ছেলেও পর হয়ে যায়। দেশটা সত্যিই বিলেত হয়ে গেল। হঠাৎ আশুবাবুর নজর চলে গেল ঘরের দেয়ালের দিকে। সেখানে একটি ছবি ঝুলছে। বিকাশের অন্নপ্রাশনের সময় সুরবালা শখ করে তুলিয়েছিল। পুত্রগর্বে গরবিনী মাতা। যৌবনে সুরবালা সুন্দরী ছিলেন। আশুবাবুও সুন্দর ছিলেন।

আশুবাবু চলে যাওয়া ছেলেকে ডাকলেন, 'পিছু ডাকছি না, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাও।'

এগিয়ে গিয়ে দেয়াল থেকে ছবিটা খুলে এনে বিকাশকে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার শৈশবটা নিয়ে যাও। তোমারও যে একটা পরিবার ছিল, সেটা তোমার সন্তানকে জানানো প্রয়োজন, তা না হলে তার অবিশ্বাস এসে যাবে। অতীতকে অস্বীকার করলে বর্তমানটা চোরকুঠুরির মতো বন্ধ হয়ে পড়ে।'

বিকাশ ছবিটা নিল। ছবির শিশুটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে মনে হল চোর। একজনের বিশ্বাস, নির্ভরতা, সাধনা, সময় হরণ করে সে পালাচ্ছে। বিকাশের পা যেন মাটিতে বসে যাচ্ছে, তবু তাকে যেতেই হবে। বিবেকের চেয়ে অহং বড়।

গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ হল। আশুবাবু রাস্তার দিকে আর ফিরে তাকালেন না। অনেকদিন বেঁচে থাকলে মানুষের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়। আশুবাবু দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেখানে অনেক দিন ধরে ওই ছবিটা ঝুলছিল। সেখানে পড়ে আছে সাদা চৌকো একটা দাগ। ওই চৌকো দাগটুকুতে ঘন হয়ে আছে জীবনের তিরিশটা বছর। তিরিশটা বছর তাঁর হরণ করে নিয়ে গেল একটি মেয়ে।

যার যেমন

আমি একটা মানুষ? আমার কোনও ইয়ে আছে? এই ইয়ে শব্দটার কোনও তুলনা নেই। 'ইয়ে'টা যে 'কিয়ে' তা ব্যাখ্যা করা যায় না; ভেতরে অনেক না-বলা বাণী ঢুকে আছে। আমার কোনও 'ইয়ে' নেই। আমাতে আর মৃগাঙ্কতে অনেক তফাৎ। আমাতে আর অভিজিতে অনেক তফাৎ। মৃগাঙ্ক, অভিজিৎ, গজেন আলাদা আলাদা নাম হলেও একই ধরণের মানুষকে বোঝাচ্ছে। সফল মানুষ। জীবনে সফল। জীবিকায় সফল। ফুচকার মতো ভোগের জলে টই-টম্বুর হয়ে ভাসছে।

রোজ সন্ধেবেলা আমিও বাড়ি ফিরি। মৃগাঙ্ক কি গজেনও বাড়ি ফেরে। কত পার্থক্য। আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মৃগাঙ্কর গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সিলভার গ্রে রঙের দোতলা বাড়ি। চারপাশে বাগান। বারান্দায় আইভি-লতা, যুঁই। গেটের মাথায় লোহার অর্ধ-চন্দ্র। তার ওপর বোগেনভিলিয়ার আসর, যেন সানাই বাজাতে বসেছে আলি আহমেদ খান। বাগানে নানা রঙের গোলাপ, হাসনুহানা। যত রাত বাড়ে, রোমান্টিক হতে থাকে, ততই গন্ধ বাড়তে থাকে। মৃগাঙ্কের লিপস্টিক লাল গাড়ি বাড়ির সামনে থামা মাত্রই চারজন ছুটে আসে—মৃগাঙ্কর মা, মৃগাঙ্কর বউ, মৃগাঙ্কর ছোকরা চাকর, মৃগাঙ্কর ধেড়ে অ্যালসেসিয়ান। ড্রাইভার দরজা খোলা মাত্রই মৃগাঙ্কর ডান পা বেরিয়ে আসবে। ঝকঝকে জুতো। কুচকুচে কালো মোজা। ধবধবে সাদা চামড়া। ডান পা-কে অনুসরণ করবে বাঁ পা। মৃগাঙ্ক নামক বিশেষ্যটি স্প্রিং-এর মতো নেমে আসবে। বেলুন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেলে যে রকম হাল্কা নাচে, মৃগাঙ্ক ঠিক সেইরকম অল্প একটু নেচে নেবে। পরিধানে রুলটানা স্যুট। বুকের ওপর চওড়া টাই। চোখে বিলিতি ফ্রেমের চশমায় অভিমানী কাঁচ। পোলারাইজড গ্লাসের বাংলা অনুবাদ। কাঁচে রোদ লাগলে অভিমানে কালো হয়ে ওঠে।

মৃগাঙ্ক যখন স্প্রিং-এর মতো নাচছে তখন ড্রাইভার আর ছোকরা

দু'জনে মিলে গাড়ির পেছন হাতড়ে মালমশলা নামাতে ব্যস্ত। প্রচুর প্রচুর মশলা নামে। রোজই নামে। প্রথমে নামবে একটা বাস্কেট। বেতের তৈরি সুদৃশ্য একটি ব্যাপার। মনে হয় ত্রিপুরা থেকে স্পেশ্যাল আমদানি। সাধারণ মানুষের হাতে অমন বস্তু সহসা দেখা যায় না। লণ্ডন থেকেও আসতে পারে। কারণ মৃগাঙ্কর সবই ফরেন। দিশি মালে অসম্ভব ঘৃণা। পারলে দিশি দেহটাকেও বিলিতি করে ফেলত। উপায় নেই। সে করতে হলে মরতে হবে। মরে টেমসের ধারে পিটার বা রবিনসনের ঘরে জন্মাতে হবে। আবার নব ধারাপাত প্রথম ভাগ দিয়ে জীবন শুরু করতে হবে। বাস্কেটে কী থাকে আমি জানি। থাকে লাঞ্চবক্স। এক বোতল বিশুদ্ধ জল। গরম করে, ঢালা-ওপর করে, হাওয়া খাইয়ে ক্লোরিন দিয়ে বোতলে ভরা। এ দেশে জল নিয়ে নাকি ইয়ার্কি চলে না, জল এ দেশে জীবন নয়, মরণ। পাট করা একটা নরম তোয়ালে থাকে। থাকে সিজন্যাল ফ্রুটস, দু-একটা ওষুধ। কথায় বলে, প্রিভেনসান ইজ বেটার দ্যান কিওর। দামী শরীর। কত কিছুর আক্রমণ থেকে সামলে রাখতে হয়। একজিকিউটিভ ব্যামো কী একটা! হার্টে জমাট রক্ত ধাক্কা মারতে পারে। লিভারে কি লাংসে ক্যানসার ঢুকতে পারে। মৃগাঙ্ক আগে যখন এতটা দামী ছিল না, তখন একের পর এক খুব সিগারেট খেত। এখন ভীষণ টেনসানের সময় একটা কি দুটো। তাও দামী বিলিতি।

বাস্কেটের পর নামবে ব্রিফকেস। নামবে একটা সুদৃশ্য ফ্লাস্ক। সারাদিনের মতো কয়েক গ্যালন দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া কালো কফি থাকে। আর নামে পার্ক স্ট্রীটের দামী দোকানের কেক আর প্যাস্ট্রির বাক্স। এ এক এলাহি ব্যাপার। রোজ সকালে লোডিং, রোজ বিকেলে আনলোডিং। শরীরের রক্ত-সঞ্চালনকে একটা লেভেলে এনে মৃগাঙ্ক প্রথমেই যা করবে তা হল ওই বাঘের মতো কুকুরটার সঙ্গে একটু আদিখ্যেতা। কুকুরের সাহেবি নাম রেখেছে, রাখুক, আমার কিছু বলার নেই, অ্যালসেসিয়ান। তার নাম ভোলা কি গজা রাখলে মানাত না। মৃগাঙ্ক কুকুরের মাথা চাপড়াবে আর বলবে, 'ডিক্, আমার ডিক্, তোমার সব ঠিক?'

ডিক্ আধ হাত জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করবে।

মৃগাঙ্ক আদুরে গলায় বলবে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্দো গয়ম, গয়ম।' তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বলবে, 'ওঃ, হোয়াট এ সালট্রি ওয়েদার ! অফুল !'

কুকুর ছেড়ে মৃগাঙ্ক সামনে এগোতে থাকবে আর তার বুকের কাছে টাইয়ের নট খুলতে খুলতে পেছোতে থাকবে মৃগাঙ্কর মেয়ে। মৃগাঙ্কর সময় খুব কম। বাড়িতে ঢুকে টাইয়ের ফাঁস খোলার সময়টুকুও সে দিতে চায় না। বাপির যে সময়ের খুব অভাব মৃগাঙ্কর মেয়ে তা জানে। মেয়ে কেন, বাড়ির সবাই তা জানে। মৃগাঙ্ক কথায় কথায় বলে—'সিসটেম', 'প্ল্যানিং', 'ইউটিলাইজেসন'।

বাড়িতে ঢোকা মাত্রই মৃগাঙ্কর বউ একটা হাঙ্গার হাতে পাশে এসে দাঁড়াবে। মৃগাঙ্ক হাত দুটো পেছনদিকে ছেতরে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছোকরা চাকর কোটটা সুরুৎ করে খুলে নিয়ে মেমসায়েবের হাতে দিয়ে দেবে। মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসবে। নিমেষে খুলে ফেলবে জুতো মোজা।

মৃগাঙ্কর মেয়ে বিলিতি স্টিরিও সিসটেমে সেতার চড়াবে। মৃগাঙ্ক বলে, মিউজিকের একটা সুদিং এফেক্ট আছে। সেতার শুনতে শুনতে জামা আর ট্রাউজার খোলা হয়ে যাবে। হাতে এসে যাবে নরম তোয়ালে। মৃগাঙ্ক ধীরপায়ে এগিয়ে যাবে বাথরুমের দিকে। ফাইভ স্টার বাথরুম। এই সময় লোডশেডিং হতে পারে। হলেও ক্ষতি নেই। নিজস্ব জেনারেটার আছে। ফ্যাট্ ফ্যাট্ চলবে। ফটাফট আলো জ্বলে উঠবে। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্কর আয়নার মুখ হেসে উঠবে। ছোট্ট করে মুখ ভ্যাংচাবে নিজেকে। মৃগাঙ্ক পড়েছে, মনটাকে শিশুর মতো করে রাখতে পারলে শরীর ফিট থাকে। যৌবন আটকে থাকে। স্মৃতি ভোঁতা হয় না। মৃগাঙ্ক কোমর দুলিয়ে খানিক নেচে নেবে। নিজের সঙ্গে আবোলতাবোল কথা বলে। শিশুর মতো বলতে থাকে, বিশ্বকর্মা পুজোয় মাঞ্জা দিয়ে ঘুড়ি ওড়াবো। ঘুড়ি কিনব, একতে, আন্দে। কাল সকালে পড়া হয়ে গেলে গুলি খেলব। খোকন আমার সঙ্গে পারবে ?

খোকন ছিল মৃগাঙ্কর বাল্য-বন্ধু। এখন কোথায় আছে কে জানে।

মৃগাঙ্ক বলবে, বড়দি দুটো টাকা দিলে, দু টাকারই লেবুলজেন্স কিনবো। যত সব ছেলেবেলার পরিকল্পনার কথা বলতে থাকে একে

একে। বলতে বলতে একেবারে শিশুর মতো হয়ে যাবে। ঘুরে ঘুরে বারকতক নাচবে। তারপর বাথটাবের কল দুটো খুলে দেবে। তখন সে গণিতজ্ঞ। গরম জলেরটায় দু'প্যাঁচ মেরে, ঠাণ্ডা জলেরটায় মারবে ছ'প্যাঁচ, তবেই সে 'টেপিড ওয়ার্ম' জল পাবে। বাথটাব ভরে গেলেই জলে একখাবলা নুন ফেলে দেবে। এই নুন তাকে গেঁটেবাত থেকে বাঁচাবে।

নুনটা গলতে মৃগাঙ্ক জোরে জোরে দম নিতে নিতে 'চেস্ট একসপানসান' করবে। তারপর দেহটাকে সমর্পণ করবে বাথটাবের জলে। ডান হাতের নাগালের মধ্যে দেওয়ালদানিতে বিলিতি সাবানের দুধসাদা কেক। মৃগাঙ্ক জল নিয়ে ভুঁড়িতে থ্যাপাক থ্যাপাক করবে। ছোট ছেলের মতো নানারকম শব্দ করতে থাকবে মুখে। তখন সে আর শিশু নয়। একেবারে সদ্যোজাত। ওঁয়া ওঁয়া করলেই হয়।

এই সময়টাকে মৃগাঙ্ক বলে, 'মোমেণ্টস অফ ব্লিস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস'।

এইবার আমার কথায় আসি। আমি আর মৃগাঙ্ক সমবয়সী। কপালগুণে মৃগাঙ্ক গোপাল, আর আমি কপালদোষে গরু। আমার গাড়ি নেই। আমার বাহন মিনি। আমি মিনিতে ধারের আসনে আধ-ঝোলা হয়ে বসব। দেখতে দেখতে ক্ষুদে যানের কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে যাবে যাত্রীতে। আমাকে ভুঁড়ি দিয়ে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে। ব্রহ্মতালুতে কনুই মারবে। মেয়েরা মাথার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ রাখবে। মাঝে মাঝে আঁচলে মুখ ঢেকে যাবে। একবার এক ভদ্রলোক আমার মাথায় নস্যির ডিবে রেখে নস্যি নিয়েছিলেন।

আমি ওইরকম আড়কাত হয়ে ঘণ্টাখানেক থাকবো। জ্যাম থাকলে দেড়, দু' ঘণ্টা। তারপর ধুপুস করে স্টপেজে নামব। কণ্ডাকটার মাথায় চাঁটি মেরে টিকিট দেখতে চাইবে। আমার আকৃতিটাই এই রকম যে যেই দেখে সেই ভাবে, ব্যাটা একটা ছিঁচকে চোর। মেরে পালানো পার্টি। চেহারায় কোনও আভিজাত্য নেই। বড় দোকান থেকে জিনিস কিনে বেরোবার সময় দরজার ধারে টুলে বসে থাকা দরোয়ান বিশ্রী গলায় বলবেই বলবে, 'ক্যাশমেমো'! এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমি কোনও দিন ভুলবো না। একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলা দিয়ে লিণ্ডসের দিকে হেঁটে চলেছি। আমার সামনে হাঁটছেন,

লম্বাচওড়া 'স্যুটেড-বুটেড' এক ভদ্রলোক। তাঁর ঠোঁটে বাঁকা করে ধরা একটি পাইপ। পাইপ থেকে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। তিনি চলেছেন, আমি চলেছি। তিনি চলেছেন গ্যাটম্যাট করে, আমি চলেছি খুড়ুস খুড়ুস, যেন ঘোড়ার পেছনে গাধা।

লিন্ডসেতে পড়ে তিনি বাঁয়ে বেঁকলেন, আমিও। তারপর আবিষ্কার করলুম, দু'জনেরই গন্তব্যস্থল এক। একই দোকানে। দোকানের কাঁচে, দরজার সামনে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষক টুল থেকে তড়াক করে উঠল, সেলাম বাজাল, দরজা টেনে ধরল, পাইপ ঢুকে গেলেন, আর আমি যেই ঢুকতে গেলুম, দরজাটা সে ছেড়ে দিলে ধাঁই করে আমার নাকের ওপর। আমার শরীরের একমাত্র শোভা আমার নাক—পিচবোর্ড কাট। আমার লম্বাটে মুখের ওপর খাড়া হয়ে আছে। যেন ওটা আমার নাক নয়—প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতে গীতা যেমন প্রক্ষিপ্ত। ও নাক এ মুখের নয়, অন্য কোনও মুখের। অনেকটা নাকুমামার মতো। আমার স্ত্রী যখন আমাকে ন্যাকা বলে, তখন মনে হয় এই নাক দেখেই বলে। আমারও কিছু কিছু শুভার্থী বন্ধু আছেন, সবাই আমার শত্রু নয়। সেই রকম এক বন্ধু বলেছিল, 'তোমার গাল দুটো দেবে যাওয়ায় নাকের স্ট্রাকচারটা অত ঠেলে উঠেছে। গালদুটো সামহাউ একটু ভরাট করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার ঐ মুখ যা দাঁড়াবে না! জেম অফ এ পীস। ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মতো হয়ে যাবে।

তারপরই আবিষ্কার করলুম, গাল ভরাট করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। অনেকটা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মতো। পুকুর ভরাট করা যায়, চোয়াড়ে গাল ভরাট করা যায় না। ধার করে, দেনা করে ফ্যাট খাও, প্রোটিন খাও, ভুঁড়িটাই বেড়ে গেল, খাবলা গাল খাবলা গালই থেকে গেল।

দোকানের দরজাটা ধাঁই করে নাকে লাগতেই সর্দি হয়ে গেল। আমি তো আর মুষ্টিযোদ্ধা নই। নাকে ঘুষি হজম করার শক্তি কোথায়? দ্বারপালকের ওপর রাগ হল। তার বয়েই গেল। আমার মতো ফেকলুকে সে পাত্তা দেবে? ঠান্ডা, সুন্দর দোকানের ভেতর সেই সমাদৃত পাইপ ঘুরে ঘুরে শাড়ি দেখছেন, কার্পেট দেখছেন, বিছানার চাদর দেখছেন। কী আগ্রহ নিয়ে দোকান-বালিকারা তাঁকে দেখাচ্ছেন। তিনি মাঝে মাঝে পাইপ-চ্যুত হয়ে অল্পস্বল্প মন্তব্য

করছেন। আমাকে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। বলছি চাদর, বলছে—ওই তো চাদর, দেখুন না। বলছি শাড়ি, বলছে—এখানে শাড়ির অনেক দাম।

পাইপ সারা দোকান ওলটপালট করে দিয়ে, শুধু হাতে প্রস্থান করলেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে বলতে শুনলুম, ন্যাট মাই চয়েস, দ্যাটিস নট ফাইন, বেটার সামথিং। ভেবেছিলুম বড় খদ্দের যাবার পর ছোটটার দিকে নজর পড়বে। কোথায় কী? সুন্দরীরা নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁদের সামনে কাউণ্টারের উল্টোদিকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। মোটা সুন্দরী, ছিপছিপে সুন্দরী, রোগা সুন্দরী, ভুরুওলা সুন্দরী, ভুরু আঁকা সুন্দরী, খোঁপা সুন্দরী, এলো সুন্দরী। কত কী যে তাঁদের বলার আছে! মাধুরীদি স্বপ্নাকে কী বলেছে? সান্যালদাটা ভীষণ অসভ্য। ওরই মধ্যে একজন বলে ফেললে, পোঁদে লাগে, একদিন ঝাড় খাবে। আমার রুচিশীল কান বললে, পালাও। পালাব মানে? সোজা ম্যানেজার। তিনি ছুটে এলেন, 'তোমরা ভদ্রলোককে শাড়ি দেখাচ্ছ না কেন?' স্লিম সুন্দরী আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললেন, 'আহা, বোবা নাকি? না বললে দেখাব কী?'

আমার প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ভবাপাগলার নাম শুনেছি, আমি এক প্রেমপাগলা। এই করেই আমার বউয়ের প্রেমে পড়ে জীবনটা নষ্ট করেছি। মৃগাঙ্ক হতে হতেও হওয়া হল না। সংসারের ম্যাও সামলাতে সামলাতেই খাটে যাবার সময় হয়ে গেল। প্রবীণা এক মহিলা বললেন, 'সীমা, ভদ্রলোককে ওই ওপরের থাকের শাড়িগুলো দেখাও।' চালাকিটা পরে বুঝলুম। আমাকে অপদস্থ করার জন্যে সবচেয়ে দামী দামী শাড়ি একের পর এক নেমে এল। সাড়ে চারশো, সাতশো, সাড়ে নশো।

আমি বললুম, 'আর একটু কম দাম?'

'এ দোকানে কম দামের শাড়ি রাখা হয় না।' আমি সেই ক্ষয়া চাঁদের চোখের কোণে কাবু হলে কী হবে, তিনি আমার খাড়া নাকের আভিজাত্যকে মোটেই সমীহ করলেন না। আমি প্রায় মরিয়া হয়েই সাড়ে চারশো দামের একটা শাড়ি কিনে ফেললুম। তখনও আর এক-জনের ওপর বদলা নেওয়া বাকি ছিল। ওই সেই দ্বারপাল। শাড়ির

প্যাকেট বগলে নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আগেই দেখে রেখেছিলুম, সে পাইপকে উঠে দাঁড়িয়ে, দরজা খুলে সেলাম করেছিল। বললুম, 'গেট আপ।'

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ধমকের সুরে বললুম, 'গেট-আপ।'

তখন আমার সংহার মূর্তি। উর্দি উঠে দাঁড়াল।

'দরওয়াজা খোল।'

দরজা খুলে ধরল। তখনও তার আর একটা কাজ বাকি।

'স্যালুট। সেলাম বাজাও।'

সেলাম করল। আমি সেই পাইপ-দাদার মতো গ্যাটম্যাট করে বেরিয়ে এলুম। লোকটা মহা শয়তান। আমার শরীরটা পুরো বেরোবার আগে দরজাটা ছেড়ে দিল। কড়া স্প্রিং। দুম্ করে দরজাটা আমার পায়ের গোড়ালিতে ধাক্কা মারল। মারুক। আমি আমার পাওনা আদায় করে নিয়েছি।

এই এত বড় একটা ভণিতার কারণ, আমার দুঃখ। লোকটাকে কেউ সামান্যতম পাত্তা দেয় না। না বাড়ির লোক, না বাইরের লোক। কেন? কারণটা কী? এক জ্যোতিষীকে বলেছিলুম, 'একবার দেখুন তো মশাই হরোসকোপটা! কোথায় কোন্ গ্রহ এঁকেবেঁকে আছে!'

অনেক অঙ্কটঙ্ক কষে তিনি বললেন, 'আপনার রবিটা খুব ড্যামেজ হয়ে আছে, যে কারণে চামচিকিতেও আপনাকে লাথি মারবে। মটরদানার মতো একটা হীরে পরুন।' হীরে পরব আমি! আমি কি মৃগাংক? দশ, বারো, চোদ্দ—কত হাজার পড়বে কে জানে! মারুক চামচিকিতে লাথি! যাক, যে কথা বলছিলুম, মিনি থেকে নেমে আমাকে এ দোকান, সে দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে হবে। কেরোসিন কুকারের পলতে, চিঁড়ে, ছোলা, বাতাসা, বাদাম, মাথাধরার ওষুধ, সেজের চিমনি, মুরগীর ডিম, পুজোর ফুল। কেনাকাটার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। নিতান্তই মধ্যবিত্তের জিনিস। মৃগাঙ্কর প্যাটিস, পাস্ট্রি নয়। আর সবই বিপরীতধর্মী জিনিস। ফুলের সঙ্গে ডিম ঠেকবে না। বাতাসায় চাপ পড়বে না। চিমনি চাপ সইবে না। এ সবই আমার প্রেমের বউয়ের কারসাজি। রোজই এমন সব জিনিস আনতে বলবে, যা মানুষের দু'হাতে ম্যানেজ করা অসম্ভব। দশটা হাত,

দশটা মুণ্ডু হলে যদি কিছু করা যায়। এ সংসারে রাম হলে কপালে বনবাস। রাবণ হতে হবে। রাজ্যপাট, লোভনীয় পরস্ত্রী, সবই তখন সম্ভব। রাম হলে ভোগান্তি। রাবণ হলে ভোগের চূড়ান্ত। দু'হাতে বুকের কাছে সব পাকড়ে ধরে বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে বলি, 'আই অ্যাম এ ডিগনিফায়েড ডঙ্ক।' ফাইন্যাল খেলা শুরু হয় বাড়ির সামনে এসে।

রবি নীচসহ হলেও, মঙ্গল আর শুক্র মনে হয় তুঙ্গী। বরাতে বাড়িটা মোটামুটি ভালই জুটেছে। সামনে একটু বাগানমতো আছে। গেট। গেট থেকে সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা সোজা সদরে। আমার বউয়ের এদিক নেই ওদিক আছে। নিজে পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে। লোমঅলা ফুটফুটে সাদা একটা কুকুর কিনে এনেছে। তিনি যেন গৃহদেবতা। তাঁর সেবার শেষ নেই। তিনি সকালে চুকচুক করে আধবাটি দুধ খাবেন। নিজে খাই না খাই, ডেলি একশো গ্রাম ক্রিমক্র্যাকার বাঁধা। ঝড় হোক, জল হোক, রাষ্ট্রবিপ্লব হোক, এমন কি অ্যাটম বোম পড়লেও ডেলি দুশো গ্রাম কিমা। মাসে ডাক্তার বদ্যি, ওষুধ-বিষুধের পেছনে অ্যাভারেজ পঞ্চাশ টাকা। নিজে অসুস্থ হলে পড়ে থাকা যায়। কেউ গ্রাহ্যই করবে না। তুমি ব্যাটা মরে ভূত হয়ে যাও, কিছু যায় আসে না। ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে, পাসবই নিয়ে ব্যাঙ্কে ছুটবে। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করাবার জন্যে। তুমি তো আর লোমঅলা বিলিতি কুকুর নও। হিন্দি ছায়াছবিতে যেমন গেস্ট আর্টিস্ট থাকে, আমাদের সেইরকম গেস্ট কুকুর আছে। সে আবার আর এক ইতিহাস! কে বলে ইতিহাসে কেবল রাজা-রাজড়া? সাধারণ মানুষের জীবনে কম ইতিহাস? বছর দশেক আগে এক বর্ষার রাতে রাস্তার লালু এসেছিল বাইরের বারান্দায় আশ্রয় নিতে। সেই লালু হয়ে গেল গেস্ট। লালুর চারটি বাচ্চা হল। কাল্লু আর গুগলু বড় হল। তাদের হল চারটে চারটে আটটা। তিনটে গেল, রইল পাঁচটা। সে এক এক জটিল হিসেব। তবে এখন যা অবস্থা, পিলপিল করছে কুকুর। রাতে কানে তুলো গুঁজে, দরজা জানালা বন্ধ করে শুতে হয়। মিনিটে মিনিটে ডাক। প্রথমে একটা ডাক, তারপর আর কটা কোরাসে। শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না, সভাপতির ভাষণের মতো। আমার বউ বলবে, 'কি আশ্চর্য! কুকুর ডাকবে না? ডাকবে বলেই তো দেড় কেজি চালের ভাত খাওয়াই।'

বাঙালীর বাত, কুকুরের ডাক। বেশ বাবা, তাই হোক। তা কিন্তু হল না। মালকিন নিজেই এবার কুকুরের ওপর খাপ্পা। কুকুরের খেলা পায়। খেলার আনন্দে তারে ঝোলা শাড়ি ছিঁড়ে ফালা করেছে। দরজার পাপোশ আঁচড়ে আবার র-মেটিরিয়াল করে দিয়েছে। এইসব অপকর্ম যদিও বা সহ্য হল, হল না সেই মারাত্মক অপরাধ। গেস্ট আর্টিস্টরা একদিন বাড়ির লোমঅলা হিরোকে বাগে পেয়ে খাবলে দিলে। এখন নিয়ম হয়েছে, যে-ই আসুক আর যে-ই যাক, গেট বন্ধ করতে হবে। সেও আবার এক ইতিহাস। লোয়েস্ট কোটেসানের লোহার গেট। লোহা মানে সরু সরু কতকগুলো সিক সরু পাটির ফ্রেমে ঢালাই করা। বাতাসে ম্যালেরিয়া রুগির মতো কাঁপে।

ফুঁ দিলে খুলে যায়। ফলে ব্যবস্থা যা হয়েছে তা অভিনব। অষ্টগণ্ডা গাঁটঅলা একটা দড়ি দিয়ে গেটটা বাঁধা হয়। বাঁধা সহজ। যে বাঁধে সে বাঁধে। শ্যামল মিত্রের সেই গান—ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার জ্বালা, যে জানে সে জানে, ভ্রমরা যাস নে সেখানে। খুলতে পিতার নাম ভুলিয়ে দেয়। গেঁটেবাতের মতো।

মৃগাঙ্ক যখন ফেরে তাকে রিসিভ করার জন্যে একটা ব্যাটেলিয়ান খাড়া থাকে গার্ড অফ অনার দেবার জন্যে। আমি তো আর মৃগাঙ্ক নই।

ছেলেবেলায় একটা ছবি দেখেছিলুম কোনও বইয়ে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বুকের কাছে দু'হাত দিয়ে দলা পাকানো কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আর রাজার পোশাক পরা গুঁপো একটা গুণ্ডা, হয় দুঃশাসন না হয় দুর্যোধন, আঁচল ধরে টানছে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে আমারও সেই অবস্থা। বুকের কাছে দু'হাতে জাপটে ধরা প্যাকেট-ম্যাকেট। কাঁধে সাইডব্যাগ, সামনে গেঁটেবাত। গেঁটে দড়ি বাঁধা ম্যালেরিয়া গেট। আবার একটা গানের কলি—কেউ দেয়নি তো উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ। দু'হাতে যে বাঁধন খোলা যায় না, সেই বাঁধন খুলবো এক হাতে? আলিবাবা, চিচিংফাঁক মন্ত্র দাও।

বলে না, ভগবানের বোঝা ভগবানে বয়। কে বলে বাঙালির ফেলো-ফিলিংস নেই! খুব আছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কেউ না কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আমি ভাবি কত ভাবেই না মানুষ রোজগার করতে পারে। আমার ফেরার সময় খোকন জেগে গেছে। সেও এক ইতিহাস। খোকন খাঁড়ার বাবার ছিল সাবেক কালের বিশাল

গোলদারী দোকান। প্রভূত পয়সার মালিক। পয়সা হল ভূত। ভূতে ধরলে মানুষের মতিভ্রম হয়। বড় খাঁড়া পর পর তিনটে বিয়ে করে ফেললেন। লোকে একটা বউয়ের হ্যাপা সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যায়। সব হ্যাপিনেস, গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। বড় খাঁড়ার চুল উঠে গেল। মুখ ফুলে গেল। ভুঁড়ি বেড়ে গেল। আমরা ভাবতুম সুখে বড় খাঁড়া মোটা হচ্ছে। তা নয়, খাঁড়ার উদুরি হয়ে গেল। খাঁড়া মরে গেল। লোকে মরলে একটা বউ বিধবা হয়। খাঁড়া তিন-তিনটেকে বিধবা করে পগার পার। তারপর যা হয়—বিষয় বিষ। মামলা, মকর্দমা, মারদাঙ্গা। গোলদারী ভুস। বড়পক্ষের ছেলে খোকন খাঁড়া। খাঁড়া হলে কী হবে ধার নেই। পথে পড়ে গেল। কল্কে ধরলে। অন্যের কল্কে ধরলে লোকের আখের ফেরে। নিজের কল্কে ধরলে সর্বনাশ হয়। খোকন এখন আধপাগলা। শুধু ধান্দা, কীভাবে গাঁজার পয়সা জোগাড় করা যায়! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

সে আবার কী রকম কথা! বলি সে কথা। ভগবান আমার জন্ম দিলেন। বয়েসকালে বাবরি চুল রেখে প্রেম করলুম। হ্যা হ্যা করে বিয়ে করলুম। ধারদেনা করে বাড়ি করলুম। পয়সার অভাবে লগবগে গেট করলুম। বিজ্ঞান হাতে তুলে দিল টিভি। প্রবাদ, যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা। যত প্রেম তত ঘৃণা। আমার বউ টিভি দেখবে। আমি গরু খেটে ফিরব। দু'হাতে কলাটা মুলোটা। খোকন খাঁড়া সামনের বাড়ির রকে। সে নেমে আসবে মেসোমশাইকে সাহায্য করতে। বিনিময়ে পঁচিশ পয়সা। এক পুরিয়া গঞ্জিকার দাম!

একেই বলে কুকুর। আমার বউ আমার এই বেড়া-টপকানোর খবর কিছুই জানতে পারবে না! পারবে লোমওলা কুকুর। সে ঘেউ ঘেউ করবে। তাতেও আমার বউ উঠবে না। ভাগ্যিস ছেলেবেলায় ব্যাকে ফুটবল খেলেছিলুম। ডানপায়ে সদর দরজায় দমাদ্দম লাথি। তখন দরজা খুলে যাবে। কুকুর ছুটে আসবে। দু'হাত তুলে নাচবে। চাটার চেষ্টা করবে। আর আমার বউ হাসিমুখে অভ্যর্থনার বদলে, কি জিনিসপত্তর ধরে আমাকে খালাস করার বদলে একটি কথাই রুক্ষ গলায় বলবে, 'গেটে দড়ি বেঁধেছ? বাঁধনি? যাও বেঁধে এস!'

মালপত্তর কোনও রকমে নামিয়ে আমি গান গাইব। মনে মনে।

বাঁধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে। একা যে দাঁড়িয়ে আছি লহ না কোলে তুলে॥ তারপর ছুটব তলতা গেটে দড়ি বাঁধতে। ওই কাজটা করার কালে আমি দার্শনিক হয়ে যাব। মাথার ওপর মেরুন আকাশ। মিটিমিটি তারা। আমার বাগানের কৃষ্ণচূড়ার ঝিরি ঝিরি পাতা। অসংখ্য গাঁটঅলা একটা দড়ি, যেন হাতে ধরা জপের মালা। এক-একটা গাঁট এক-একটা রুদ্রাক্ষ। আমি তখন সত্যি সত্যিই তিন গাঁটে ওংকার জপ করব। পা বাড়ালেই পথ। আমি তখন গাইব প্রশ্নের মতো করে—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?' আমি কোনও উত্তর খুঁজে পাব না। মাথা নিচু করে ফিরে আসব। আমার কুকুর গাল চাটবে। মৃগাঙ্কর বিলিতি আফটার শেভ লোশান আছে। সেটা থাকে শিশিতে। আমারও রয়েছে, একটু অন্যভাবে। বিলিতি কুকুরের জিভে। ভাবা মাত্রই আমার মন মসৃণ। মধ্যবিত্ত—মলিন বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়ব, আর ছাড়ব আমার ডাকাতে গলা—হারে রে রে রে রে, তোরা দেরে আমায় ছেড়ে।

একখণ্ড শূন্যতা

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি জায়গায় শ্যামবাজারের দিকে যেতে বাঁপাশে রাস্তার ওপর একটা বাড়ি আছে। বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা অন্ধ গলি। গলিটার পরেই একটা ক্ষতবিক্ষত পার্ক আছে। সেই পার্কের এক কোণে পরম অশ্রদ্ধায় পড়ে আছেন সে যুগের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। উদার অনাবৃত পাথরের শরীরে বায়স-বিষ্ঠার প্রলেপ। প্রাচীন এক সুবৃহৎ বৃক্ষের ডালপালা ঝুঁকে এসেছে। সুবৃহৎ একটি বিজ্ঞাপন সেই মূর্তির মুখের সামনে ঊর্ধ্বে ঝুলে আছে। সন্ধানী সতর্ক চোখ কোনও রকমে খুঁজে নিতে পারে সেই ইতিহাস-পুরুষের অবহেলিত ক্ষুদ্র মূর্তিটিকে। আর মনে মনে ভাবতে পারে—ব্যবসার এই শহরে 'ভাও' ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন বেঁচে নেই।

প্রতিদিন আসা-যাওয়ার পথে আমি ওই পথিপার্শ্বস্থ বাড়িটির দিকে যতক্ষণ পারি তাকিয়ে থাকি। সামনের দিকটা অর্ধবৃত্তাকার। নিচে থেকে তিনতলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে কারুকার্যময় বিশাল দুটি থাম। ছাদের আলসে শুধু নিরাপত্তার বন্ধনি নয়, নয়নসুখকর এক ভিনদেশীয় গঠনভঙ্গিমা। সামনের দিক থেকে বাড়িটির সামান্যই দেখা যায়, পাশে সরে এলে বাকি অংশে চোখ পড়ে। ঋজু ঋজু জানালা। চন্দ্রাকার খিলান। এখানে ওখানে লেগে আছে রঙিন কাঁচের বাহার। হয়তো সেই বিখ্যাত বেলজিয়ান গ্লাস। প্রবেশপথের মাথার ওপর, বলিষ্ঠ থামের গায়ে সর্বোচ্চ তলের সামনে ছাদের আলসেতে শিল্পীর কার্নিকের পলস্তারার বিস্ময়কর কারুকার্য। স্থাপত্যের জ্ঞান আমার নেই। আমার দুটো চোখ আর সামান্য একটু বাঙালি-সুলভ অনুভূতি আছে। সেই অনুভূতির সহায়ে আমি সময়ের পথ ধরে ইচ্ছামতো সামনে এগোতে পারি আবার ভাঁটার স্রোতে উজিয়ে যেতে পারি পিছনে। বাড়িটির গায়ে গজিয়ে উঠেছে বেপরোয়া বটগাছ। তাকে আর চারা বলা যায় না। বেঁটে একটি বটবৃক্ষ। হিলহিলে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে কার্নিস বেয়ে, দেয়াল বেয়ে অক্টোপাসের বাহুর মতো। এই সাবলীল বটগাছটি আমাকে অতীতে ঠেলে নিয়ে যায়।

আমি অবাক হয়ে ভাবি, এমন একটা অসাধারণ, সুন্দর বাড়িতে কেউ বসবাস করে না কেন? হোক না প্রাচীন। গৃহসমস্যার এই ভয়ঙ্কর যুগে, এইরকম স্থানে এইরকম একটা বাড়ি কেন ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে পড়ে আছে? খড়খড়ি, শার্সি সব বন্ধ। বাড়িটির ভেতরে যাওয়ার উপায় আমার নেই; কিন্তু কল্পনায় আমি দেখতে পাই, অনেক উঁচু সিলিংঅলা বিশাল বিশাল ঘর। টানা লম্বা বারান্দা। ঘুরে চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশে। মার্বেল পাথরের শীতল মেঝে। বহুকাল কেউ তেমন করে অকজ্যালিক অ্যাসিড ঘষে পরিষ্কার করেনি, তাই মলিন হয়ে আছে। ভেতরের বারান্দায় অবশ্যই কাঠের জাফরি লাগানো আছে। চীনে মিস্ত্রির হাতের কাজ। জায়গায় জায়গায় ঝুলে গেলেও অতীতকালের আলপনা। বট যখন আছে, পোষা জাপানি পায়রার বদলে গোলাপায়রা নিশ্চয় বাসা বেঁধেছে। তাদের অকৃপণ বিষ্ঠাবর্ষণে বারান্দার মেঝে, ভেতরের উঠান চিত্রবিচিত্র। আমি শুনতে পাই অতীতের বারান্দা থেকে ভেসে আসছে ম্যাকাও পাখির চিৎকার। দেখতে পাই ঘরে ঘরে ঝুলছে বিশাল বিশাল ঝাড়লণ্ঠন। ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার। পুরু গালিচা। বিশাল ডিভান। বিরাট আকৃতির সোফা সেট। মার্বেল পাথর লাগানো সরু সরু কর্নার টেবিল, যার চারটে পায়া পাতার বাহার নিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে সারসের পায়ের মতো। সেকালের অফুরন্ত একটা বৈভবের ছবি ভেসে ওঠে আমার মনে। একটা কাল, যে কালে আমি ছিলুম না, যে কালে আমার পূর্ব-পুরুষরা স্বপ্নের নায়কের মতো ঘুরে বেড়াতেন। সেই কালের অবশিষ্ট স্মৃতি আমাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। উত্তরপুরুষের যাবতীয় অক্ষমতা আমাকে পীড়া দেয়। ওই বাড়িটির দিকে তাকিয়ে আমি হিসাব মেলাবার চেষ্টা করি, এই রাজপথের দুধারে যখন বড়টাকার খেলা চলেছে, তখন একখণ্ড শূন্যতা কেন এখনও প্রাচীন কালের কাঠামোয় এইভাবে বন্দী হয়ে আছে। এ যে বড় মহার্ঘ অবহেলা! আর তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি আদালত কক্ষ। ভেসে ওঠে একাধিক বিবদমান ভ্রাতার চেহারা। শুনতে পাই এ-বারান্দায়, ও-বারান্দায় তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর। তাদের বধুদের পশ্চাৎপট আস্ফালন। আবার এমন দৃশ্যও ভেসে ওঠে, কোনও নিরীহ চেহারার কুসীদজীবী সোৎসাহে এগিয়ে দিচ্ছেন টাকার থলি। মুখে অমায়িক হাসি, নিন

না ছোটবাবু, আপনার টাকার অভাব! আমি তো আছি। চুনোট করা ধুতি আর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি পরিহিত ছোটবাবু, সেই তলহীন ভরসার অতলে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে সেই যে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, সেই মামলা হয়তো আজও ঝুলে আছে। আইন ছুঁয়ে আছে বলে বাড়িটি আজ ব্রাত্য। কি যে কী, আমি বলতে পারব না, তবে পায়ের তলা থেকে জমি সরে যাবার একটা জ্বালাময় অনুভূতি আমাকে কাতর করে তোলে।

ছাত্রজীবনে আমার সময় কাটত একটি বনেদী বাড়িতে। সেই বাড়ির চারটে থাম উল্টে ফেললে যা ইট বেরতো, তাতে মধ্যবিত্তের সাদামাটা একটি বিলিতি বাড়ি অনায়াসে হয়ে যেত। চারটি বিশাল, সু-উচ্চ থামের মাথায় একটি ঢালাও ছাদ। সেই ছাদের তলায় কেটে কেটে, থাকে থাকে সাজানো হয়েছে একতলা, দোতলা, তিনতলা। প্রবেশ বারান্দাটি এত প্রশস্ত ছিল যে স্বচ্ছন্দে সেখানে ফুটবল খেলা যেত। ওই ছাদের নিচে তলায় তলায় বারান্দা। সে এক মজার ব্যাপার। পাশ দিয়ে উঠে গেছে রহস্যময় সিঁড়ি। গোল খিলানের তলা দিয়ে সিঁড়ি পাক মেরে মেরে কোথায় যে নিয়ে যেতে পারে ধারণা ছিল না। পূর্ণধাপ, আধকাটা ধাপ সোজা যেতে যেতে বাঁদিকে ঢুকে আবার ডানদিকে মোচড় মেরেছে। সিঁড়ি দিয়ে তলার হিসেব করার উপায় ছিল না। পুরো বাড়িটাই আমার কাছে ছিল রহস্যের মতো। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর উপন্যাসে বর্ণিত বাড়িটির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিলাম পরে, তিনি যখন লিখলেন তখন। আমি যখন সেই বাড়িটির সঙ্গে পরিচিত হলাম, তখন বোলবোলার কাল শেষ হয়ে গেছে। বাড়িটি প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। স্তূপাকার। ছাদের অংশবিশেষ নেমে এসেছে। সিঁড়ির অনেকটাই ধসে গেছে। শুধু বলিষ্ঠ থাম চারটি বিক্ষত যোদ্ধার মতো অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমি, আমার বন্ধু সেই থামের তলায়, শীতের দুপুরে চুপচাপ বসে থাকতুম। বনেদী পরিবারের রুচিশীল সন্তান, পূর্বপুরুষের কট্টর সমালোচক, শীতের দুপুরে আমার পাশে বসে সাহিত্য আলোচনা করত। আমার চেয়েও তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি। কন্দর্পের মতো চেহারা। ভালো ধ্রুপদ গাইত। আমাদের মাথার ওপর কয়েক হাজার পায়রার অবিরত কোঁত পাড়া। সারাদিনই সর্বত্র বালি

ঝরে ঝরে পড়ত। মাঝে মধ্যে বিশাল শব্দে বাড়ির পেছনের কোনও অংশ ধসে পড়ত। একদা ওই বাড়িটিতে বসে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক লিখেছিলেন। শুধু বাড়ি নয়, সঙ্গে ছিল শীতের বক নামা, হাঁস উড়ে আসা স্বচ্ছ ঝিল, আর চোখ ভেসে যাওয়া জমি। আমি বৈষয়িক প্রশ্ন করে আমার বন্ধুকে বিব্রত করতুম না। আমি সেই বয়সে আমার অপরিণত বুদ্ধি নিয়েই বুঝে গিয়েছিলাম—এ বাড়ি মেরামতের সাধ্য একালের নেই। থাকলেও অপব্যয় হবে। এ বাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত, পূর্বপুরুষের অহঙ্কার। এ বাড়ি কাজের লোকের নয়, কল্পনাবিলাসী পরশ্রমভোগীর। এ বাড়ি গণতান্ত্রিক নয়, স্বেচ্ছাচারী। বাড়িটা ভেঙে পড়ছে বলে আমার যত দুঃখ ছিল, আমার বন্ধুর ততটা দুঃখ ছিল না। সে জানত, ওই বস্তু অবাস্তব এক আয়োজন। বর্তমানের চোখে বিলাসী অথর্বের মতোই অপমানকর। আমার চোখের সামনে সেই বাড়ির সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ভাগে ভাগে হাতবদল হল। ঝিলের তিনের চার ভাগ চলে গেল মাটির তলায়। দেখতে দেখতে অতীতের প্রহরী সেই কলোসিয়াম অজস্র একালের বাড়ির অন্তরালে চলে গেল ইতিহাসের হৃৎস্পন্দনের মতো। একটা অংশ আজও আছে। আজও আমার মতো অবস্তুতান্ত্রিক, কল্পনাবিলাসী অপদার্থ, সেই গলিত ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে যায়। যা ছিল, যা নেই তার কথা ভেবে সেকালের সঙ্গে একালের একটা বন্ধনসেতু খোঁজার চেষ্টা করে। অবিশ্বাসী মনকে বোঝাতে চায়, এ আমাদের সমাধি নয়, শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা। তেলরঙে আকা ধূসর পূর্বপুরুষের প্রতিকৃতি তাকিয়ে আছেন খসে পড়া সিঁড়ির দিকে একটা অশুভ দৃষ্টি দিয়ে, যার অর্থ, তোমরা এসো না, আমরা একক অহংকারে থাকতে চাই। প্রেতের মতো, বাস্তুপুরুষের মতো একক এবং অদ্বিতীয়। নীল রক্তের আমরাই একমাত্র অধিকারী।

এ শুধু একটি উদাহরণ নয়। এমন শত শত উদাহরণ এই গঙ্গার উভয় তীরে ছড়িয়ে আছে। যে বাঙালির হাতে অঢেল ঐশ্বর্য ছিল, অবসর ছিল, তাঁদের মধ্যে ছিল গৃহবিলাস আর উদ্যানবিল্যাস। কানন-ভ্রমণ প্রিয়, দাসদাসী পরিবৃত বাঙালি শাসক ইংরেজকুলের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিলেন ম্যানর অ্যান্ড ম্যানসান বানিয়ে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, হয় অবনীন্দ্রনাথ না হয় গগনেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যে বাড়িতে

কোনও রহস্য নেই, সে বাড়ি বাড়িই নয়। বাড়িতে আনাচকানাচ থাকা চাই, চাই চোরকুঠুরি। তলের ভেতর লুক্কায়িত তল, চাই ভূগর্ভস্থ আস্তানা। একই বাড়িতে সাতটি সাত ধরনের সিঁড়ি। সেকালের ঘরের উচ্চতা একালের চোখে অপচয়।

সেই লাগাম ছেঁড়া অদূরদর্শিতার মাশুল আজ উত্তরপুরুষকে দিতে হচ্ছে। একজনের সাধনা পরবর্তী সাতজন কাজিয়া করে শেষ করে দিলে। আমারই চোখের সামনে সেকালের এক মানী মানুষের গঙ্গাতীরবর্তী প্রাসাদোপম বাড়ি তাঁর তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে পাড়ার এক শ্রেণীর অভিভাবকদের দখলে চলে গেছে। তারা সেখানে ব্যবসা খুলেছে। কেনাবেচার ব্যবসা। জানলা দরজা খুলে খুলে বিক্রি করে দিচ্ছে। মার্বেল পাথরের মেঝে সাফ। রাস্তায় ফেলে ফার্নিচার নিলাম। বাড়িটা কোর্টে আটকে থাকবে। যত দিন যাবে ততই বাড়ি আর থাকবে না, থাকবে গহ্বরঅলা দেয়াল ঘেরা একখণ্ড স্মৃতিমুখর শূন্যতা। আইনমুক্ত সম্পত্তিতে এখন ঢুকে পড়ছে বড়টাকা, ব্যবসায়ীর টাকা, যে টাকায় বাঙালির কোনও অধিকার নেই। সেকালের কল্পনা, রহস্য, বিলাসিতা, রুচি, অহঙ্কার সমতল হয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে একালের বাড়ি, কাজের বাড়ি, যার কোনও চরিত্র নেই। যার একটিই মাত্র কায়দা, ভূমিসংলগ্ন সুউচ্চ শূন্যতাকে কত সহস্র খণ্ড করা যায়।

এক সময় যাঁদের ছিল, বিপুল বিশাল ছিল তাঁরা আজকালের নিয়মে হয় অনিকেত, না হয় ক্ষীয়মাণ, বিস্রস্ত, জেরবার, জীর্ণ। আমি বিষয়ী নই, আমার বিষয়াকাঙ্ক্ষাও নেই। আমি জাতিবিদ্বেষী নই। তবু কেন জানি না, আমার দুঃখ হয়। যখন দেখি গঙ্গার ধারের জলটুঙিঅলা ছবির মতো একটি বাগানবাড়ি চলে গেল একালের এক উৎকট রুচির ব্যবসায়ীর হাতে, আমি তখন হাহাকার করে উঠি। যেন আমারই বাড়ি চলে গেল অন্যের হাতে। আমার গায়ে লাগার কথা নয়। আমি থাকি দু'কামরার ক্ষুদ্র ভাড়াবাড়িতে। চিরকাল সেইখানেই থাকব। আমার তো আনন্দ হওয়াই উচিত। অন্যের সর্বনাশে বাঙালির তো প্রফুল্ল হওয়ারই কথা। আমি হতে পারি না। আমি দেখতে পাই সবুজ লনে লোহার কারবারির বোধহীন দাপাদাপি। যে বাড়ির দোতলার ঘর থেকে একসময় রাগসংগীতের সুর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ত, এখন

সেই ঘরে তারস্বরে বাজে স্টিরিও। ফিল্মি-সংগীতের আর্তনাদ। পৃথুলা কোনও মহিলা আভিজাত্য ভুলে উচ্চকণ্ঠে ডাকেন—এ রামুয়া, রামুয়া রে। ওই অলিন্দে, আমার শৈশবে চকিতে এক লহমার জন্যে যে রমণীদের আমি দেখেছি, তাঁদের রূপ ছিল অন্যরকম, তাঁদের সুর ছিল সুরে সাধা। নয়া জমানার মালিকদের মতো তাঁরা অসুর ছিলেন না। সেই বাগানে সাত রকমের রঙ্গন আজও থোকা হয়ে ফুটে থাকে। ফোটে সতের রকমের গোলাপ ; কিন্তু কাদের জন্যে ফোটে। সে চোখ কোথায়। লনের চারপাশে সরল রেখার মত দেবদারুর মস্ত শাখায় গঙ্গার আধ্যাত্মিক বাতাস দোল খায়। কোনও প্রাণ কিন্তু আকুল হয় না। এই বাড়ির হাতবদলের ইতিহাস বড় করুণ। অভিজাত বাড়ির উত্তরপুরুষ এই বাগানটি বাঁধা রেখে মদ্যপান করেছিলেন, রেসের মাঠে ঘোড়া ধরেছিলেন। মাত্র দেড়লক্ষ টাকার ফুর্তির খেসারত। বাড়িটির ঘরে ঘরে যে কার্পেট পাতা আছে, তারই দাম দেড়লক্ষ। যে সব ছবি আর শিল্পবস্তু আছে তার দামও অনেক। আমি সেই আমুদে মানুষটির মনোবেদনা নিজের মনে অনুভব করি। আজ যদি তিনি জীবিত থাকেন কোথাও, অবশ্যই বৃদ্ধ। রক্তের উন্মাদনা স্তিমিত হয়েছে। একান্তে বসে এই বাড়িটির কথা ভাবেন, একদিন যা ছিল তাঁরই, সেখানে আর তিনি ফিরতে পারবেন না কোনও দিন।

এ তো গেল এক ধরনের হাতবদল। অসহায়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পত্তি। অন্য ধরনের হাতবদলও আছে ; যা আজকাল সর্বত্র হচ্ছে। আশাতীত বিরাট অঙ্কের টাকা ধরে দিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কলকাতার চটকদার এলাকায় বনেদী বাড়ি কিনে নিচ্ছেন। টাকার সঙ্গে মালিককে দেওয়া হচ্ছে নির্মীয়মাণ বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাট। জমির মালিক রূপান্তরিত হচ্ছেন ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটের মালিকে। টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কে রেখে সুদ খাবেন আর দুই কি তিন কামরার পরিসরে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন পরিবারটিকে ছোট রাখার। সত্য মিথ্যা জানি না, আমি শুনেছি, কলকাতার এক প্রাচীন বাঙালি ব্যবসা, বহুতল বাড়িসমেত পঁচিশ কোটি টাকায় হাতবদল হয়ে গেছে। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা কলকাতায় জাঁকিয়ে উঠেছে। স্রোতের মতো টাকা বইছে, সেই স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বাঙালির ভূসম্পত্তির অহংকার। কোথা থেকে আসছে এত টাকা! ধীরে ধীরে কলকাতা, এমন

কি বৃহত্তর কলকাতা বাঙালির হাতছাড়া হতে চলেছে। এই হাত-বদল রোখার ক্ষমতা বাঙালির নেই। বাঙালি আর বাগানবাড়ির স্বপ্ন দেখে না। বছরে একবার হয়তো কোনও বাগানে যায় পিকনিকে। অথচ বাঙালির রক্তে আছে গান, কবিতা, ফুল, উদ্যান, নিজস্ব জমি, ছাদ, চাঁদের আলো। কথাতেই আছে সায়েবের গাড়ি, বাঙালির বাড়ি।

আমার মনে আছে, আমার পিতা শুধুমাত্র ডালভাত খেয়ে আর সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়ে সঞ্চয় করতেন। আমাদের বলতেন জামা-কাপড়ের বিলাসিতা ছাড়। ফুর্তি পরে হবে, আগে মাথার ওপর একটা ছাদ হোক। আমরা তখন অসন্তুষ্ট হতাম। ভাড়াবাড়িতে তো বেশ ভালই আছি। কেন এত কষ্ট? কেন মাছ খাব না, মাংস খাব না? কেন ছুটিতে বিদেশভ্রমণে যাব না? কেন অন্যের বই চেয়ে এনে নোট করব? কেন জুতোতে পড়বে তালির পর তালি? পিতা জমি দেখতে শুরু করলেন। তিনশো টাকা কাঠা। বললেন, দাম আর একটু কমুক। উত্তরোত্তর দাম বাড়তেই লাগল। মধ্যবিত্ত মানুষের একার সঞ্চয় একটুকরো জমির নাগাল আর কোনও দিনই পেল না। বলেছিলেন, বাগানঘেরা ছোট্ট একটা বাড়ি হবে। বাড়ি হলে ঘর-সাজানো ফার্নিচার হবে। হবে লাইব্রেরি। বসার ঘর। আর হবে মনের মতো একটি ঠাকুরঘর। জমি না হোক, বাড়ির প্ল্যানটা আগেই ছকা হয়ে গিয়েছিল। তিন হাজার টাকা কাঠার জলা বোজানো তিন কাঠার একটা টুকরো একবার প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন, কিন্তু মায়ের অসুখে সব সঞ্চয় শূন্য হয়ে গেল। আবার নতুন করে শুরু করেছিলেন। তখন জমির দাম চড়তে চড়তে পঁচিশে গিয়ে ঠেকেছে। মায়ের মৃত্যু, চাকরি প্রায় শেষ। কৃচ্ছ্রসাধনে প্রায় সন্ন্যাসী মানুষটি তাঁর স্বপ্ন আমার কাছে জিম্মা করে দিয়ে একদিন হাসতে হাসতে চলে গেলেন। পঁচিশ এখন পঁচাত্তরে উঠেছে। একালের মধ্যবিত্তের সঞ্চয় বলে কিছু নেই, সবই ঋণ।

মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী মানুষকে জমি দেবার পরিকল্পনা হয়েছিল কল্যাণীতে। অনেকেই নেচে উঠেছিলেন। 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার। চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া।।' যোগাযোগের অসুবিধায় কল্যাণী তেমন সফল হল না। আমার এক বন্ধু জমি কিনেছিলেন। অনেকের মতোই তিনি আর বাড়ি করেননি। একদিন শীতের দুপুরে আমাকে

নিয়ে গিয়েছিলেন জমি দেখাতে। আগাছার জঙ্গলে সব হারিয়ে গেছে। একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'মনে হয় এইটা আমার জমি।' আগাছা ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা গিরগিটি। ঘূর্ণায়মান চোখে আমাদের দেখে উঠে গেল জারুল গাছে।

কল্যাণীর পর হল সল্ট লোক। প্রথমদিকে জমির দাম ছিল সাধ্যসীমার মধ্যে। পরে দাম বেড়ে গেল। বেড়ে গেল ক্রেতার সংখ্যা। চালু হল লটারি। এ কথা এখন সকলেরই জানা, টাকার লোভে জমি সেখানে বাঙালি মধ্যবিত্তের হাতছাড়া হয়ে চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে। তবু সল্ট লেকে কিছু বাঙালির স্বপ্ন সফল হয়েছে। মনোরম সব বাড়ি উঠেছে। নিজের হাতে বাগান করেছেন। তেলঅলা, ঘিঅলাদের প্রলোভনের ফাঁদ এড়িয়ে ক'দিন থাকতে পারবেন. সেই হল কথা। পয়সার তাণ্ডব চলেছে। বাঙালি ব্যবসা করতে জানে না। ভূস্বামী হবার স্বপ্ন তাদের দেখার অধিকার নেই। যেখানে কোনও সরকারী পরিকল্পনা নেই, সেখানে জমির কাঠা দেড়, দুই. আড়াই, তিন লাখ। বাড়ি তৈরির খরচও সেই রকম। এক টাকায় একখানা ইট। আমার সঠিক জানা নেই, তবে শুনেছি, সাদামাটা একটা বাড়ি তৈরির খরচ প্রতি বর্গফুট দুশো টাকা। ক'জনের সাধ্যে কুলোবে। বাগান ঘেরা ছোট্ট বাড়ির স্বপ্ন অতলে লীন। বাঙালি এখন মাথা গোঁজার ছোট একটা ফ্ল্যাট পেলেই সুখী। আজকাল হাউসিং কোঅপারেটিভ হয়েছে। এক লাখ পঁচাশি, দু লাখে দুটি ঘর, একচিলতে বারান্দা, সংকীর্ণ একটি রান্নাঘর, একটি বাথরুম, এক চৌকো খাবার জায়গা মেলে। ওই আশাতীত। ওই ফ্ল্যাটই বা ক'জন কিনতে পারেন! যাঁরা ভাল চাকরি করেন, অফিস থেকে ঋণ পান, তাঁরাই পারেন ফ্ল্যাট কিনতে। জানালায় মানিপ্ল্যাণ্ট দোলাতে।

আমরা যাঁরা কিছুই পারি না, লোনাধরা চার দেয়ালের অন্ধকারে প্রায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করি, অন্যের সঙ্গে ভাগ করে বাথরুম ব্যবহার করি, জল নিয়ে নিত্য চুলোচুলি করি, আমরা দেখি শহর আর শহরতলিতে নিঃশ্বাস নেবার মতো আর একচিলতেও জমি রইল না। সাবেক কালের বেহিসাবী বাড়ি গুঁড়িয়ে চৌরস করে পিঠে ভাগের মতো জমি ভাগ হচ্ছে। ভাল ভাল নামে তৈরি হচ্ছে কলোনি। জলা, জঙ্গল যেখানে যা কিছু ছিল সব চলে যাচ্ছে ইটের খাঁচার তলায়। এক

শ্রেণীর মানুষের হাতে এখন অনেক পয়সা। সেদিন আমার সহধর্মিণী এক জ্যোতিষীর সামনে আমার হাত পেতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো, এর হাতে বাড়ি আছে কিনা?' জ্যোতিষী বললেন, 'আর কী, মেরেই তো এনেছেন! আর ক'বছর! এরপর তো চলেই যাবেন নিজ নিকেতনে।'

আমার কোনও ক্ষোভ নেই। একটিই দুঃখ, জাফরি, জানালা, রঙিন কাঁচ, বারান্দার নকশা করা ঢালাই লোহার গ্রিল, কাঠের সিঁড়ি, খাঁজকাটা থাম, খোলামেলা বাগান, যা কিছু সুন্দর আয়োজন সব শেষ হয়ে গেল। প্রয়োজন সৌন্দর্যকে হত্যা করেছে। সেদিন এক অভিনেত্রী বলছিলেন, তিনি দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন, 'আমার অসহ্য লাগে, চোখে জল এসে যায়। সারাটা দিন শুধু ভাঙার শব্দ। বাঙালির পূর্বপুরুষের একশো বছরের প্রাচীন দোরদালান সব ভেঙে মাঠময়দান করে দিচ্ছে। স্কাইস্ক্র্যাপার উঠবে। ছোট ছোট পায়রার খোপ। সেদিন দেখি ধ্বংসস্তুপের ওপর পড়ে আছে একটি মার্বেল ফলক। রায়বাহাদুর হরপ্রসাদ ব্যানার্জি। ভোরের শিশির পড়ে মনে হচ্ছে, ফলকের চোখে জল।'

সিনেট হল ভেঙে ফেলার সময় আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চোখের সামনে সেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখেছিলাম। কালের নির্দয় প্রহারে উল্টে পড়ছে শিক্ষাসত্রের বড় বড় থাম। সেদিন আমার দুঃখের সাথী হয়েছিল ঝাঁক ঝাঁক পায়রা। ভাঙন আর দেখতে চাই না। কোথাও বাঙালির বাড়ি তৈরি হতে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ি। বিভোর হয়ে যাই। মনে করি আমারই স্বপ্ন রূপ নিচ্ছে। ইট, বালি, চুন, সুরকি, সিমেন্টের গন্ধ। ছোট হলেও আমার চোখে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। যজ্ঞে হোতা আমারই মতো মধ্যবয়সী এক পুরুষ। তাঁর তিল তিল সঞ্চয়ের টাকা ইটের খাঁজে খাঁজে। প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। নিজেই জল ঢেলে ঢেলে ইট ভেজাচ্ছেন। সিমেন্টের গুঁড়োয় চটি সাদা হয়ে গেছে। ভারার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মিস্ত্রী। ইটে কর্নিক ঠুকছে। দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা যোগাড়ে তার তন্বী শরীর নিয়ে ভারা বেয়ে উঠছে। লম্বা বাঁশের ডগায় ঝুলছে একটি চুবড়ি আর ঝাঁটা। বুরি নজরবালে তেরা মুহ্ কালা। আমার নজর বুরি নয়। আমি এই সংগঠনের দৃশ্য উপভোগ করি। মনে মনে প্রার্থনা করি, সংগ্রামী মানুষটির মঙ্গল

হোক। ভিটে অনেকের সহ্য হয় না। এঁর যেন সহ্য হয়। অন্তত কুড়িটা বছর যেন ভোগ করে যেতে পারেন। আমার পাড়ায় এক ভদ্রলোক বাড়ি ফেঁদেছিলেন। ছোট্ট একচিলতে জমি। মিস্ত্রিদের সঙ্গে সপরিবারে কাজ করতেন। আমি উৎসাহ দিতুম। ভিত উঠল। ড্যাম্প কোর্সিং হল। ভদ্রলোক বললেন, যা জমেছিল তাতে আপাতত এই পর্যন্ত হল। বছর ঘুরে গেল। সময়ের সামনে চলা। আগাছার তলায় হারিয়ে গেল ভিটে। একদিন ভদ্রলোকের বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হল বাকিটা?' ছেলেটি করুণ হেসে বললে, 'আর বোধ হয় হবে না। দু' বোনের বিয়ে দিতে হবে।' এইসব বাড়ি হল সাধনার বাড়ি। রক্ত দিয়ে তৈরি। বড়টাকার অসভ্য উৎপাত নয়। এর মর্ম আমি বুঝি।

সেদিন ভোরে বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গার পারে গিয়ে দেখি, একখণ্ড জমির ওপর একটি বাড়ি উঠছে। সিঁড়ি, একতলার ছাদ, ঢালাই হয়ে গেছে। দিনের আলো সবে ফুটছে। কেউ কোথাও নেই। অদূরে গঙ্গার ঝাপসা বুকে ভেসে আছে গোটা দুই জেলে নৌকা। পাশেই একটি আশ্রম। বিশাল বিশাল প্রাচীন গাছের আড়ালে বাড়িটি ফুটে আছে জীবনসাধনার মতো। অবারিত সেই বাড়িটির মধ্যে অনধিকারীর মতো প্রবেশ করলুম। ঘেরা বারান্দা। দুটি শোওয়ার ঘর। মাঝারি মাপের। মেঝে ঢালাই হয়েছে। সিমেন্টের কাজ বাকি। ঘরের পরেই নির্গমন পথ। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে রান্নাঘর, বাথরুম। মনে মনেই বললুম—এই দুটি আর একটু প্রশস্ত হলে বেশ হত। তারপরেই ভাবলুম, মাপা জমিতে এর বেশি আর কী হবে। গঙ্গার দিকে বড় বড় জানালা হয়েছে। খুব আনন্দ হল। পশ্চিমে সূর্য যখন হেলবে, জলের বুকে যখন রোদের কাঁচ ভাঙবে, তখন এই ঘরে ইজিচেয়ারে, পায়ের কাছে লোমঅলা কুকুর। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে গেলাম। সামনে টলটলে গঙ্গা, পাশে আশ্রম, মাথার ওপর ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা গাছের প্রহরা। ওপারে মন্দিরের চূড়ায় প্রথম সূর্যের আলো। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে মনে একটা চেয়ার পাতলুম ছাদে। পশ্চিমমুখো। সেই চেয়ারে ধবধবে সাদা থান পরিহিতা, গৌরবর্ণা এক বৃদ্ধাকে বসালুম, তাঁর হাতে তুলে দিলুম রুদ্রাক্ষের মালা—গৃহস্বামীর মা। কার গৃহ, তাঁর মা আছেন কিনা জানি না, তবে আমার মায়ের এই রকম একটা স্বপ্ন ছিল। দেয়াল-ঘেরা নিজস্ব একখণ্ড শূন্যতার।

কলকাতার শীত

কত রকমের দুর্ভাবনা মানুষের, শীত কেন পড়ছে না! জনে জনে প্রশ্ন, শীতের কি হল বলুন তো মশাই? আবহাওয়াটা কি একেবারেই বদলে গেল? পোষ মাস শেষ হতে চলল। আর কবে শীত আসবে! কথায় আছে আধা মাঘে কম্বল কাঁধে। ভয় দেখাবার মানুষেরও অভাব নেই, শীত না পড়ার মানে বোঝেন, পক্স! মায়ের দয়ায় সব উজাড় হয়ে যাবে। হয় শীতের দয়া না, হয় মায়ের দয়া। শীত না আসুক, শ্বাসকষ্টের রোগীরা যথারীতি কাতর হয়ে পড়েছেন। ধুলো আর ধোঁয়ায় ঘন ঘন হাঁচি। মধ্যরাত পর্যন্ত বিছানায় খাড়া বসে। শ্বাস-প্রশ্বাসে মাউথ অরগ্যান। ওষুধের কম্ম নয়। সভ্যতার হাঁস-ফাঁসানি শেষরাতে অটোমেটিক্যালি সাবসাইড করবে। সিভিলাই-জেশানের দীর্ঘশ্বাস। লক্ষ লক্ষ চুলা বাতাসে ধোঁয়া উগরে গেছে, সারাদিন হাজার হাজার গাড়ি ফুঁসে গেছে এগজস্ট ফিউম, তুলে গেছে ধুলোর ঝড়। শীত না আসুক বাতাস ভারি হয়েছে। বিষাক্ত চন্দ্রাতপের তলায় জীবনের ছটফটানি। সেমিনারে সেমিনারে বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে রোমহর্ষক সব হুঁশিয়ারি। ক্যানসার রোখে কে। প্রতি শ্বাসে ফুসফুসের ঝিল্লি অঙ্গার কণিকায় কালো হচ্ছে। কত আর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে মৃত্যুদূতকে ঠেকানো যায়!

শীত কোন্ দিক থেকে আসে? উত্তরবঙ্গের পথ বেয়ে, না রাজধানীর দিক থেকে? শীত না আসাটা কি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ, না দার্জিলিং-এর ঘিসিং-আন্দোলন! অথবা পাক-পরমাণু বোমা, কি চীনের কোনও আণবিক কেরামতি! অত্যন্ত দুর্ভাবনার মধ্যে দিন কাটছে। যত অনিষ্টের গোড়া আমাদের লেজে পড়ে থাকা বঙ্গোপসাগর। চাপের গোলমালে হিমালয়ের হিমেল বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

শীত এখন স্মৃতি। কলকাতায় সেই শীত সত্যিই আর পড়ে না। লাজুক মেয়ের মতো উঁকিঝুঁকি মেরে সরে পড়ে। আমার বয়েস তখন খুবই কম। তবে প্রবীণ মানুষদের নানা কিছু বলার মতো

আমিও বলতে পারি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমি দেখেছি। শীতের রাতে দোতলার ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতিবাগানে জাপানি বোমা পড়া আমি দেখেছি। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশ গুমরে উঠল। যেন একঝাঁক ভ্রমর কাছেই কোথাও উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আগুনের করাতে আকাশ চিরে গেল। পরক্ষণেই একটা গম্ভীর শব্দে জানালার শার্সি, আলমারির কাঁচ কেঁপে ঝনঝন করে উঠল। পুরনো বাড়ির ভেতরের ছাদ খসে ঝরে পড়ল চুনচুন বালি। বড়রা হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন একতলার জানালাহীন গুদামঘরে। যে ঘরে আমরা অন্যসময় ভয়ে ঢুকতুম না। ড্যাম্প লেগে দেয়ালে নোনা ধরে গেছে। সেই ঘরের শীতল মেঝেতে জড়াজড়ি করে বসে আছে গোটা পরিবার। টিম টিম করে বাতি জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। ওই ঘরে ছিল অসংখ্য ইঁদুর, ছুঁচো আর কয়েক হাজার লাল লাল স্বাস্থ্যবান আরশোলা। একটি শিশুর কাছে জাপানি বোমার চেয়েও ভীতিপ্রদ ছিল আরশোলা। জ্যাঠামশাইয়ের গরম চাদরের তলায় গুটিসুটি মেরে বসে থাকতুম। আরশোলা ওড়াউড়ি করত। মৃত্যুর মতো শীতলতা চারপাশ থেকে চেপে আসত। জ্যাঠামশাই আমাকে বুকের উষ্ণতায় চেপে ধরে বলতেন, ভয় নেই বাপি। এখুনি অল ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

অল ক্লিয়ারই হয়ে গেছে। ভালবাসার যাঁরা ছিলেন, বুকে টেনে নিয়ে অভয় দেবার যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অল ক্লিয়ার করে চলে গেছেন। স্মৃতিটুকুই কেবল পড়ে আছে। আপনজন ঘিরে না থাকলে শীতের মাধুর্য খোলে না। শীতে একা আর কফিনে শুয়ে মাটির তলায় চলে যাওয়া একই অভিজ্ঞতা। বিশাল খাটে রোদ-ফোলা নরম গরম বিছানা। রাতের তরিবাদি খাওয়া শেষ। উত্তরের বারান্দায় হিমশীতল জলে কোনও রকমে হাত ধোয়া। উত্তুরে বাতাসে বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে কেঁপে উঠছে। বড়রা বলছেন, জলে যেন হাত ঠেকানো যাচ্ছে না। হাত কেটে নিচ্ছে। যাঁদের দাঁত খারাপ তাঁরা কুলকুচো করার জন্যে মুখে জল নিয়েই 'বাবারে' বলে লাফিয়ে উঠছেন। সাবধানী, স্বাস্থ্য-বাতিকগ্রস্ত গুরুজন মহিলাদের কেউ বলছেন, খোকার হাতটা ধোয়ার পর ভাল করে দেখো, শীতের ভয়ে গামছাতেই এঁটো হাত মুছে দেবে। ছেলেবেলায় আমরা তাই করতুম। কোনও রকমে হাত মুছে

হিহি করতে করতে সোজা বিছানায় একেবারে লেপের তলায়। ওরে, পা মোছ, পা মোছ! আর পা মোছ! পায়ের দায়িত্ব লেপের ওয়াড়ের। বিছানার সাদা চাদরে শীত লেগে আছে। গায়ের গরমে গরম না হওয়া পর্যন্ত একটা কুঁই-কুঁই ভাব। মুখে লেগে আছে শীতের ফুলকপির স্বাদ। এখনও ফুলকপি আছে। সে স্বাদ নেই। কেমিকেল সারে স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। ফুলকপির সঙ্গে কড়াইশুঁটি এক দুর্লভ পাওনা। যেমন পায়েসের সঙ্গে কিসমিস। সে-যুগের নতুন আলু, তারও কোনও তুলনা ছিল না। খোসা ওঠা-ওঠা এক অনবদ্য আকর্ষণ। শুকনো দমের ঘ্রাণ এখনও যেন নাকে লেগে আছে। সেকালের শৈশব একালের মতো মাথায়-তোলা-আদরে ভরপুর ছিল না। অভিভাবকরা বলতেন, ছেলেদের একটু কষ্টের মধ্যে রাখতে হয়, মানুষ করতে হয়। হাতে এক আনা পয়সা এলে আমাদের মনে হত, কি বড়লোক! এক পয়সা, দু পয়সা চাঁদা তুলে শিশুদের বনভোজন। শীতের মাঠে সোনা রোদ। ঝোপের আড়ালে মিষ্টি গরমে, ইটের উনুনে কাঠকুটো জেবলে বনভোজন। পদ একটাই, নতুন আলুর দম। আমার বোন অল্প বয়সেই পাকা রাঁধুনি হয়ে উঠেছিল। সেই রাঁধত। শালপাতায় পরিবেশন। এক-একটা আলুতে লেগে থাকত অদ্ভুত পানসে স্বাদ। নতুন আলুর বৈশিষ্ট্য। পাতাটাকে চেটেচুটে তেলা করে ফেলতুম। তাই দেখে আমার বোন তার ভাগ থেকে একটু ভাগ দিত। ঝালের চোটে ওই শীতেও আমাদের নাকের ডগায় ঘাম জমত। শীত গেছে। শৈশব গেছে। বোন গেছে। স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছে পাকতেড়ে এক বৃদ্ধ।

সময়ের সেতু যত বড়ই হোক, মন তাকে ইচ্ছেমতো ছোট-বড় করতে পারে। শৈশব নামক নদীর ওপারটি যত দূরই হোক তাকে ইচ্ছে করলেই নাগালে আনা যায়। মনে হয়, এই তো সেদিন। এই তো সেদিন আমাদের দোতলার ঘরে সাদা বিছানায়, সাদা লেপের তলায় শুয়ে আছে শিশুটি। পাশে শালমুড়ি দিয়ে বালিশে আড় হয়ে আছেন তার জ্যাঠামশাই। যিনি সারাদিনে দুটি পান খেতেন। সকালে আর রাতে খাওয়ার পর। সামান্য একটু জর্দা। সেই গন্ধে মনে একটা সুখ-সুখ ভাব হত। জ্যাঠামশাইয়ের মুখটা যত না কাছে তার চেয়েও বেশি কাছে মনে হত। তিনি মজার

মজার সব গল্প শোনাতেন। সেই গল্প শুনে মেয়েরা সব হাসাহাসি করত। গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করত। গঙ্গার ব্রিজের ওপর দিয়ে মালগাড়ি যাবার একটানা গুমগুম শব্দ উত্তুরে বাতাসে ভেসে আসত। মনে মনে ভাবতুম, ইঞ্জিনের ড্রাইভার তবু আগুনের কাছে আছে, কিন্তু গার্ডসায়েবের কতই না শীত করছে। গাড়ির শব্দ লেপের তলা থেকে আমার মনটাকে তুলে নিয়ে যেত দূরে, বহুদূরে। জামতাড়ায়, মধুপুরে, দেওঘরে, কারমাটারে, সিমুলতলায়।

শীতে বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ তখন বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে খুব চালু ছিল। এখন হয়েছে পুজোয়। বাঙালির আর একটি প্রিয় জায়গা ছিল সাহেবগঞ্জ। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট একটি শহর। পাশে বয়ে চলেছে গঙ্গা। সেখানে আবার ছিল নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। এখনও হয়তো আছে। সন্ধেবেলা পাহাড়ের মাথায় ফুসফুসি ঘাসে কারা আগুন ধরিয়ে দিত। কাঁচের ঘরে বসে মাংসঅলা মাংস বিক্রি করত। সকালে ঘি-চপচপে মোহনভোগ খেয়ে বড়দের হাত ধরে মাইলের পর মাইল শুধু হাঁটা। পাহাড়ী নদীর মজা বুকে গোল গোল নুড়ি আর চুনাপাথর। চলতে পা হড়কে যেত। এমত শীত যে গলাবন্ধ অলেস্টার পরেও যুত হত না। মাথায় হনুমান টুপি। গলায় মাফলার। পায়ে মোজা। কিছুক্ষণ হাঁটার পরই নাকে জল। নিজের আঙুল গলার কাছে ঠেকালেই ছ্যাঁক করে উঠত।

শীতে একবার গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন, এখন অদৃশ্য কর্জন পার্ক আর চিড়িয়াখানায় যাওয়া হতই। সঙ্গে খাবার আর অজস্র কমলালেবু। চিড়িয়াখানার ঝিলে অজস্র হাঁস। বেতগাছের ঝোপের পাশে শতরঞ্জি বিছিয়ে রোদে বসা। কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে এক-একটি কোয়া মুখে ফেলা। শীতের সঙ্গে রোদ্দুর রঙের কমলালেবুর গন্ধের একটা আত্মীয়তা আছে। লেবুর কোয়ার ফুল বের করে খাওয়া ধৈর্যের ব্যাপার হলেও এক ধরনের বিলাসিতা। আমার পরিবারের সুন্দরী মেয়েরা কোথায় চলে গেলেন আমাকে ফেলে। আমার মা, জ্যাঠাইমা,

দিদি। নীল রঙের ফুলহাতা সোয়েটার, সিল্কের শাড়ি, মাথায় সিল্কের স্কার্ফের ঘোমটা। পায়ে ডোরাকাটা পামশু। শীত এলেই মেয়েদের দেহত্বক আরও তেলা, আরও শুভ্র হয়ে উঠত। মরা-মরা চিড়িয়াখানাটা এখনও আছে। ঝিলে আর তেমন পাখি নামে না। মিলিয়ে গেছে শীতের দুপুরে আমার প্রিয়জনদের উচ্ছল হাসি। সেই জমিটুকু আছে, যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে পৌষের দুপুরে সুখী একটি পরিবার গিয়ে বসত। রোদ মোলায়েম হতে হতে একসময় গিয়ে উঠত গাছের মাথায়। বিছনো খবরের কাগজ শীতল হয়ে আসত। গুটি গুটি সবাই এগিয়ে যেত গেটের দিকে। ঘাসের ওপর থেকে তুলে নিত গরমজামা।

আমাদের ছাদে ঢালু একটা চিলের ছাদ ছিল। অনেকটা বসে থাকা চিলের মতো। তারই ছায়ায় মাদুর পেতে শীতের দুপুরে অঙ্ক কষা। শ'খানেক বড় বড় টবে নানা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। সেকালের অনেক বাড়িতেই চন্দ্রমল্লিকার চর্চা ছিল। প্রখর শীতের যাদুতে চন্দ্রমল্লিকার রূপ খোলে। এই জাপানি ফুলকুমারীকে দিয়ে শীত মাপা যায়। শীত যখন সময়ের পথ গড়িয়ে মাঝামাঝি চলে যায় তখন আসর সাজাতে আসে ডালিয়াকুমার। তখন শীত ছিল, মানুষের শখ ছিল, খোলামেলা ছাদ ছিল। ছাদে ছাদে ছিল ফুলের বাহার। হেলিকপটার নামার জন্যে যেমন প্যাড চাই, সেইরকম শীত নামার জন্যে চাই বড় ছাদ আর সবুজ মাঠ। একালের মানুষের জীবন থেকে ছাদের বিলাসিতা হারিয়ে গেছে। মাঠ হারিয়ে গেছে কংক্রিটের জঙ্গলে। অধিকাংশ মানুষই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। ছাদ পড়ে থাকে তালাবন্ধ।

শৈশবে আমার জীবনে একটা ছাদ ছিল। সেই ছাদের তলায় ছিল শীতের লেপের নরম উষ্ণতার মতো স্নেহভরা এক পরিবার। হাসি ছিল, গান ছিল, গল্প ছিল। সদলে বেড়ানো ছিল। ছাদে রোদে বসে তেল মাখা, সেই রোদে বসে স্নান। পায়ে জড়িয়ে যেত ছাদের কালো কালো বালি। ঠান্ডা শরীর ধীরে ধীরে রোদের তাপে গরম

হত। মনে হত ক্রমশই সজীব আর সতেজ হয়ে উঠছি। শরীরের ত্বক থেকে উঠত জীবনের গন্ধ।

চিলের ছাদের ছায়ায় বসে বিদ্যাচর্চা। পাশেই ফুলের মেলা। রোদ যেন বর্ণ ঢালছে, নেশা ঢালছে চন্দ্রমল্লিকার পাপড়িতে। মাঝে মাঝে ভ্রমর আসত স্কুলের হেড মাস্টারের মতো পর্যবেক্ষণে। ডেঁও আর লাল পিঁপড়ে আসত সার দিয়ে লোভীর মতো খাদ্যের সন্ধানে। ছুটছাট প্রজাপতিও আসত নেচে নেচে। আমাদের এলাকায় ঘুড়ি উড়ত সরস্বতী পুজোর সময়। ঘুড়ির খুব নেশা ছিল। পুজোর এক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত। আর পুজোর দিন আকাশ ছেয়ে যেত রঙবেরঙের ঘুড়িতে। ঘুড়ি মানুষের চোখকে আকাশলগ্ন করে। নীলের নেশায় বন্দি করে দেয়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দ্বিপ্রহরের আকাশের দিকে চোখ মেললেই দেখা যেত লাট খাচ্ছে চাঁদিয়াল, পাক মারছে চিল। সেকালে আবার ঘুড়ি বেড়ে প্রেম হত। আমাদের পাড়ার পাকা ছেলে বিজয় ঘুড়ির গায়ে লিখলে, আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর সেই ঘুড়িটাকে নামিয়ে দিলে বোস-বাড়ির ছাদে। আলসেতে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দরী উত্তরা। রোদে চুল শুকোচ্ছিল। ভালবাসার বদলে বিজয়ের বরাতে জুটল অভিভাবকের জুতোপেটা।

শীতের ভোরে ঘরের জানালা খোলাটাও ছিল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কোনও কোনও দিন জানালা খুলেই অবাক। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব ধোঁয়া। আকাশ বাতাস যেন জমে গেছে। কুয়াশা, কুয়াশা বলে চিৎকার চেঁচামেচি। কথা বললেই মুখ দিয়ে ভলভল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জানালার বাইরে অদৃশ্য হাতের পাঁচিল তৈরি হয়েছে রাতারাতি। রাস্তায় মাফলারে মাথা ঢেকে কে চলেছে বোঝা দায়। সবাই যেন আততায়ী। রুটির গাড়ি চলেছে কফিনের মতো। বড়রা বলছেন—লন্ডন-ফগ। আমরা কথা বলছি, ভলকে ভলকে ধোঁয়া। মনে মনে ভাবছি, সায়েব হয়ে গেছি।

অনেক অনেক পরে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে ভেজা ভেজা রোদ গরাদ গলে লাল মেঝেতে পিওনের ফেলে যাওয়া চিঠির মতো এসে পড়ল।

ইস্ত্রি করা নিভাঁজ নীল আকাশে গলগলে আনন্দের মতো ঝাঁক ঝাঁক পায়রা। ছেঁড়া মাকড়সার জালের মতো কুয়াশা তখনও ঝুলে আছে ঝোপেঝাড়ে, মাটির কাছাকাছি। আমরা ছুটে যেতুম ঘাসের ডগায় শিশিরের নোলক দেখতে। সবুজ, ভেলভেটের মতো বহুবর্ণ কচু-পাতায় টুসটুস করছে বিশুদ্ধ শিশিরের ফোঁটা। হাঁসেদের শীত নেই। পুকুরের সবুজ জলে পেছন উল্টে উল্টে চান করছে। প্যাঁক প্যাঁক ডাকে প্রভাত মুখর। গরুর দুধ দোয়া হচ্ছে। দুধ থেকেও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

শীত কি সত্যিই পড়ে না? না বহুদিনের বেঁচে থাকার কর্কশ অভিজ্ঞতায় প্রবীণদের চামড়া গণ্ডারের মতো পুরু আর অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে? বাসন্তী রঙের উল জড়ানো, রাঙা টুপি মাথায় তিন মাসের টাটকা শিশুটি প্রবীণ পিতার বুকের কাছে। তার চোখ দুটি যেন নীলকান্ত মণি। তার আপেলের মতো গালে আমার ভাঙা গাল ঠেকালুম। কি ঠাণ্ডা! নিঃশ্বাসে পবিত্র দুধ-দুধ গন্ধ। শীত কি তাহলে আছে! প্রবীণের বুকে ধরা পবিত্র শিশুটির মতো!

ভোজ কয় যাহারে

বাংলায় একটা সুন্দর নির্দেশ আছে গ্রাম্য ভাষায়, 'হুঁহুঁ দিয়, হাঁহাঁ দিয়, না দিয় ব্যাঘ্র ঝম্পনে'। নির্দেশটি অবশ্যই পরিবেশনকারীদের প্রতি। আহার যিনি করছেন, কোনও পদ পরিবেশনের সময় তিনি হয়তো বলবেন, 'হুঁহুঁ, আর না আর না।' শুনবে না সেই বাধা, পাতে দিয়ে যাবে। পরের বার তিনি আরও একটু জোরে বললেন, 'হাঁহাঁ, দিয়ো না দিয়ো না।' এবারেও শুনো না। ফেলে দাও পাতে। যখন তিনি বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন, 'তবে রে!' তখন আর দিয়ো না। এক সময় এই ছিল বাঙালির ভোজন করানোর রীতি। খাইয়ে ফ্যাট করে দাও। কথায় আছে, খেয়ে আর খাইয়ে বাঙালি ফতুর। অবাঙালিরা অবাক হয়ে যান, এত রকম খাওয়ার কী প্রয়োজন! অকারণ অপব্যয়। আমি অবাঙালির বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি কোনও ঝামেলা নেই। হাঁকডাক নেই। খেতে বসে মাথা ঘুরে যাবার সম্ভাবনাও নেই। গোটা চারেক গরম চাপাটি। ঘিটা অবশ্য খাঁটি। মুলুক থেকে আমদানি। একটা সবজি। একটু ডাল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাঁচা একটা কাঁকড়ি। রাইতা। সেঁকা পাপড়। দি এণ্ড। মিনিট দশেকের মধ্যেই গোটা পরিবারের খাওয়া শেষ। সবই গরম। চাপাটি পরিবেশন করা হল একটা একটা করে। এই তরিবাদিটুকু ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না। কিন্তু বেশ তৃপ্তি হয়েছিল। হাবিজাবি খেলে 'আঃ!' শব্দটা মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। বেরিয়ে আসে, উঃ! উঃ, কি সাংঘাতিক খাওয়া হল! অনেক সময় মনে হয় মরে যাব না তো! এক অনুষ্ঠান-বাড়িতে, মনে আছে, পরিবেশনকারী গৃহস্বামীকে বলছেন, 'কী করা যায় বলুন তো, ছিটেবেড়ার মতো ওই মাঝের ভদ্রলোক আটত্রিশটা কমলাভোগ টেনে এখনও বলছেন, আর এক রাউণ্ড ঘুরিয়ে দাও! এক-একবারে গণ্ডার কম ঠাণ্ডা হচ্ছেন না!'

সেকালের নিমন্ত্রণবাড়িতে এইরকম সব স্পেসালিস্ট দেখা যেত। আমার পরিচিত একজন ছিলেন, পোলাও স্পেসালিস্ট। বলতেন, 'কি খুচুর খুচুর এক হাতা, দু হাতা দিচ্ছ! বালতিটা বসিয়ে দিয়ে

যাও।' খাওয়ার পর সারারাত তিনি ছাদে চিত হয়ে পড়ে থাকতেন, পাশে এক বালতি জল আর মধুপর্কি একটা গেলাস। একটু একটু জল ঢালছেন মুখে। এই ভোজনবিলাসের ফলে কতবার তিনি মৃত্যুর এক চুল তফাৎ থেকে একটুর জন্যে ফিরে এসেছেন।

এ সবই হল আনুষ্ঠানিক ভোজনের কথা, যেখানে গৃহস্বামী আভিজাত্য ট্র্যাডিশান জাহির করতে চান। নিমন্ত্রিতরা ফেলে, ছড়িয়ে, নষ্ট করে, উদগার তুলে, বাবা রে, মা রে শব্দ করে বলে ওঠেন, টেরিফিক খাইয়েছে ভাই। এই রকমের এক নিমন্ত্রণ-অনুষ্ঠানে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। বিশাল লনে সাদা সাদা গার্ডেন চেয়ার। একটাতে গিয়ে বসলুম। বসামাত্রই নিপাট বাঙালি সাজে সুন্দর এক তরুণ এসে ফুস-ফুস করে সারাগায়ে ছড়িয়ে দিল গোলাপি আতর। তারপর আর একজন এসে হাতে ধরিয়ে দিল একটা কাগজের রুমাল! রুমালে ছাপা আহার্য-তালিকা। গোটা চল্লিশ আইটেম তো হবেই। এরপর এল একটা কাগজের প্লেট। প্লেটে আদা-কুঁচি ফিনকি-ফিনকি, নুন আর লেবু দিয়ে জরানো। আর নখের কোণার মতো ছোট ছোট নিমকি, গজা, মতিচুর। আসল আহারপর্বের আগে জিভের জড়তা ছাড়াবার ব্যবস্থা। চল্লিশ, পঞ্চাশ পদ আহারকে ভোজন না বলে খাদ্যের সঙ্গে জিভের মল্লযুদ্ধ বলাই ভাল। কিছু পরেই আমরা বসে গেলুম পঙ্‌ক্তি ভোজনে। গৃহস্বামী হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, 'যৎসামান্য আয়োজন, অনুগ্রহ করে নষ্ট করবেন না। দেশের দুর্দিনের কথা স্মরণে রেখে সব খেয়ে নেবেন।' খাওয়া চলছে তো চলছেই। সে আর ফুরোয় না। আমার পাশের ভদ্রলোক একজন প্রথিতযশা খাইয়ে ও ডাকসাইটে ঝগড়াটে। আমার খুবই পরিচিত। আর এক নিমন্ত্রণবাড়িতে আমরা দুজনে এইরকম পাশাপাশি বসেছিলুম। তাঁদের আয়োজনে সামান্য খামতি ছিল। তিন পদের পরেই চাটনি। চাটনি পড়লেই বুঝতে হবে শেষ দেখা গেল। আমরা যে জায়গায় বসেছিলুম তার পাশেই কল! হাত ধুয়ে ভদ্রলোক গৃহস্বামীকে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'খাওয়ার চেয়ে আঁচানোটা ভাল হল।' এই সেই ভদ্রলোক। তিনি খাচ্ছেন, মাঝে মাঝে শরীর ঝাঁকাচ্ছেন। যেন টিনে আর জায়গা নেই। ঝাঁকিয়ে যতটা ধরানো যায়। কোমরের কষি আলগা করছেন। তখনও দশ-বিশ আইটেম বাকি। ভদ্রলোক রাগতে

শুরু করেছেন। গজগজ করে বললেন, 'ব্যাটারা মানুষ মারার তাল করেছে!' আমরা যে উঠে পালাব সে উপায় নেই। গৃহস্বামী পরীক্ষা-কেন্দ্রের 'ইনভিজিলেটারের' মতো ঘুরছেন, আর বিনীত গলায় বলছেন, 'অসুবিধে হলে বলবেন।' ভদ্রলোক বললেন, 'অসুবিধে একটাই—আমরা আর পারছি না। স্ট্রেচার আর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রেখেছেন তো?'

'কী যে বলেন! আপনার মতো খাইয়ে এমন কথা বললে শুনব কেন? এই কে আছ? এই পাতে একটা মার্সিপিসি দিয়ে যাও।'

ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'শালা জল্লাদ!'

মার্সিপিসি হল চিংড়িমাছের একটা পদ। অনেকটা সুইট অ্যান্ড সাওয়ারের মতো। পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তখন অনেকেই আর্তনাদ শুরু করেছেন।

'আর পারছি না, দুর্লভবাবু এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। আর কোনও দিন করব না।'

গৃহস্বামী দুর্লভবাবু ভিলেনের মতো হাসতে হাসতে বলছেন, 'এই তো কলির সন্ধে মশাই। এখনও অনেক বাকি।'

সব শেষে যখন মনে হল আর কিছু নেই—এলো আম। পরিবেশনকারী ভদ্রলোকের পাতে একটি ফেলতে ফেলতে বলছেন, 'মধু বুলবুলি। মধু বুলবুলি।'

তিনি আর ভদ্রতা রাখতে পারলেন না। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে উঠলেন, 'শালা, মধু গুলগুলি!'

সেই গ্রাম্য একটি কথোপকথন ছিল। পণ্ডিতমশাই মুখ সিঁটকে আহার করছেন। একজন বললেন 'পণ্ডিতং পণ্ডিতং মুখ কেন সিঁটকিতং?' পণ্ডিত বললেন, 'কাছায় পটুতং।' 'যাও না কেন নদী' 'পণ্ডিত বললেন, 'বাকি আছে দধি।'

রোমানদের ভোজনপ্রিয়তার কথা ইতিহাসে আছে। খাবার টেবিলে নিমন্ত্রিতদের পায়ের তলায় একটি করে বর্জনপাত্র রাখা হত। পেটে চাপ পড়তে পড়তে পরিবর্জনের প্রয়োজন হতে পারে। খাওয়ার ঘরের পাশে থাকত 'ভমিটোরিয়াম'। উঠে গিয়ে কিছু তুলে বের করে দিয়ে এসে আবার বসে পড়ো পুর্ণোদ্যমে। রোমসাম্রাজ্যে ক্রীতদাসের অভাব ছিল না। রাজপুরুষদের সেবা তারাই করত। আমাদের সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা খাওয়া-খাওয়া করে অস্থির। ঘরে ঘরে মহিলারা একবার রান্নাঘরে ঢুকলে সহজে বেরোতে চান না। চলছে তো চলছেই। রোজ তিন চার পদের কম বাবুদের মন ভরে না। এক অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, অবস্থার উন্নতি হলে বাঙালির ভাজা খাবার প্রবণতা বেড়ে যায়। আলুভাজা উচ্ছেভাজা দিয়েই অর্ধেক ভাত সাবাড়। আমাদের ঘৃতপ্রীতি এই ভেজালের যুগেও নষ্ট হয়নি। গরম ভাতে দু চামচ ঘি পড়লে বাঙালি এখনও বলে, 'উঃ, ফেটে গেল!' অনেকে আবার এর ওপর দু'চার ফোঁটা গন্ধরাজ লেবুর রস যোগ করবেন। এই প্রসঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির একটি বিলাসিতার কথা মনে পড়ছে। যেখানে সবাই খেতে বসেছেন, সেখানে একজন একপাশে বসে একের পর এক গন্ধরাজ লেবু কেটে চলেছেন। গন্ধে চারপাশ আমোদিত। যেমন কমলালেবু। নিজে না খেয়ে একজন লোক ভাড়া করে তাকে গোটাকতক কমলা কিনে দাও, সে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে খেতে সামনে হাঁটবে—আমি তার পেছন পেছন। গতি বাতাসের উল্টোদিকে। লেবুপাতা দিয়ে আগে ঘি জ্বাল দেওয়া হত। ভাতে দেওয়া হত পায়েসপাতা। একালে চালের আর সে রকমারি নেই।

সীতাসাল ঝিঙাসাল চামরমণি, এখন ওই এক বাসমতী, তাও রোজ নয়, বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন বাজেট বুঝে। সাধারণভাবে বাঙালির বরাতে নিত্য যে চালের ভাত জোটে তার নাম পেরেকমণি। ভাতের গন্ধ আর অঘ্রাণের সুঘ্রাণে আকুল করে না। পচা দুর্গন্ধ। যাকে সাধারণ মানুষ বলে নাদপচা গন্ধ। একজন বলেছিলেন, ভাত হল মিডিয়াম বা মাধ্যম। ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস ভাতে আরোহণ করে উদরে প্রবেশ করে। ভাতের চাল ভাল না হলে তরকারির স্বাদ খোলে না। ভাত হল ভিহিকল, বাহন।

যাক ভাত নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। এখন ভাবা যাক, কে সেই রসিক, যিনি মাথা খাটিয়ে বের করলেন 'পারফোরেটেড আলুর দম'। আলুর দম এমনি মশলার গুণে চলে যায়। নিরেট আলু ভেতরে কোন ঝোল টানতে পারে না। সেই বালি-বালি সুস্বাদু নৈনিতাল আলু উচ্চফলনশীলের দাপটে লুপ্ত। তখন মাথায় এল আলু সেদ্ধ করে সোয়েটার বোনার সাত নম্বর কাঁটা দিয়ে ঝাঁঝরা করো ফুটো

ফুটো। এক বাড়িতে গিয়ে দেখি, মা আর মেয়ে পা ছড়িয়ে বসেছেন। গামলায় ডাঁই করা সেদ্ধ আলু। পাশে আর একটা খালি গামলা। দুজনেরই হাতে উল বোনার কাঁটা। আলু শতছিদ্র হয়ে চলে যাচ্ছে পাশের গামলায়। সামান্য একটু স্বাদের জন্যে বঙ্গরমণীর কী পরিশ্রম!

আচ্ছা, কার মাথায় এসেছিল সেই বিদঘুটে পরিকল্পনা? পটল —সেই পটল না কেটে তার নিজস্ব মালমশলা বের নিয়ে ঢোকানো হল পুর। এইবার প্রবেশ পথ সিল করে ফেলা হল তেলে। ছাঁকা তেলে ভাজা সেই বস্তুর নাম দোলমা। আমি নিজে একবার চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হয়ে আউট হয়ে পড়ে রইলুম তিন দিন। কড়ার গরম তেল থেকে পটলের পেছন খুলে ছিটকে এল ছোলার ডালের পুর, আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো। গ্রাউন্ড টু এয়ার নয়, কড়াই টু কপাল। একেই বলে কপাল পোড়া!

কার মাথায় এসেছিল, নারকোলের একটা পাশের চোখ খুলে জল ফেলে দিয়ে, তেল আর মশলা মাখানো কড়ানে চিংড়ি একটা একটা করে সেই খোলে ঢোকানো হল। তারপর ফুটোটাকে ভাল করে ঝেলে ফেলে দেওয়া হল উনুনে। বেরিয়ে এল এক অসাধারণ চিংড়ির প্রেপারেশান।

শীতকালে ডাল বেটে ছাদে বসে টুকুস টুকুস করে সারাদিন ধরে নানা রকম বড়ি পাড়ার ধৈর্য ও সময় বাঙালির ছিল। এখন আর সে সময় নেই।

কাসুন্দি তৈরির ফর্মুলা যেমন বিচিত্র, তেমনি সেই ফর্মুলা ধরে কাজ করার পদ্ধতিও অতুলনীয়। স্নান করে শুদ্ধবস্ত্রে কাসুন্দিকে কাচের জারে অথবা কড়িতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আচার যে কত রকমের হতে পারে, তা আমরাই জানি। কুলের অম্বল খেয়ে আমার এক জার্মান বান্ধবী বলেছিলেন, এমন একসটেমপোর আইটেম লাইফে খাইনি! গ্লাইডারের মতো গলা দিয়ে নেমে গেল।

ইংরেজ আমলে এক বাঙালি বেনিয়ানের বাড়িতে নিমন্ত্রিত সায়েবকে থোড়ের তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট ইজ দিস? বাঙালিবাবু বললেন, থাই অফ ব্যানানা ট্রি। বাঙালি পুরো কলা গাছটাকেই কাজে লাগিয়েছে। কলাপাতায়

খাওয়া। কাঁচকলা আর মোচার কোফ্‌তা। কদলিকাণ্ডের অন্তকরণে থোড়ের ঘণ্ট। পাকা কলা দুধেতে ডলি, তাহাতে আমসত্ত্ব ফেলি, হাপুসহুপুস শব্দে। লাউয়ের সঙ্গে চিংড়ি, পুঁইশাকের সঙ্গে ইলিশের মাথা যেমন সব কম্বিনেশান, তেমনি তার টেস্ট। বাঙালি ওসবে ভয় পায় না, প্রেসার সুগার কোলেস্ট্রাল। বাঙালির মটো খেয়ে মরব। ডাক্তারবাবুর কাছে গেছি, তিনি বললেন, শুনুন মশাই, আপনার পেটের চিকিৎসা আমি করব কিন্তু তার আগে আপনি দমভোর খাওয়া শুরু করুন, যা প্রাণ চায়, তারপর আমি আছি।

সেই দৃশ্য ভোলার নয়, শীতে বাঙালিবাবু বাজার করে ফিরছেন। হাতে বিশাল ব্যাগ। উঁকি মারছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। গলায় ঝুলছে ঝোলা ব্যাগ, সেখানে আছে লঙ্কা আর লেবু আদা ধনেপাতা। এক হাতে তাঁর একতাড়া মুলো আর কাঁধে ঝুলছে দড়িবাঁধা ফুলকপি। চলমান উদ্যান। পেছন পেছন আসছে একটি ছাগল ও উদাসী গরু।

আমরা সবাই বাম

আমি রাজনীতির কথা বলছি না, আমি সাধারণ জীবনের প্রসঙ্গে বেশ একটা ধন্দে পড়ে গেছি। রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থীর বিভাজনে তেমন কোনও জটিলতা নেই। সংজ্ঞাটি শিশুরও বোধগম্য। কেন্দ্রে যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরা দক্ষিণপন্থী। সেই ক্ষমতা থেকে যাঁরা টাল খাইয়ে ফেলে দিতে চান তাঁরা বামপন্থী। বামপন্থা মানে প্রতিবাদ, মিছিল, ধর্মঘট, দেয়াললিখন, পথসভা, উগ্র ভাষণ, কেন্দ্রের সমালোচনা। বামপন্থী মানে ক্রোধী ও উগ্র স্বভাবের একদল মানুষ, যাঁদের স্লোগান হল ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। বামপন্থা মানে বিপ্লবহীন বিপ্লব। এক ধরনের রোমান্টিকতা। মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত মানুষের ভাবনা—'আমরা সর্বহারা, আমরা শোষিত, নিপীড়িত, নিরন্ন।' ক্ষমতার আসনে হয়তো বসে আছি। গাড়ি চাপছি। রম্য বাসস্থানে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে ঈর্ষণীয়ভাবে ভালই আছি। ছেলেমেয়েরা ভাল স্কুলে পড়ছে। সবই আছে—কিন্তু সুখ নেই মনে। এ বৈভবটুকু নিতান্তই বাইরের। মায়া। ভেতরে বসে আছে তৈলহীন, রুক্ষ এক সত্তা। সে বসে আছে ফুটপাথে, ঝুপড়িতে, শ্রমিকের ধূমলাঞ্ছিত খুপরিতে। সে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেতমজুরের খোলসে। সুকোমল শয্যায়, সুবাসিত স্ত্রীর পাশে শুয়েও তার মনে হচ্ছে শুয়ে আছে চটে। কঙ্কালসার স্ত্রী খুকখুকে কাশছে, একগাদা ন্যাংলা ন্যাংলা ছেলেমেয়ে চারপাশে উদোম হয়ে পড়ে আছে। তিনটে রাস্তার ঘেয়ো কুকুর গায়ে গা লাগিয়ে ঘ্যাঁসোর ঘ্যাঁসোর গা চুলকোচ্ছে। ঘরের ও-মাথায় ফ্রিজের মটোর পর্যায়ক্রমে জাগছে আর ঘুমোচ্ছে। জানালার সুদৃশ্য পাতলা পর্দা বাতাসে উড়ছে। তবু মনে হচ্ছে, কাল সকালে হাঁড়ি চড়বে তো! যদিও সাত-সকালে হাতে আসবে ফ্লেভারঅলা, ভুরভুরে চা, আসবে হালকেতার ব্রেকফাস্ট। মাছের ঝোল ভাত বা চিকেন-কারি। ভেতরের সত্তা সে-সব গ্রহণ করবে না। সে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে উপবাসীই থেকে যাবে। এই আত্মিক হাহাকারই হল বামপন্থা। এই হাহাকারই

তাকে রাগী করবে, উগ্র করবে, অসহিষ্ণু করবে। প্রচলিত ব্যবস্থার সমস্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থেকে, সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার কল্পনাই হল বামপন্থা। এই মনোভাব থেকেই জাগ্রত হবে বিদ্রোহী চেতনা। প্রতিষ্ঠিত সমস্ত মানুষকে মনে হবে সুবিধাভোগী শয়তান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মনে হবে ক্রীতদাস তৈরির আখড়া। ধর্মকে মনে হবে দরিদ্রের আফিং। শ্রম-প্রতিষ্ঠানকে মনে হবে শোষণের যন্ত্র।

এই প্রেক্ষিতে কোনও কোনও দলের সক্রিয় সভ্য না হয়েও, প্রায় সমস্ত যুবকই আজ বামপন্থী। সেকালের ভাল ছেলের সংজ্ঞাটাই একেবারে পাল্টে গেছে। 'গুডি গুডি বয়'রা আর নেই। পারিবারিক সমস্ত প্রকার শাসন একালে অচল। কোনও কিছুর কাছে নতি স্বীকার করাটা অগৌরবের, অপমানের। একালের প্রবীণ পিতামাতারা সেই কারণে পুরাকালের দাপট একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। সংসারে, সমাজে তাঁরা এখন ঘৃণিত দক্ষিণপন্থী। তাঁরা হলেন, সদাসমালোচিত কেন্দ্রের মতো। পুত্ররা হলেন, পুরোপুরি বামপন্থী। বাইরেটা ভাঙতে না পারলেও, ভেতরটা তাঁরা সাফল্যের সঙ্গেই ভেঙে ফেলেছেন। প্রকৃত বিপ্লব পরিবারে-পরিবারেই ঘটে গেছে। ধীরে। সবার অলক্ষ্যে। একালের যুবকদের কোনও অভিভাবক নেই। কারও কাছে কোনও রকমের বশ্যতা স্বীকারের মানসিকতাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। পরিবারও এক ইনস্টিটিউশান। প্রতিষ্ঠানের দাসত্বে তাঁদের অপরিসীম ঘৃণা। গুরুজনরা তাঁদের চোখে পেটমোটা, হলহলে বুর্জোয়ার মতো। ভোগী, লম্পট, মাথামোটার দল। পাপাচারে আসক্ত একদল শাসক, শাসক প্রতিনিধি। অকারণে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরাচ্ছে পদাধিকারবলে। আদেশ, কি উপদেশ, দুটো শব্দই একালে এক ধরনের গর্ভশূন্য, বাঁজা বাতুলতা। ব্যাবলিং ফুলস-এর দল। পেটের ওপর লুঙ্গি বেঁধে, দিবারাত্র পানের পিকের মতো উপদেশের পিচকিরি মারছে। সেকালের যুবকদের একটা চক্ষুলজ্জা ছিল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত তাঁরা পরিবারের প্রভুত্ব মেনে নিতেন। 'ভাসাল স্টেট'-এর মতো। তাঁদের প্রায়ই এইরকম কথা শুনতে হত, "আগে লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর নিজের মত খাটাতে এসো।" একালের যুবকরা সরাসরি বলে বসবেন, "ফুর্তির সময় মনে ছিল না যে আমরা আসতে পারি! আমরা নিজের ইচ্ছায়

যখন আসিনি, তখন আমাদের ম্যাও সামলাতেই হবে হাসিমুখে।" স্টেট আর ফ্যামিলি এখন এক হয়ে গেছে। স্টেটের কারবার বহুকে নিয়ে, ফ্যামিলির কারবার কয়েকজনকে নিয়ে। 'প্রোডাকটিভ', 'নন-প্রোডাকটিভ' সমস্ত নাগরিককে পালনের দায়িত্ব যেমন সরকারের, সেইরকম বিনীত, দুর্বিনীত, বাধ্য, অবাধ্য সমস্ত সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব পরিবারের কর্তার। প্রতিপালন মানে সন্ন্যাস আশ্রমের কায়দায় নয়। ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ বলে, মোটা জামা, মোটা কাপড়, ডাল-ভাতের ব্যবস্থা নয়। তোমারও যদি সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম হয়, তাহলে আমারও ওই একই ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি ছাত্র, তুমি বেকার বলে কোনও দুই-দুই চলবে না। আগে ছিল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। একালে কর্তা নেই। সবাই কমরেড। এই হল আমার দাবি, আমাদের 'মাঙ্গ'। কাঁদুনি গেয়ে পার পাবার উপায় নেই।

রাজনীতির বামপন্থায় আমরা কী দেখেছি? শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধা করা। মুখে প্রকাশ না করলেও, মনে মনে বলা, কে হে তুমি হরিদাস পাল! যে সময় সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কথায় কথায় ঘেরাও চলেছে, তখন এ দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে—সম্মানিত, সুপণ্ডিত, কর্মপটু দফতর-অধিকর্তা ঘেরাও হয়ে বসে আছেন। বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে আছেন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। জুতোসুদ্ধু ঠ্যাং তুলে দিয়েছেন টেবিলে। মুখে সিগারেট। সেই ঠ্যাং আবার নাচছে! পেছনে একদল দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা পালা করে মাথায় চাঁটি মারছেন। গালে ঠোনা। আর চতুর্দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছে অশ্লীল বাক্য।

এই মডেলটিই পরে গৃহীত হল যুবকদের দ্বারা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘন ঘন ঘটতে লাগল অনুরূপ ঘটনা। অধ্যক্ষের কাছা খোলা। চশমা কেড়ে নেওয়া। উপাচার্যকে ল্যাং মারা। এইসব উপাদেয় ঘটনাই হয়ে দাঁড়াল যৌবনের প্রতীক। অর্থাৎ বামমার্গী না হতে পারলে যৌবনের গ্ল্যামার থাকে না। এক লাল রঙের যেমন একাধিক দায় থাকে —ফিকে লাল, গোলাপি, সিঁদুরে লাল, আগুনে লাল, মেটে লাল, গাঢ় লাল, বামপন্থারও সেই রকম অনেক ভেদ আছে—বাম, মৃদু বাম, বিপ্লবী বাম, অতিবাম। অতিবামমার্গীরা একসময় স্মরণীয় পুরুষদের মূর্তি প্রভৃতির শিরচ্ছেদ করেছিলেন। ইংরেজ আমলের মহাপুরুষরা আসলে ছিলেন কাপুরুষ ম্যানিপুলেটার, ভাঁওতাবাজ। এই ছিল তাঁদের বক্তব্য

বা মতবাদ। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ। শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, জোতদার, মজুতদারদের তাঁরা ধড় থেকে মুণ্ড খুলে নিতে চেয়েছিলেন, কবর দিতে চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানের দালালদের। আন্দোলন ফুরিয়ে গেলেও মতবাদের পলি পড়ে আছে যুবকদের মনে। প্রশাসন বৃদ্ধ, জরদ্গব হয়ে গেছে, নির্বাচনের মাধ্যমে ঘুঘুর বাসা ভাঙা যাবে না। এই হতাশা থেকে এসেছে এক ধরনের অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা। কিছু মানছি না, কিছু মানব না। প্রায় সমস্ত যুবকেরই এই উগ্র মনোভাব। আর এই মনোভাবই হল বামপন্থী ভাব। কেন্দ্রের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে না পারলে, অর্থনীতির আমূল সংস্কার না করতে পারলে দেশের যখন কিছুই করা সম্ভব নয়, তখন রেগে রেগে চিৎকার করাই ভাল। থেকে থেকে বন্ধ ডাকাই ভাল। পথ হল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ। এই ক্রোধ শুধু কেন্দ্রের প্রতি নয়, জনগণের প্রতিও। প্রশাসনের তরফ থেকে যে কোনও গলতিরই এক উত্তর—কী হয়েচে কী? ওই রকমই হবে। সহ্য করতে হবে। অসহ্য হলে দিল্লি চলে যাও।

কেন কী হয়েছে, ওই রকমই হবে—এই মানসিকতা হিন্দি ছায়াছবির পর্দা ঘুরে প্রতিফলিত হয়েছে যুবমানসে। আর সেই মন থেকে প্রতি-প্রতিফলন হচ্ছে একটি শব্দে—আবে চল্। চল্ আর ফোট্—এই হল একালের যুবকদের বেদবাক্য। বাম রাজনীতিকরা যেমন তাঁদের কাজের কোন জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নন, তেমনি যুবকরাও। শিক্ষা আর পরিবার অনুসারে তাঁদের মুখে তিনটি ধাক্কা মারা উদ্ধত শব্দ—বেশ করেছি, সো হোয়াট, চল্ ফোট্। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই যুবক ও অভিভাবকে সম্পর্ক কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের মতো হয়ে পড়ছে। পিতাপুত্র বা মাতাপুত্রে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে দুই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শত্রুর মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থীরা সরে আসছেন। ভাবছেন এই বয়সেই তো বাণপ্রস্থের বিধান। বন নেই, তবে মনের বনে চুপচাপ সরে যাওয়া।

বামমার্গীরা একটা কথা প্রায়ই বলেন, দুর্গ দখল। গৃহদুর্গ চলে গেছে যুবকদের দখলে। অর্থাৎ বিপ্লবের প্রথম পর্ব শেষ। বাপ-মা নামক অবুঝ প্রতিবন্ধী দুজন নির্বাসিত ডিকটেটরের মতো 'সেন্ট হেলেনা' দ্বীপের অধিবাসী। ফলে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহ

আর নানা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা গৃহ নয়—ক্লাব। ছাত্রদের কোনও রুটিন নেই। যখন খুশি ঘুম থেকে ওঠ। ইচ্ছে হলে পড়, না ইচ্ছে হলে রেখে দাও ও ঝামেলা। আপকা পসন্দ্। যখন খুশি টি ভি দেখ। টেপরেকর্ডারে গান শোন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মার। যা খুশি তাই করার ঢালাও স্বাধীনতা। শাসনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপকা মর্জি। ডিকটেটারের দিন শেষ। গণতন্ত্রেও বিশ্বাস নেই। যে লেখাপড়া জীবিকার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না, সে লেখাপড়ার জন্যে কে সময় নষ্ট করবে? পণ্ডিত হবার জন্যে পড়া? পণ্ডিত আর পাণ্ডিত্য দুটোই বুর্জোয়া দুনিয়ার ব্যাপার। বামমার্গী চিন্তায় যন্ত্রে আর মানবে কোনও তফাৎ থাকা উচিত নয়। যন্ত্র কি ভাবে? না ভাবা উচিত? যন্ত্রের অতীত নেই। যন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। যন্ত্রের শুধু বর্তমানটাই থাকা উচিত। সকাল, সন্ধে ঘুরে চল। ভবিষ্যৎ একটাই—বিকল হয়ে স্ক্র্যাপ হয়ে যাওয়া। যন্ত্রের সহবত নেই। এটিকেট নেই। ম্যানারস জানে না। যুবকরা নিজেদের দেহযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। বিনয় হল মেয়েলিপনা। দয়া করে সরে বসুন। অনুগ্রহ করে পথ দিন। এইসব অনুরোধ হল দুর্বলতা। এক ধরনের ন্যাকামি। আমরা 'মাসলসম্যান'। মারব এক ধাক্কা, আপসে সব সরে যাবে। যানবাহনে নিয়ত এই খেলাটি চলেছে। রাস্তার মাঝখানে দুই যুবকে গল্প হচ্ছে। পেছনে সামনে একের পর এক গাড়ি থমকে আছে। জোর করে সরাবার উপায় নেই। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। দুজন সামনাসামনি হেঁটে আসছে। একজন যুবক, একজন প্রবীণ। প্রবীণকেই পাশে সরতে হবে। এই মনোভাবও বামপন্থা। বাম দুনিয়ায় হৃতশক্তি প্রবীণ আর দুগ্ধহীন গাভীতে তফাৎ নেই। সেকেণ্ড গ্রেড সিটিজেন, পেনসানে বেঁচে থাকা। গেলেই হয়। মরছে না যখন, তখন বিনীত নতজানু হয়েই বেঁচে থাকো। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মায়া, মানবতা এইসব শব্দ বাম অভিধানে নেই। যুবকরাও এইসব বাতিল করে দিয়েছে। স্লোগান হয়েছে—বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে।

ধর্মের কথা তো কথারম্ভেই বলেছি। বামপন্থীরা ধর্ম মানেন না। ধর্ম হল বিষ্ঠাবৎ পরিত্যজনীয়। ধার্মিক মানে ভণ্ড। জীবনবিমুখ। পলায়নী মনোবৃত্তির মানুষ। ধর্মগুরু হলেন পরস্বাপহারী, অলস

এক মানুষ। যুবকরা ধর্ম মানেনা না। অর্থাৎ বামপন্থী। ধর্ম হল মানব-ধর্ম—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুন। শতকরা নব্বইজন ব্রাহ্মণ যুবকের গলায় পইতে নেই। প্রাচীনপন্থী, অ্যাবসার্ড, ভীরু পিতা-মাতারা উপযুক্ত বয়সে, ঘটা করে, বৈদিক নিয়মে উপনয়ন করিয়েছিলেন। কিশোর বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছিল। যৌবন সমাগমে তিনি সেই যজ্ঞোপবীতটিকে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে শান্তি-লাভ করেছেন। ধর্মের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। গঙ্গা-তীরবর্তী সুরম্য মন্দিরপ্রাঙ্গণ এখন প্রেমকুঞ্জ। তীর্থে বাজছে ট্রানজিস্টার—ববি, আই লাভ য়ু! যুবক-যুবতীর মেলামেশাতেই বামপন্থী বাতাস বইছে। বৈদিক বিবাহ সময় নষ্ট। দেখা হয়েছে, ভাল লেগেছে, শুয়ে পড়েছি—মিটে গেছে ল্যাঠা। পরে যা হয় একটা রেজিস্ট্রি-মেজিস্ট্রি করিয়ে নিলেই হবে। যদিদং হৃদয়ং মৃদয়ং সব বোগাস ব্যাপার! মনোবাদের স্থান নেই। দেহবাদ। পয়লা নম্বর, আমি ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড। দোসরা নম্বর, আমার প্রয়োজন। তিসরা নম্বর, জিও জিও। একালে সেই কারণে ঝগড়া মানে কথা-কাটাকাটি নয়, পয়লা চোটেই মারামারি। বোম চালাচালি। পেটো-পটকা। লাশের পতন। প্রথম কথাই হল—লাশ ফেলে দাও। তারপর ভাবা যাবে।

যে-সব যুবক শিক্ষিত, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, চিন্তায় ভাবনায় তাঁরাও বাম। তাঁদের পরিবারে যে বাতাস বয়, তা অনেক খোলামেলা। প্রাচীন পরিবারের তাবৎ বন্ধন তাঁরা ছিন্ন করেছেন। অষ্টপাশ মুক্ত। সর্বধর্মের সমন্বয়। আগে ছিল, তালের বড়া খাইয়া নন্দ নাচিতে লাগিল। এখন বড়দিনে—হুয়স্কি খেয়ে গোপাল আমার ঘাড়েতে পড়িল। পিঠে, পুলি, নকশি কাঁথা, কালীঘাটের পট হল ইন্টেলেকচুয়ালদের সংস্কৃতি সচেতনতা। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের স্পেশ্যাল দোকানে আলোকিতা মহিলা সংগঠন পুলি পিঠের আয়োজন করেছেন। কালীঘাটের পটের আলাদা স্টল। বড়ি আর কাসুন্দির সেলস্ কাউণ্টার। সাদা খদ্দর দক্ষিণপন্থী। তার ওপর কল্কার প্রিণ্ট পড়লেই বামপন্থী। কালো ট্রাউজার, বোতামহীন বেঁড়ে, হাইকলার, থ্রিফোর্থ হাতা, মুখে পাইপ, সঙ্গে কমরেড শ্রীমতী—বেরিয়ে পড়েছেন সংস্কৃতি শিকারে। কেঁদুলি মেলার বাউলরা অবাক। হলটা কী!

বাপের জন্মে এত পপুলারিটি তো ছিল না, ভোলামন। জিনস পরা ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ছেঁকে ধরছে। এদিক থেকে স্পিকার, ওদিক থেকে স্পিকার। খসখস নোট। থেকে থেকে প্রশ্ন—'মহাজন, ওই লাইনটা আর একবার, ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডেঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।' এত সব সুগন্ধী সৌখিন ছেলেমেয়েরা অচিন পাখির খোঁজে চলে এসেছে। মার টান। কলকে ফাটা।

পুরনো আটাত্তর, আর পি এম রেকর্ড, প্রাচীন কলকাতা, লোক-সংস্কৃতি এই তিন মিলে যে আঁতেল তাতে বামগন্ধ। অনেকে আবার একতারা কিনে আনেন কিউরিও হিসেবে। ছুটির দিন দেয়ালে ঝোলানো ছৌ-নাচের মুখোশে গাল ফুলিয়ে ফুঁ মারেন ধুলো তাড়াতে। দেয়ালে ড্রইং পিন দিয়ে মাদুর সাঁটেন। খোঁজ করেন, তারাপীঠে অ্যাটাচড বাথরুম আছে কিনা। সন্ধ্যার শাক, এঁটোকাঁটা, অভক্ষ্য আহারের বাছবিচার নেই। কিন্তু তন্ত্র একটি বাম সাবজেক্ট। বামাচার আছে। তার খোঁজে তারাপীঠ, কামরূপ, কামাখ্যা।

এইসব বিচারে আমিও বাম। বিশ্বাস নেই, নিষ্ঠা নেই, শ্রম নেই। আছে ওপরচালাকি। দেখার চেয়ে দেখাতে চাই। বিশ্বনিন্দুক, বিশ্বসমালোচক। সবার উপরে পার্টি সত্যের মতো, সবার উপরে আমি আর আমার পরিবার, আর আমার উপদেশ সত্য। নিজেকে যতটা সম্ভব ধোঁয়াশার মধ্যে রাখাটাই হল বামমার্গ। সত্য থেকে শতযোজন দূরে ধুকধুকে একটি অহঙ্কারের পিণ্ড। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? অল্পবিস্তর আমরা সবাই বামমার্গী। পৃথিবীর এতকালের দক্ষিণপন্থী ইতি-ইতি ব্যবস্থায় আমাদের ঘোড়ার ডিম হয়েছে। আয় বাড়েনি, দেনা বেড়েছে। দেহ বাড়েনি, দেমাক বেড়েছে। ধনকুবের ব্যবসায়ীরা বিশাল বিশাল বাড়ি তুলেছে। রঙবেরঙের গাড়ি ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। গায়েগতরে মেয়েরা ঠাণ্ডা বাজারে ঢুকে ঐশ্বর্যের অশ্লীল প্রদর্শনী করছে। ফুচকা খেয়ে এঁটোপাতা রাস্তায় ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর আমরা ট্যাঁকখালির রাজারা সেই ধনগর্বের পদতলে আঁতলামো করছি। শ্রদ্ধেয় যাঁরা তাঁরা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কখনও বলছেন ফরওয়ার্ড মার্চ, কখনও বলছেন ব্যাকওয়ার্ড মার্চ। আমাদের মার্চ করিয়ে তাঁরা সব দিকপাল হচ্ছেন। যে-ই লঙ্কায় যাচ্ছেন, তিনিই রাবণ হয়ে অট্টহাসি ছাড়ছেন। সিন্নি দেখে এগোনো, মোল্লা দেখে

পেছনো—এই নীতি আর কতকাল চলবে! স্বদেশী আমলেও দেখা গেছে, বাবা ইংরেজের খায়ের খাঁ, ছেলে বিপ্লবী, বোমা ছুড়ছে। একালেও তাই। একই পরিবারে প্রথম পুরুষ এসটাবলিশমেণ্টের দাস, দ্বিতীয় পুরুষ বিদ্রোহী। পরিব্যাপ্ত একটা ক্রোধ, একটা হতাশায় চারপাশ ছেয়ে গেছে। ক্রোধ হল বামপন্থা। আমরা আজ সবাই ক্রোধী।

নববর্ষের নকশা

চৈত্রের শেষ দিন। ট্যাট্যাং ট্যাট্যাং করে ঢাকে যেন সজনে ডাঁটার চাঁটি পড়ল। গেরুয়া পরা বাবার উপোসী চ্যালা আর চেলীরা বাবা তারকনাথের সেবায় লাগি বলে নেচে কুঁদে বছরটাকে ফুঁকে দিলেন। ছোট কল্কের চড়া টান। ভাঙা গালে আধপো কড়ুয়ার তেল ধরে যায় এমন গাব্বু। ওদিকে হুসহাস কলের গাড়ি প্যাঁক-প্যাঁকিয়ে ছুটছে। গাড়ির ভেতর ফিতে গান বাজছে, জমানা বদল গিয়া। সুর্মা সুন্দরী রাজা সিগারেট টানছেন। পাশে ডেনিম পরা ঝুমকোচুলো ছেলে-বন্ধু। বুকের কাছে ফটোযন্ত্র। ওদিকে চড়ক গাছে গজাল গেঁথা ছোকরা দুলছে। মেলায় বিকোচ্ছে শহুরে গার্দা। কাঁকরিকাটা ঝকঝকে লোহার থালা গেলাস, বাটি ঘটি। প্ল্যাস্টিকের গয়না। অম্বলের ওষুধ। ধনেশপাখির তেল। বোম্বে ছবির নায়ক-নায়িকার রঙ-মরা ফোটো। এসেছে পাঁচালি। ছুরি, কাঁচি, বঁটি, কাটারি। চিনেবাদাম বালির কড়াতে হুড়োহুড়ি করছে। পাতলা রসে গরম জিলিপির ওপর ধুলোর পোঁচড়া পড়ছে। যুবকরা সব গলায় রুমাল বেঁধে চোয়াড়ে গালে সস্তার সিগারেট ফোঁকা করছে আর আড়ে আড়ে ডাঁসা মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে। গাজনের মেয়েরা গাছতলায় এখানে ওখানে হেদিয়ে পড়েছে। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে হাঁটু ছেতরে বসে আছে। বেওয়ারিশ বাচ্চারা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এতে ওতে ঝটাপটি লাগলেই আধোমুখে কাঁচা খিস্তির খই ফুটছে। ঢাকীরা ডিঙ্গি মেরে মেরে চ্যাড়াক চ্যাড়াক বোল ছাড়ছে। কারুর ঠোঁটে বিড়ি নাচছে। পাশের পানাপুকুরে কর্মালিরা গতর ঠাণ্ডা করছে। ঝা গরম পড়েছে, বাপস! মা-নেওটো ছেলে কোল ছাড়তে চাইছে না। বুকের চুষী খুঁজছে ঢুঁ মেরে মেরে। গোটাকতক বুড়োহাবড়া ঘোলাটে চোখে ইতিউতি চাইছে। এখনও আশ মেটেনি। হাতে ছেলে-বিউনি লাল তাগা বেঁধে নন্দ মিস্ত্রীর গায়েগতরে বউ চিমসে তেলেভাজা কড়ায় তুলছে আর ফেলছে। পোদ্দার পাশে দাঁড়িয়ে মশকরা মারছে। মুফতে যা

মেলে। চাপদাড়ি কলকাতার বাবু ক্যামেরার চোখে সংস্কৃতি খুঁজছে। কাগজে আর্টিকেল লিখবে। একটা গরুর এই মোচ্ছবে পেট আলগা হল। থ্যাসথেসিয়ে নেদে দিলে। আর ঠিক সেই সময় পরানমাঝির পোলা আগুনে ঝাঁপ খাচ্ছে। দাঁতের কালো মাজনের গুণ গাইছে ক্যানভাসার। যৌবন নেতিয়ে গেলে কি দাওয়াই খাবে হাঁকছে হাকিম। এরই মাঝে সূর্য পশ্চিম আকাশে পটকে গেল। টুপুস টুপুস আলো নেচে উঠল এপাশে ওপাশে। মন্দাকিনী যাত্রাপালার কনসার্ট এক রাউণ্ড বেজে গেল। হেভি নাটক, পতির কোলে সতীর পুণ্য! মেয়েমন্দ সব মাঠ ভেঙ্গে ওগো চলো গো, ওগো চলো গো বলে পালের মতো তেড়ে আসছে।

বছর ঘুরে গেল। কোথাও মালক্ষ্মী, কোথাও অলক্ষ্মী। কেউ ফুলে ফেঁপে কোঁদলা হল। কারুর গায়ে খড়ি। কেউ করে ধানের হিসেব, কেউ করে খড়ের হিসেব। শহুরে খেটে খাওয়া মাসকাবারী বাবুরা মায়ের ভক্ত। আবার ওদিকে যারা গদিতে গজকচ্ছপের মতো গড়াতে গড়াতে সারাজীবন কেবল ভাও কিতনা, ভাও কিতনা করছেন, তাঁদের অবশ্য তারকেশ্বরে খুব মতি। সে আবার মজা মন্দ নয়! ছোকরারা শেঠের দেওয়া গেঞ্জি, প্যাণ্ট গতরে চড়িয়ে, কোমরে নতুন তোয়ালে জড়িয়ে, কাঁধে বাঁক নিয়ে ছুটছে ভোলে বোম, তারক বোম, ঘণ্টা বাজছে ঝুকুম ঝুম। মন্দিরের কাছে একটা পয়েণ্টে সব জড়ো হবে। শেঠ আসবে গাড়িতে, সেখান থেকে বাঁকটি কাঁধে নিয়ে দুপা হেঁটে বাবার সেরেস্তায়। দু ঘড়া জল হুড়হুড় করে ঢেলে পিলে চমকানো চিৎকার ভোলে বাম, তারক বাম। সারা বছরের বাণিজ্য ছলকে উঠল।

আমাদের বাবা মা দুগ্গা, মা কালী। মা আমার মন্দির আলো করে, বাবাকে পায়ের তলায় পেড়ে ফেলে বরাভয়দায়িনী। বছরের শুরুতে ওই মা-ই আমাদের গতি। মায়ের আমার কৃপার শেষ নেই। ওই মাথায় কলিতীর্থ কালীঘাট আর এ মাথায় আমাদের রাসমণির ভবতারিণী। মাঝখানে পিলপিল করছে কয়েক কোটি পাপীতাপী। কোথাও শান্তি নেই মা। পেটে কিলোচ্ছে, পিঠে কিলোচ্ছে। ঘরে ঘরে গজকচ্ছপের লড়াই। কোথাও বাড়িঅলা দোতলা থেকে মাথার চাঁদিতে গরম ফেন ঢালছে। কোথাও ভাড়াটে ভাড়া চাইতে গেলেই

কামড়াতে আসছে। কি করা যায় মা! জনতার জলকলে জলের লড়াই। তেলের লাইনে টিনের লড়াই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির লড়াই। হাসপাতালে যমে-মানুষে নয়, ডাক্তার আর রাজনীতির লড়াই। শ্মশানে মস্তান আর শবদাহকারীদের লড়াই। চাকরির জন্যে মুরুব্বি ধরার লড়াই। মা ভবতারিণী, তোর হাতের খাঁড়ায় কি ধার নেই মা? একটা লন্ডভন্ড লাগিয়ে দে মা।

পয়লা তারিখে মায়ের কাছে আর্জি জানাতে শয়ে শয়ে সন্তান এঁকে বেঁকে ছুটছে। কারুর পেটে আলসার কারুর কোমরে বাত। কারুর বাইপাস করা হার্টে আর তেমন পাম্প নেই। মা তো কারুর একার নয়, পাবলিকের মা। সেখানেও লম্বা লাইন। আগের রাতে ইট রেখে আগেভাগে টুপুস করে একটি পেন্নাম ঠুকে আসবে সেটি হবার জো নেই।

টেবিল-ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখো। শেষরাতে কানের কাছে কাঁসর বাজবে। তুড়ুং করে লাফিয়ে ওঠো। চটজলদি মেরে দাও এক কাপ চা। মায়ের দরবারে খালি পেটেই যাওয়া উচিত; তবে ঊষাকালে সূর্যোদয়ের আগে কয়েক চুমুক চা আগের দিনের অ্যাকাউন্টেই জমা পড়বে। শাস্ত্রকে আমরা অল্প একটু দুমড়েছি। আরে সংবিধানই সহস্রবার সংশোধন হয়ে গেল, শাস্ত্রে কি দোষ! এরপর ট্রেন ধরার মতো মায়ের লাইন ধরতে ছোটো। কোন্ মাকে ধরবো? কালীঘাট না দক্ষিণেশ্বর? দুই মা-ই সমান জাগ্রত। ঠিক মতো ধরতে পারলে বছরটা সামলে যাবে।

কে জানতো দাদারও দাদা আছে! যত আগেই যাও তিনশো জনের পেছনে লাইন। আজ্ঞে আমরা যে কাল রাত থেকে লাইন মেরেছি। আমরা হলুম গিয়ে লাইন এক্সপার্ট। আমাদের ঐতিহ্যকে কি সহসা ম্লান করা যায়! আমরা ময়দানে খেলার টিকিটে লাইন দিয়ে লাইন পাকা হয়েছি। রেলের টিকিটে লাইন মেরে দুঁদে হয়েছি। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য অভ্যাস করেছি। লাইন আমরা ধরতে জানি, লাইন আমরা লাগাতে জানি।

ভাববেন না, মন্দির আর বিলিতি ব্যাঙ্ক এখন সমান। এফিসিয়েন্সি ক্রমশই বাড়ছে। মন্দির তো এখনও জাতীয়করণ করা হয়নি যে কর্মীরা হেলতে দুলতে আসবেন, গল্প করবেন, খবরের

কাগজ পড়বেন, খেলা নিয়ে তক্কো করবেন আর কাস্টমার কাউণ্টারে বাঁকা শ্যাম হয়ে ভুরু কোঁচকাবেন। মন্দিরে পুজো হয় ঠেলার সিস্টেমে। উপায় কি? পপুলেশান বাড়ছে, প্রবলেম বাড়ছে, ভক্তরা কাতারে কাতারে ছুটে আসছে। কতক্ষণ তারা চাতালে গড়াগড়ি যাবে! একের পর এক সার সার দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পুজোর নৈবেদ্যর চ্যাঙারি। জবাফুলের কান লকলক করছে। তায় আবার ঝুমকো। এক পাঁজা ধূপ চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়ছে। মায়ের দরজার সামনে মানুষের পাঁচিল। হ্যাগা, মাকে যে একবার চোখের দেখা দেখবো বচ্ছরকার প্রথম দিনে! অতই সোজা? অন্যের চোখে দেখুন।

'আপনি কি মাকে দেখলেন?'

'ওই কোনও রকমে একটু।'

'কি দেখলেন?'

'কপালের ত্রিনয়ন।'

'যাক তাহলে আমারও দর্শন হল।'

দাঁড়াবার কি উপায় আছে! আমরা মানুষ না ষাঁড়। অনবরত গুঁতিয়ে চলেছে। একেবারে মাকো মাকো ব্যাপার। কে একজন জানিয়ে দিলেন, মা নয়, নজর রাখুন পকেটের দিকে। বছরের প্রথম দিনেই গড়ের মাঠ না করে দেয়।

রোদ চড়ছে। টাক ফাটছে। ফল শুকোচ্ছে। ধূপ পুড়ে ছাই হচ্ছে। গিন্নির বড় দয়ার শরীর। কত্তার টাকে পাট-করা তোয়ালে চাপিয়ে দিচ্ছেন। বেশ ফর্সা মোটাসোটা হাত। বাগবাজারের কিরিকাটা শাঁখা মা জননীর হাতে কাপ হয়ে বসে গেছে। নোয়াতে সেপটিপিন দুলছে। বৈশাখের তরুণ রোদে ফিনফিনে চামড়ার অন্তর ফুঁড়ে লালরঙের আভা গোলাপী মেরেছে।

জুতো রাখার জায়গায় তিন চার মণ জুতোর তাগাড় তৈরি হয়েছে। কোন্ বাবুর পাটি কার তলায় খুঁজে নিতে জান বেরিয়ে যাবে। বুদ্ধিমানেরা আবার কাঁধ-ব্যাগে চটি ভরে কাঁধেই ঝুলিয়ে রাখেন। অকুতোভয়ে নয়, অকুতোভয়ে 'মা মা' করেন। সার সার মিষ্টি আর ফুলের দোকানে পোঁ পোঁ মাছি উড়ছে। সাদা বাতাসার পিঠে কালো ডেওপিঁপড়ে ড্রিল চালাচ্ছে। মালিক বসে আছেন টাটে, বেলদার কর্মচারীরা চু-কিত-কিত খেলছে বাইরে। ভক্ত দেখলেই

তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে—ও দাদা, ও দিদি, ও মা, ও মাসী, ও জামাইবাবু এদিকে এদিকে। ফিরি জুতো।

দিদিমার বয়সী মহিলার হাত ধরে টানাটানি। বৃদ্ধা বলছেন, আ মোলো, দুটো পয়সার জন্যে মুখপোড়ারা করছে দেখো! রসিক ভদ্দরলোক জিজ্ঞেস করছেন, ফিরি জুতোটা কি বটে? এই পয়লা দিনেই জুতোপেটা করবে? টাটের টাট্টু আধহাত জিভ কেটে বললেন, বলেন কি স্যার! জুতো রাখার ফিরি ব্যবস্থা করেছি। বলুন মাকে কাঁসিকি চড়াবেন? পাঁচসিকে না কুড়িসিকে? জবা কি একশো আট! আরে গদা বাবুর গায়ে গঙ্গার জল ছিটো।

নাটমন্দিরে কালীকীর্তনের দল ধুম গান জুড়েছে—পাবি না ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপার মতো না ক্ষেপিলে। ওদিকে এক ক্ষেপা ঘণ্টার দড়ি ধরে প্রবল টানে দমকলের ঘণ্টি বাজাচ্ছে। ভক্তির আগুন লেগেছে। মা কি আর কালা হয়ে থাকতে পারেন?

গঙ্গা থেকে ভিজে কাপড়েই ভক্ত সোজা চলে এসেছেন মন্দির চাতালে। মা হা মা হা করে চিৎকার ছাড়ছেন। তারস্বরে মন্ত্র পড়ছেন সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে। মন্দিরে মায়ের ঘরে চারজন সেবায়েত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পুজোর কুচকাওয়াজ চলেছে। চ্যাঙারি ডানদিক দিয়ে ঢুকছে, হাতে হাতে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে মায়ের পায়ে, হাফ হয়ে ফিরে আসছে বাঁদিক ঘুরে ভক্তের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে অর্ধচন্দ্র খেয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে হুড়হুড়িয়ে নেমে আসছেন চাতালে। ব্যবসায়ীদের বগলে নতুন খেরোর খাতা বুকে মাটির গণেশ। ভুঁড়িটি ফুলিয়ে বুকপকেটের কাছে শুঁড় ঝুলিয়ে রেখেছেন। খাতার পুজোয় সারা বছরের কামাই ভালো হবারই কথা। মা জগদম্বার কাছে এসেছেন বাবা গণেশ। ঠোঁটকাটা জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ মশাই, এটা আপনার এক নম্বর খাতা না দু নম্বর? ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রাগা চলবে আজকের দিনে, খিস্তি চলবে না। আজ যা করবে সারা বছর তাই করতে হবে।

ওদিকে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে প্রেমিক হংস হংসী। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাসে ভাবের ঢেউ ছলকে উঠছে। এসব দৃশ্য আজকাল দেখেও দেখতে নেই। শুধু মনে মনে বলতে হয়—মা, আমার ঘরে প্রেমের তুফান ঢুকিও না। এ কেষ্টকলি বাইরেই দুলুক।

রাম-ভক্তরা ছড়া ছড়া কলা নিয়ে হনুমান সেবায় হামলে পড়েছেন। এক ব্যাটা বীর হনু যুবতীর কমলালেবু শাড়ি খামচে ধরেছে। বাঁশীর সুরে তিনি চিৎকার তুলেছেন, জনতা মুফত মজায় তালি বাজাচ্ছে।

চায়ের আটচালায় কেলে কড়ায় টোপর টোপর সিঙ্গাড়া বাদামী হয়ে উঠছে। আরেকটা কড়ায় জিলিপি প্যাঁচ মারছে। ফেলে দেওয়া এঁটো ভাঁড়ের গাদায় ধুমসো কুকুর মড়মড়িয়ে খাবার খুঁজছে। প্রবীণ প্রবীণাকে সোহাগ করে বলছেন, গরম জিলিপি আর দুটো নেবে নাকি? সিঙ্গাড়ার ঝালে নাকে জল এসে গেছে। মধুপর্কি রুমালে নাক মুছতে মুছতে বলছেন, নেবে নাও তবে অম্বল হবে।

ভিখিরিরা সার দিয়ে বসে আছে। নানা সুরে পয়সা সাধছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি লেগে যাচ্ছে। এক সধবা ভেঙচি কেটে এক বিধবাকে বলছে—আ মর ডাইনী মাগী! কাকে এক ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পিঠে চুনকাম করে দিয়েছে। দর্শক বলছেন—বড় শুভ লক্ষণ।

সংসারী মহিলা কাপডিশ কিনছেন ঠুকে ঠুকে, ঠিং ঠিং মিঠে আওয়াজ। শিবঠাকুরের মূর্তি কিনেছে একটি মেয়ে। শ্যামলা সধবার হাত মুচড়ে মুচড়ে কাঁচের চুড়ি পরাচ্ছে দোকানী। ঝাঁঝাঁ রোদ কাঁপছে গাছের নবঘন সবুজ পাতায়।

দু হাতে দুটো তরমুজ নিয়ে কর্তা বাড়ি ঢুকছেন। সন্ধের ঝোঁকে গোলাপজল দিয়ে সরবৎ। দোকাদের মাইকে হিন্দি গান। কানের পোকা বের করে ছেড়ে দিচ্ছে। আজ আবার হালখাতা। গয়নার দোকানের আয়নায় আলো ঝলমল। মুদীর দোকানে খাতা খুলে বসে আছে মালিক। তলায় ক্যাশবাক্স। দশ কুড়ি যা পারো জমা দাও। ছোট্ট মিষ্টির বাক্স খুলে খুনখারাপী রঙের রসকদম্ব গেলো। আমপাতা আর শোলার কদমের মালা দুলছে। চটে বরফের চাঙড়া পুরে কাঠের মুগুর দিয়ে পেটাচ্ছে। চুরচুর শব্দ। মাঠাতোলা দুধের দই। সেই দইয়ের ছ্যাড়াকাটা ঘোল। মাথায় না ঢেলে গলায় ঢালছে। আজ হালখাতা।

কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশার পাড়ায় ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবন-রসের রসিক বাঘা বাঘা সাহিত্যিক। পথ পেরোতে মুখোমুখি দেখা।

প্রশ্ন, কটা বেরলো ? কে বার করলে ? বড় পাবলিশারের ঘরে চাঁদের হাটবাজার। হাতে হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। ঠোঁটে ঠোঁটে পাইপ। প্রিয় লেখককে ছেঁকে ধরেছে ভক্ত পাঠক। সই চাই। শুভেচ্ছা চাই। আজকাল এইসব খুব হয়েছে। ঠোঙাতেই অটোগ্রাফ মারো। উড়ো উড়ো খবর আসছে, অমুক প্রকাশক আজ একটা রামকৃষ্ণ জীবনী ছেপে প্রকাশ করেছিলেন, পুলিশকে ক্রেতার ভিড় ঠেকাতে সকাল থেকে তিনবার লাঠি চালাতে হয়েছে। তমুক প্রকাশক আর একটা প্রেমের বই ছেপেছিলেন, তিন ঘণ্টায় প্রথম সংস্করণ খামচাখামচি করে নিয়ে গেছে। এইসব শুনে না-বিকনো লেখকদের মুখে কালো ছায়া নামছে। একজন মুখ ভার করে বলছেন, আর ভাই সেই কথা—ধর্ম অর্থ কাম। এপাশে ধর্ম ওপাশে কাম মাঝখানে অর্থ। বুঝলেন না, একালের এই হল স্যান্ডউইচ।

আজ আবার স্টুডিওপাড়ায় নতুন বইয়ের মহরত হল। শুক্লা প্রোডাকসানের সত্যবাদী পুলিশ। স্টোরি, দুর্ধর্ষ সেনাপতি। পরিচালক, চপলা চঞ্চলা। প্রযোজক, গজেন সাঁতরা। নায়িকা নবাগতা মিস বেঙ্গল। রানার্স আপ, ফুলকলি। স্টোরিতে আজকাল আদর্শ পুলিশ থাকলে পাবলিক খুব খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বই হিট। বক্স অফিস ভেঙ্গে টুকরো। ফ্লোরে নায়িকা প্যাঁজখোসা কাপড় পরে বক্ষ উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যাপস্টিক ঠুকছেন গজেন সাঁতরার গুরু জটাবাবা। ফটাফট ছবি তুলছেন ক্যামেরাম্যান। লেখক দুর্ধর্ষকুমার পাকা পাকা কথা বলছেন। চিত্র-সাংবাদিকের প্রশ্ন —গল্পটা মারা, না ওরিজিন্যাল ! চপলা চঞ্চলার জাত আর সেক্স কোনওটাই বোঝা যাচ্ছে না। বেশ টেনেছেন, তেমনি ঘেমেছেন, তবে অ্যাম্বিশান সাংঘাতিক। এই প্রথম বইতেই তিনি বেরিয়ে আসবেন ককটেল হয়ে। সত্যজিৎ, মৃণাল, তপন, তরুণের পাঞ্চ। বাংলা ছবির জগতের শেষ কথা।

একটু বেশি রাতে, কর্তা লেটকে পড়েছেন চৌপায়ায়। বছরের

প্রথম দিনটি খসে গেল। এইবার তার পোস্টমর্টেম। আগে ছিল পুজোয় নতুন জামাকাপড়, এখন নববর্ষেও সেই সব্বোনেশে রেওয়াজ চালু হয়েছে। কত্তা গুনগুন করছেন—হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করেছে বিপ্লবী ভ্যাদারাম। মা ষষ্ঠীর কৃপায় এ পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দেয়ালে যৌথ পরিবারের পরলোকগত আর তাঁরা ছবি হয়ে ঝুলছেন। দেবদেবী আর তাঁরা সব মিলিয়ে গোটা চব্বিশ রজনীগন্ধার মালা। বড়য়, ছোটয় মিলিয়ে গড়ে প্রতি মালা পাঁচ। মেরে দিয়ে গেছে রে বাপ!

পথে বসালেন

ওরে বাবারে, বিশ্বকাপ ক্রিকেট এসে গেছে। সারা বিশ্বে এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কি আছে! বন্যা, খরা, পতনমুখী ডলার, ধসেপড়া শেয়ারবাজার, ঊর্ধ্বমুখী পাউন্ড, বেকার সমস্যা, উধাও সরষের তেল, নিমকহারাম নুন, মহার্ঘ আলু, কোনও কিছুই কিছু নয়। ক্রিকেট!

আমার সাদাকালো টিভি মাঝরাতের এক ঘণ্টা আগে তিনবার ঝিলিক মেরে একটা চিরুনির মতো চিত্র বুকে ধারণ করে চোখ মারতে লাগল। সবাই এক বাক্যে বললেন, মায়ের ভোগে। পরের দিন মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে বদ্যি এলেন। পেছন দিকের কুঁজ খুলে, ইনটেস্টাইন পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'পিচকার টিউব খতম হো গিয়া।'

আমি সংশোধন করে দিলুম, 'পিচকার নেহি, পিকচার।'

তিনি বললেন, 'ওই হল। সারা দিন রাত যেভাবে পিচকিরির মতো প্রোগ্রাম ছিটোয়! কলকাতা হল তো দিল্লি, দিল্লি গেল তো বাঙলাদেশ। নিন অনেক টাকার ধাক্কা। কি করতে চান বলুন?'

সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিজনের উল্লাসের চিৎকার, 'বলো হ্যারি, বিদেয় করো, বিদেয় করো, লে আও কলার।'

আমাদের বাড়িতে যে মহিলা কাজ করে, সে বললে, 'ভগমান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ওই যে সুনীলবাবুর বাড়িতে করাল এনেছে, কি সুন্দর, হলদে মানুষ, সবুজ মানুষ সব নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।'

যেখানে যা ছিল সব তুলে, বউয়ের আংটি বেচে দোকানে গেলুম। হরেক রকমের যন্ত্র। 'কি নেবেন, অস্কার, নেলকো, ওয়েস্টন, বি পি এল, পি এইচ এক্স, অজন্তা, ওনিডা। ওই দেখুন সব লাইন লাগিয়ে বসে আছে।

'দাম?'

'নয়, দশ, বারো, পনের, বাইশ, চব্বিশ, খুচরোটা আর বললুম না।'

'বলতে হবে না, হার্টে যা চোট লাগার লেগে গেছে। বলুন কোনটা কেমন? টিভি কেনা নয় তো, বিয়ে করা। একবারই ঢুকবে। মরে বেরোবে।'

ভদ্রলোক বিভিন্ন পাত্রীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এর একটা স্পিকার। ওর দুটো, ওর চারটে। চতুর্মুখ, চারদিকে শব্দ ছড়াবে। বাথরুমে বসেও চিত্রহার শুনতে শুনতে তালে তালে....।'

'সমঝ গিয়া, সমঝ গিয়া।'

'এর মেটাল বডি, ওর মোল্ডেড বডি। শব্দ ভরাট। এটার চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট টিউব, ওর কালো টিউব। এটার সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল, খাটে বসে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এর রিমোট কন্ট্রোলের এত শক্তি যে, পাশের বাড়ি থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার ভেতর মেমারি ফিট করা। হাত-পা লাগানো, নিজে নিজেই চ্যানেল, রঙ সব খুঁজে নেবে।'

'মানুষের মতো ?'

'মানুষের বাবা।'

'তা ঠিক। পরিবারে টিভিই তো সব। বাপ মা ভেসে গেছে।'

'হ্যাঁ, এটার স্ক্রিনে চ্যানেল, কালার প্যাটার্ন নাচানাচি করে।'

ওরই মধ্যে একটিকে তুলে নিয়ে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে নাচানে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীরা এসে বলতে লাগলেন, এ কি করলে, এটা আনলে কেন ? ওটা আনা উচিত ছিল, যার বিজ্ঞাপনে কাঁচ ফেটে একটা গিরগিটি মানুষ বেরিয়ে আসে।

তিন রাত ঘুম হল না। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, মনোবেদনা, হতাশা, আফসোস। ফুলশয্যা হয়ে গেছে, আর উপায় নেই। ফেরত দেওয়া যাবে না। ছটা বেড়ালের সবচেয়ে ডাকাবুকোটা একদিন সাহস করে শ্রীদেবীর মুখে আচমকা থাবা মেরে অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ক্রিনে ছোট্ট একটা আঁচড় ফেলে দিয়েছে।

হুকুম হল, কালার টিভি তো রঙচটা ঘরে থাকতে পারে না। সেই একবার বিয়ের সময় জানলা-দরজা, দেয়ালে রঙ পড়েছিল। শেষ কো-অপারেটিভে যে কটা টাকা পড়েছিল, তুলে এনে দেয়ালে অফ হোয়াইট ইমালশান চাপালুম। ওদিকে শ্রীযুত ডালমিয়া ইডেনের চেহারা ফেরাচ্ছেন, এদিকে আমি আমার ঘরের।

বায়না হল, 'তিনটে গার্ডেন চেয়ার আনতে হবে। একটায় তুমি, একটায় তোমার বাবা, একটায় আমার বাবা। বেশ হাত-পা খেলিয়ে বসবে। এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার নয় তো ! সকাল পৌনে নটা থেকে বেলা সাড়ে চারটে। আর জানালায় একটু ভাল জাতের পর্দা।'

যা কণ্টেসৃষ্টে জমেছিল, সব শেষ করে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিপর্ব ঢুকল। একটু গাঁইগুঁই করে বলতে গিয়েছিলুম, মেয়ের বিয়ে, ছেলের এডুকেশন। এক দাবড়ানি, 'মেয়ের বিয়ে তোমাকে দিতে হবে না। প্রেমে হবে, প্রেম। ছেলের এডুকেশান ছেলে নিজেই করে নেবে।' সেই প্রথম শুনলুম, চেষ্টায় কিছু হয় না, সবই মানুষের ভাগ্য।

দেখতে দেখতে নিম্নচাপের ঝোড়ো বাতাসের মতো ক্রিকেট-ফিভার, ক্রিকেট-স্টর্ম এসে গেল। পটাপট বই বেরোতে লাগল। খবরের কাগজের ভেতর কাগজ ঢুকল। জ্ঞান বাড়তে লাগল হুহু করে। কাগজ আর ম্যাগাজিনে ছাপা খেলোয়াড়দের ফুলসাইজ প্রিণ্ট এ-দেয়ালে সে-দেয়ালে সাঁটা হয়ে গেল। এ-দেয়ালে হিরো গাওস্কর, ও-দেয়ালে হিরো ইমরান। পাশের দেয়ালে কপিল হাঁ। পেছনের দেয়ালে ভিভ রিচার্ডস আকাশ দেখছেন। মা দুর্গা, মা কালী, নারায়ণ সব ভেসে গেল। মেয়েরা দেখি সময় পেলেই ইমরানের ছবির দিকে গদগদ দৃষ্টি। ইমরানের মতো রমণীমোহন আর নাকি দ্বিতীয় নেই। জ্যোতিষীরা খেলোয়াড়দের কোষ্ঠী নিয়ে বিচারে বসে গেলেন। গাওস্কর বিদায় নেবেন। ইমরানও ব্যাট ছেড়ে দেবেন। দুই উপমহাদেশেই ক্রিকেট-প্রেমীরা হায় হায় করছেন। রেশনেব দোকানে রেপসিডের খোঁজে গেলুম, মালিক তেল ভুলে গাওস্করকে নিয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, 'গাওস্কর নাকি ব্যাঙাচির সঙ্গে কথা বলেন না?'

'ব্যাঙাচি? সে আবার কে?'

পরে বুঝলুম বেঙ্গসরকারের কথা বলছেন। ডাক্তারবাবু ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে প্রেসার তোলেন আর বলেন, 'ইণ্ডিয়া পারবে?' প্রেসার ছেড়ে দিয়ে 'আবার তোলেন, আবার প্রশ্ন করেন, 'ইংলণ্ড শুনলম ফুল স্ট্রেংথে আসছে না!' এদিকে রক্ত আটকানো হাত টনটনিয়ে আঙুলে প্যারালিসিস হয়ে যাবার দাখিল। আধঘণ্টার ফ্যাঁসফোঁসের পর জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রেসার কত দেখলেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'প্রেসার তো দেবেই। পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে! এবারের ওয়ার্লড কাপ ওরাই না নিয়ে যায়।'

'আমি আমার প্রেসারের কথা বলছি। পাকিস্তানের প্রেসার নয়।'

'আপনার আবার প্রেসার কি? অ আপনার প্রেসার দেখছিলুম, না? দাঁড়ান।'

আবার ফ্যাঁসফ্যাঁস শুরু হল।

সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে ঘাড়ের খানিকটা কপচে গেল। যিনি চুল কাটছিলেন, ভারতের জয়পরাজয় নিয়ে এত ভেবে পড়লেন যে আমার ঘাড়ে ক্ষুরের এক কোপ বসিয়ে দিলেন না, সেইটাই আমার মহাভাগ্য।

গঙ্গায় স্নান করতে করতে এক বৃদ্ধা বললেন, 'দেশে আবার সত্য যুগ ফিরে এল।'

'কেন ঠাকুমা ?'

'ওদিকে টেলিভিসানে রামায়ণ শুরু হয়ে গেছে। সুগ্রীব আর বালির ন্যাজ দেখেছ ? অত লড়াই করলে, তাও ধনুকের মতো ওপর-দিকে খাড়া হয়েই রইল ! খুলে পড়ল না। আর এদিকে কলকাতায় ভীষ্মের নামে কাপ হচ্ছে ভীষ্মকাপ।'

পাড়ার ছেলেরা এসে বললে, 'দাদা, কিছু চাঁদা ছাড়ুন দেশের স্বার্থে।'

'তার মানে ?'

'ক্রিকেট স্বস্ত্যয়ন যজ্ঞ করব আমরা। উদ্দেশ্যটা, গাওস্করকে কিছুক্ষণ পিচে আটকে রাখা দৈববলে। গুরু আমাদের খেলে ভাল, হেভি রেকর্ড ; কিন্তু ওই এক দোষ, হয় শূন্য করবে না হয় সেঞ্চুরি। গোটাকতক ক্যাচ ফসকে দিতে পারলেই মার হাব্বা। সেই যে সেঁটে যাবে, চার আর ছয়ের ফুলঝুরি। আর আমাদের গণেশ আর কার্তিক !'

'সেটা কী ?'

'অ জানেন না বুঝি ! গণেশ হলেন কপিলদেব আর শাস্ত্রী হলেন কার্তিক। গণেশের সব ভাল, প্রোবলেম হল, চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই !'

'তার মানে ?'

'মানে ওস্তাদ মাঝে মাঝে ভুলে যায়, এলোপাথাড়ি এমন ব্যাট চালায়, যেন ঝোপে কাটারি চালাচ্ছে ! লাগে তুক, না লাগে তাক। ব্যাটে বলে হল তো ছয়, নয়তো মিডেল ইস্ট্যাম্প উড়ে গেল। আমরা যজ্ঞ করে একটা আকন্দের মূল মাদুলিতে ভরে কপিলদেবের কাছে পাঠিয়ে দোব।'

'আকন্দের মূল কেন ?'

'আকন্দের আঠা পিচে একবারে সেঁটে যাবে। বল একেবারে লাল পান্তুয়ার মতো টপাটপ স্টেডিয়ামে গিয়ে পড়বে। ছয় কেবল ছয়। সব নয়ছয় করে দিয়ে কাপ ঘাড়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসবে। শ্যাম্পেনের ফোয়াররা।'

'তা কত দিতে হবে ?'

'বেশি চাপ দোবো না। একটা হাফ পাত্তি ছেড়ে দিন।'

পঞ্চাশ টাকা পকেটে পুরে দেশহিতৈষীরা হাওয়া হলেন।

কাগজে খবর বেরলো ওয়ার্লড কাপের খেলা দূরদর্শন নাকি দেখাবে না। ভারত সরকার, পাক সরকার, দূরদর্শন কর্তৃপক্ষে জট পাকিয়ে গেছে। মহা কেলেঙ্কারি! আমার আয়োজন ভেস্তে গেল বুঝি! পর্দা, রঙিন টিভি, গোল বাগানচেয়ার। কর্তাব্যক্তিরা কয়েকদিন মাছ খেলানোর মতো আমাদের খেলিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন, খেলা দেখানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে সত্যনারায়ণ লেগে গেল। পাঁচসের দুধের সিন্নি। লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে বাতাসা এসে গেল। লণ্ড্রি থেকে কাপড়জামা ডেলিভারি নেওয়া হল না পয়সার অভাবে।

অফিসে একটু অস্বস্তি। ছুটি কিভাবে মিলবে ? আমি তো আর মন্ত্রী নই যে টেবিলে টিভি ফেলে দেশসেবা আর ক্রিকেটসেবা একই সঙ্গে চালাবো! রথ দেখা কলা বেচার মতো! অফিস স্কুল নয় যে বগলে রসুন চেপে জ্বর নিয়ে আসব! অথচ ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম খেলাটা দেখা দরকার। ইণ্ডিয়া কি ফর্মে ফিল্ডে আসছে জানা চাই! অফিসের কেউই তেমন ঝেড়ে কাশছে না। সকলেই সকলের দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছে। পুরো ডিপার্টমেণ্ট তো আর খালি করে খেলা দেখা যায় না! একজন বললেন, 'কেন যায় না, ক্রিকেট আগে, না অফিস আগে ?' আমাদের আবার কাগজের অফিস। 'সবাই ছুটি নিলে কাগজ বেরোবে কি করে ?' সহকর্মী চুপসে গেলেন। টেবিলে আঙুল ঠুকতে থাকলেন, তাল দেখে মনে হল, মনে মনে গাইছেন, স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়। অফিসে অনেকেই চেয়ারে বসে অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার এসে বলেন, মাইলড্ স্ট্রোক। এক মাস বেড রেস্ট। সন্দেহ-বাদীরা বলেন, স্ট্রোক নয়, আপওয়ার্ড প্রেসার অফ উইণ্ড। আহা,

সেইরকমই একটা হোক না আমার। পুরো পৃথিবী থেকে বিদায় নয়, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!

আমার এখন উইন্ড চাই। মাদ্রাজী দোকানে গিয়ে দুটো বোম্বাই পোট্যাটো চপ খুব খানিকটা চাটনি দিয়ে খেয়ে এলুম। চড়িয়ে দিলুম দু গেলাস জল। অপেক্ষা করে করে বিকেল গড়িয়ে গেল। কোথায় কি? পেটটা কিছুক্ষণ বেগুনের মতো ফুলে রইল। সাতটার সময় সব তলিয়ে গেল। মধ্যবিত্তের হার্ট আর লিভার দুটোই বিলিতি মাল, সহজে টসকায় না। ধরলে বাতে ধরবে, না হয় ক্যানসার!

যা থাকে বরাতে। প্রথম দিনের খেলাটা মেরে দিলুম। কালার টিভির উদ্বোধন হল বলা চলে। ঘর একেবারে ভরে গেছে। যে জীবনে ক্রিকেট ব্যাট চোখে দেখেনি সেও এসে বসেছে। এক ভীষণ ভক্ত, তিনি মনে মনে জপ করে চলেছেন। আমার হাতে রিমোট কন্ট্রোল। দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি বসেছেন। আমার এক প্রতিবেশী, তিনি পুরোহিত, সামনের সারিতে বসেছেন। আদুর গা। পরনে ধুতি। পইতেতে বাঁধা চাবি। চেয়ারের পাশে দুলছে। একটা বাচ্চা বেড়াল থাবা মেরে মেরে সেটাকে শিকার ভেবে কাবু করার চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধরা থেকে থেকে বলছেন, 'একটু অ্যাডজাস্ট করো, একটু অ্যাডজাস্ট করো। খুব ব্রাইট হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার রিমোট কন্ট্রোল সক্রিয়। গাওস্কর বেশ ভালই পেটাচ্ছেন, তবে শান্তিতে বসার উপায় নেই। অনবরতই সদরে কড়া নড়ে উঠছে। অফিসে না গেলেই বোঝা যায়, সারাদিনে একটা পরিবারে কত ধান্দায় কত লোক আসে। ধূপ নেবেন, বলে এক মহিলা এলেন। স্বামীর কারখানা সাত বছর বন্ধ। ধূপই এখন বাঁচার পথ। সে যেতে না যেতেই এসে গেল বিহারী ফলঅলা। পাওনাদার। মা ধারে আপেল আর সিঙ্গাপুরী কলা খেয়েছেন। সে যেতে না যেতেই এসে গেল, ঝ্যাঁটার কাঠি নেবে—ঝ্যাঁটার কাঠি। তাকে পত্রপাঠ বিদায় করতে না করতেই এসে হাজির হাওড়ার এক আশ্রমের প্রতিনিধি, 'মা আমাদের প্রতি মাসেই কিছু সাহায্য করেন।' তাঁর ব্যবস্থা করে চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই আবার কড়া। এবার যেন ডাকাত পড়েছে। আমার গুরুজনেরা বললেন, 'কেন ব্যর্থ চেষ্টা করছ? তোমার বসার উপায় রাখেননি ভগবান। বহু রকমের অশান্তি তৈরি করে রেখেছে। তুমি

বরং চেয়ারটা তুলে নিয়ে গিয়ে দেউড়িতেই বোসো। আমাদের একটু শান্তিতে বসতে দাও।'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই দশাসই এক মহিলা। আমার পরিচিতা। একটু বেশি উচ্ছল। ইনস্টলমেন্টে শাড়ি বিক্রি করেন। মাঝে মধ্যে আমিও একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি। আমাকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে চলে এলেন। আজ আবার একটু বেশি সাজের ঘটা। ভদ্রমহিলার সব কিছুই একটু উঁচু-উঁচু। গলা উঁচু, চলার ধরনও উঁচু, শরীরও উঁচু। ঢুকেই বললেন, 'অব্বাবা, কাজ নেই কম্ম নেই, একঘর লোক বসে বসে ক্রিকেট দেখা হচ্ছে আর গেল গেল চিৎকার!' কথা শেষ করেই হাঁক পাড়লেন, 'বউদি কই গো, কোথায় গেলে?'

বন্ধুরা সবাই চোখ ফেরালেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হু ইজ শি?' আর সেই মুহূর্তে কপিল ক্যাচ তুলে বীরের মতো প্যাভেলি-য়ানমুখো হলেন। সবাই বলে উঠলেন, 'হোপলেস! হোপলেস! এই কি একটা ক্যাপটেনের খেলা? মাত্র ছ'রানে আউট?'

এক কপিল-সমর্থক প্রতিবাদ করলেন, 'ক্যাপ্টেন হলেই কি সেঞ্চুরি করতে হবে? ক্যাপ্টেনদের মাথায় সবসময় কত দুর্ভাবনা চেপে থাকে জানেন আপনি? এই যে ছয় করেছে, এই আমাদের বাপের ভাগ্যি! লেন হাটন কবার লেমডাক হয়েছেন, জানেন? জানেন ব্র্যাডম্যান কবার হেঁচকি তুলেছিলেন? ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট! কভী আঁধেরা, কভী উজালা।'

হঠাৎ একজন, পুরোহিতমশাইকে লক্ষ্য করে, ফিসফিস করে উঠলেন, 'মহা অপয়া। উনি থাকলে আমাদের হেরে মরতে হবে। মনে আছে, এ বছর তিনেক পল্লীর পুজামণ্ডপে আগুন ধরে গিয়েছিল? আরে উনিই তো ছিলেন পুজারী!'

সঙ্গে সঙ্গে একজন উঠে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুরমশাই, এবার তো আপনার পুজোয় বসার সময় হল!'

'পুজো? আজ আবার কিসের পুজো? আজ আমার বদলি ঠিক করে এসেছি। আমি সেই লাঞ্চের সময় বাড়ি গিয়ে ঝট করে লাঞ্চ সেরে আসব। আমি আসন করে বসেছি, ডোণ্ট ডিস্টার্ব। সেই থেকে ননস্টপ বগলাস্তোত্র আওড়ে চলেছি। তাই তো অতি কষ্টে

কপিলের কাছ থেকে ছয় আদায় করতে পেরেছি, নয় তো শূন্যতেই বাবাজীবনকে ফিরতে হত !'

'ঠাকুমশাই, লাঞ্চের সময় তো পেরিয়ে গেছে। বলুন ডিনার।'

'ওই হল, আমি এখন কুম্ভক করে কালকে স্তব্ধ করে রেখেছি।'

বৃদ্ধদের একজন কাছে ডেকে বললেন, 'ওই যে ওই !'

'কে ওই ?' পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ফিসফিস।

'ওই যে, যিনি ঢুকলেন, আধুনিকা, মন্দাক্রান্তা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ?'

'হাটাও, আউট করে দাও। শরীর-লক্ষণ বলছে অশুভ শক্তি। প্রবেশ মাত্রেই কপিল কাত।'

আমি তো তাই চাই। তিনশো টাকার মামলা, আপাতত মুলতুবি করে দিতে পারলে মন্দ কি! আমার তো বলা শোভা পায় না। এক তরুণ ছোকরাকে তাতিয়ে দিলুম। সে গিয়ে ওই ইনস্টলমেণ্টওয়ালীকে আউট করে দিয়ে এল।

কালকে আর কতক্ষণ স্তব্ধ করে রাখবেন, ওভারের পর ওভার এগিয়েই চলল। ভারত মাত্র একটা রানের জন্যে কুপোকাত হয়ে গেল। সবাই যেতে যেতে মন্তব্য করে গেলেন, টিভিটা অপয়া, এর আগের ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সাংবাদিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে লিখলেন, হাউ নট টু উইন। পাকিস্তানের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। শেষ ওভারের শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জেতার স্নায়ু তাঁদেরই আছে। অস্ট্রেলিয়া একটা টিম! তাঁরা তো 'আণ্ডারডগ'। আমাদের হকি তো গেছেই। ক্রিকেটটাও গেল। একটা মেয়ে অলিম্পিকে দৌড়বে বলেছিল, পি টি ঊষা। তার আবার পায়ের শির টেনে ধরেছে। ভারতীয় ক্রিকেটবীরেরা এখন বিজ্ঞাপনে দাড়ি কামাবেন, ফলের রস খাবেন, সুদৃশ্য জামা পরে চলমান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবেন।

কপিলদেবের ঠোঁটের কাছে মাইক্রোফোন ধরে প্রশ্ন করা হল, 'জেতার ম্যাচটা হারলেন কি করে ?'

'ডাঁট মেরে।' তা অবশ্য বলেন নি, বললেন, 'দিস ইজ অল ইন এ ক্রিকেট। একেই বলে ক্রিকেট। এই তো জীবন। যেদিকে তাকাই, বেয়ারা হুইস্কি লে আও।'

বিনিকে জিজ্ঞেস করা হল, 'শূন্য রানে আউট হলেন মশাই! এক-সময় কি সুন্দর খেলতেন!'

'সো হোয়াট? প্রেমে, রাজনীতিতে আর ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু নেই! কপিদা কি করলেন?'

পরের দিন অফিসে গিয়ে উদ্বিগ্নমুখে একটা ছুটির দরখাস্ত ঠুকে দিলুম, স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। এখন-তখন অবস্থা। আরও চারটে দরখাস্ত পড়ল। ছুটি নেবার ওই একই কারণ, স্ত্রী অসুস্থ। ছুটির দপ্তরের বড়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বিশ্বকাপ কি রকম ভাইরাস দেখেছেন, ঘরে ঘরে স্ত্রীরা পটাপট অসুস্থ হয়ে পড়ছেন! আপনার ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী। সকালে তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন টেলিফোন করতে। হাসলেন, বসলেন, চা খেলেন, তখন কি জানতুম ভদ্রমহিলা অসুখে মরো-মরো!'

ওদিকে পাকিস্তানের বিজয়রথ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল। শ্রীলঙ্কা কাত। ইংল্যান্ড ফ্ল্যাট। ভারতকে লাহোরে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে হবে। কি হবে ভাই, বলে কলেজের মেয়েরা একে অন্যের ঘাড়ে গড়িয়ে পড়লেন। শরীরের ওজন কমছে, কি ব্লাডপ্রেসার কমছে বলে মানুষ যত না ভেবে পড়ল, রানরেট কমছে বলে তার চেয়ে বেশি ভাবনা। বাজারে সাতসকালে দুজনে দেখা। প্রশ্ন, 'এখন কত যাচ্ছে?'

উত্তর, 'পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

'ধ্যার মশাই, তেলের দাম কে জিজ্ঞেস করছে? তেলের রেট নয়, রানরেট কত যাচ্ছে?'

'পড়েছেন, আপনাদের কপিল গাওস্করকে কিরকম ঝেড়েছে!'

'ঝেড়েছে নাকি? বেশ করেছে। না ব্যাটে, না বলে!'

'আপনি গাওস্করের কি বোঝেন?'

'আপনি কপিলের কি বোঝেন? এ আপনার গঙ্গাসাগরের কপিল নয়, হরিয়ানার টাইগার।'

'বোম্বে ভার্সাস পাঞ্জাব হচ্ছে।'

'সে খেলা আবার কবে?'

'কবে আবার কী, ভারতের ক্রিকেটের আসল খেলাটাই তো বোম্বে আর পাঞ্জাবে। দেখা যাক সিদ্ধার্থ রায় কি করেন!'

'শুনেছি ভাল ব্যাটসম্যান। পশ্চিমবাংলায় যখন চিফ মিনিস্টার ছিলেন, চকলেট রঙের গেঞ্জি পরে প্রায়ই মাঠে নেমে পড়তেন।'

'উনি তো এখন খালিস্তানীদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছেন, সে তো দীর্ঘ ইনিংস!'

'কি থেকে কি হয় কেউ কি বলতে পারে?'

'বাট গাওস্কর ইজ গাওস্কর। গাওস্কর মানেই রেকর্ড। কপিলের কি রেকর্ড আছে মশাই!'

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গাওস্কর রেকর্ড করলেন। গোটা ম্যাচটাই রেকর্ড। পরপর তিনটে উইকেট নিয়ে বোলারের হ্যাটট্রিক। সারাটা জীবনের মতো তাঁর হয়ে গেল। ওই রেকর্ড ভাঙাও আর খাও। ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে কাতারে কাতারে গাওস্কর। কার্ডবোর্ড দিয়ে বাঁধালে পঁচাত্তর, প্লেন পঞ্চাশ।

'লক্ষ্মী বাইণ্ডারে'র মালিক বললেন, 'তোমার বাবার ছবিটা বাঁধাই হয়ে আজ এক বছরের ওপর পড়ে আছে; সেটা আগে ডেলিভারি নাও, তারপর না হয়….।'

'হেল উইথ ইওর ফাদার! এটাকে আগে চড়িয়ে দিন। ফাইনালের পর মালাটা আমি কোথায় চড়াবো?'

আমার সহকর্মী, ক্রিকেট-পাগল তানাজীর থেকে থেকে ভাবসমাধি হতে লাগল। ঘোর-লাগা মানুষের মতো একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। সমবায়িকায় রেপসিড অয়েলের লাইনে দাঁড়িয়ে একবার সামনের ভদ্রলোককে বলে, 'গাওস্কর কি করলে দেখেছেন?' একবার পেছনের সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে বলে, 'এর নাম গাওস্কর। রেকর্ড। সারা জীবনটাই রেকর্ডের মালা। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিন হাজার রানের রেকর্ড।' চোখের দিকে তাকালে ভয় করে। ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে। কাজ করবে কি, চেয়ারে চেপে বসানোই যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হাজারখানেক টাকার ক্রিকেটের বই কিনেছে। মুড়ি কিনে এনেছিল। ঠোঙায় গাওস্করের ছবি দেখে মুড়ি খাওয়া মাথায় উঠল। সব ফেলে ঠোঙা খুলে ইস্তিরি করতে বসে গেল। দু'দিকে দুটো রেডিও ফিট করে রিলে শোনে। কোনও কমেণ্টস যেন মিস না করে। তানাজীর পাশে বসেন সিনিয়ার জ্যোতিষদা। তিনি আবার রিলে শুনতে শুনতে কাগজে নোট করেন। রানের সংখ্যা,

বলের সংখ্যা, অ্যাভারেজ, আস্কিং রেট। গণিতে পাকা। তাই কোনও কাঁচা কাজ নেই। একদিকে গড়গড় করে প্রুফ দেখছেন, অন্যদিকে খেলার গতি অনুসরণ করছেন।

সারা ভারত জেনে গেল, ভারত আবার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে। কারুর ক্ষমতা নেই ভারতকে ঠেকায়। ব্যাটে মার আছে। শুধু চার আর ছয়। শরীরে কুলোলে মাঝে মধ্যে খুচরো এক কি দুই। ভারতের ভল্লেবাজরা এবারের ওয়ার্ল্ড কাপে আটাশটা ছয় মেরেছেন। যেখানে ইংল্যান্ডের ব্যাটধারীরা মেরেছেন মাত্র আটটা। ভারতীয় বোলারদের হাতে বল ঘোরে! বল ছোটে। পৃথিবীর সেরা টিম। আর কি, কাপ আমাদের! পাকিস্তান বিদায় নিয়েছে।

টাকে চুল গজাবার মতো, কলকাতার ব্রহ্মতালুর খানিকটা অংশকে খুবসুরত করার খেলা চলেছে। ফুটপাথে রঙ চড়ছে। এক জায়গায় খানিকটা অশ্বকৃত্য পড়েছিল, সেটাও রঙ হয়ে গেল। আবর্জনা, তার ওপর দিয়েই বুরুশ চলে গেল। সরাবার কি সারাবার আর সময় নেই। এখানে ওখানে তোরণ খাড়া হল। আগেকার বাবুদের যেমন ধুতি আর পাঞ্জাবির সাদা রঙ মিলত না, অনেকটা সেইরকম। ধুতি লালচে জামা দুধ-সাদা। কলকাতার ভূষণ অনেকটা সেই ধরনেরই হয়ে রইল। তা থাক। প্রচারেই আমরা তিলোত্তমা করে দোবো।

'সুপারসপার' বলে একটা সাত লাখ টাকার যন্ত্র এসেছে। নিমেষে মাঠ শুকিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে এই অস্ট্রেলিয়ান যন্ত্র। সেই যন্ত্র চেপে এক মন্ত্রী সারা মাঠে ফুরফুর করে হাওয়া খেতে খেতে ঘুরে বেড়ালেন। সাংবাদিকরা ছবি তুললেন। যন্ত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। যন্ত্র অবশ্য কথা বলল না। বললেন প্রতিনিধি। মাঠে দশ বালতি জল ঢেলে যন্ত্র চালানো হল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্ত্রি। সবাই ধন্য ধন্য করলেন। অনেকেই চাইলেন বৃষ্টি আসুক। যন্ত্রের মহিমা দেখা যাক।

প্রার্থনা শুনলেন বরুণদেব। একটা নিম্নচাপ ঠেলে দিলেন। আকাশ কালো হয়ে এল। অন্ধ্রে হাজার দশেক বাড়ি ভেঙে পড়ল। প্রাণ হারালেন কুড়িজন। কলকাতার ক্রিকেট ব্যারনরা পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে। সাত লাখ টাকা উসুলের জন্যে বৃষ্টি চাই। বৃষ্টি এদিকে দরমা চ্যাটাই আর পিচবোর্ডের তোরণের চাকচিক্য শেষ

করে দিলে। রাস্তার কাদায় পার্ক স্ট্রিটের রঙের জেল্লা ছেতরে গেল। প্রবীণা মহিলাকে কি আর অঙ্গরাগে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়!

দু লরি খাসা জঞ্জাল চলেছে আলিপুর রোডের দিকে। চালক মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছেন, 'ডালমিয়া সায়েবের বাড়ি কোনটা?'

'কোন্ ডালমিয়া?'

'ওই যে ক্রিকেট-মিয়া।'

'তিনি তো গোয়েঙ্কা!'

'ওই হল। দু লরি মাল ডেলিভারি দিতে হবে।'

'জঞ্জাল ডেলিভারি!'

'কেন?'

'এটা আমাদের পৌর-আন্দোলন। হয় টিকিট দাও, না হয় জঞ্জাল নাও।'

টিকিট নিয়ে খাবলাখাবলি শুরু হয়ে গেল। কিছু টিকিট চলে গেল অন্তরালে, চোরাপথে পরে বেরবে বলে। ক্রিকেট তো শুধু খেলা নয়, বড় ব্যবসা। বিগ বিজনেস। ধর্মের সঙ্গে মিল আছে। ক্রিকেট। ধর্ম। গুরুরা আসছেন ভায়া বোম্বে।

সেমি ফাইনাল। ভারত বনাম ইংল্যান্ড। কত রানে যে হারবে ইংল্যান্ড! ভারত যেরকম টপ ফর্মে রয়েছে! মেরে আর ফেলে ফাটিয়ে দেবে। গাওস্কর তো কেবল ছয় মারবেন। ছয়ের মাঝে হাইফেনের মতো গোটাকতক চার। শর্ট রান নেবার আর দরকার কি!

প্রতিবেশীর বাড়িতে মাইফেলের মতো ক্রিকেট দেখার আসর বসেছে। ওই বাড়িতে আর এক গাওস্করের কুঁড়ি ধরেছে। বয়সে তরুণ, কেতায় তরুণের বাবা। সে এখন ড্রেস প্র্যাকটিস করছে। পাড়ার মাঠে খেলতে যাবার আগে তার ড্রেসের কি ঘটা! যেন লেন হাটন নেট-প্র্যাকটিসে চলেছে। ধবধবে সাদা জামাপ্যান্ট। পায়ে লেগ-গার্ড। ক্রিকেট হেলমেট নেই, বদলে স্কুটার হেলমেট। ব্যাটটা যে কায়দায় দোলায়, সারা জীবনে কত সেঞ্চুরি যে করবে! রাতে ছাদে আলো জেবলে, দুটো বাঁশের সঙ্গে বাঁধা আর একটা বাঁশে বল ঝুলিয়ে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত শ্যাডো-প্র্যাকটিস করে। পয়সাঅলা ঘরের ছেলে। অনেক চামচা জুটেছে। দোতলার ঘরে টিভি। তার সামনে জনাচোদ্দ ছেলে। হো হো চিৎকার। কান পাতাই দায়। সে

আজ দশ কেজি বুড়িমার চকোলেট বোমা কিনে আসর সাজিয়েছে। ইংল্যান্ডের এক-একজন আউট হচ্ছেন আর দোতলা থেকে আশপাশের বাড়িতে বিকট শব্দে বোমা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সঙ্গে ডাকাতে চিৎকার। সেই চিৎকার মনে হয় বোম্বের মাঠের খেলোয়াড়রাও শুনতে পাচ্ছেন ; কারণ মাঝে মাঝেই তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

ভারত মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে পর পর গোটা ছয় সাত বোমা ফাটল। ওদের নিজেদের বাড়িরই জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ে গেল। গাওস্কর পোজিশান নিলেন। অপর প্রান্তে বোলার বোলিং রান শুরু করেছেন। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। অনেকেরই ঠোঁট বিড় বিড় করছে। মনে হয় বলছেন, জয় বাবা গাওস্কর। তোমাকে নেই বিশ্বাস বাবা। নেগেটিভ, পজেটিভ দুটো রেকর্ডই তোমার হাতের মুঠোয়। চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ঘরের সবাই চিৎকার করে উঠলেন, 'পেরেছে। পেরেছে।'

বৃন্দাবনবাবুকে ডাক্তার বলেছেন, একদিনের ক্রিকেটের শেষটা আপনি দেখবেন না। আপনার হার্ট নেবে না। আমারও সেই একই অবস্থা। অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়েই থাকি। হইহই শুনলেই চোখ খুলি। বুঝতে পারি ব্যাটে-বলে হয়েছে। গাওস্করের পরের মারটা দেখার জন্যে সাহস করে চোখ খুলেই রেখেছিলুম। সেই মার যাকে বিদেশী সাংবাদিকরা বলেন, 'ফ্যান্টাসটিক', 'স্পেকটাকুলার'। গাওস্কর ব্যাট তুললেন। বল পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে স্টাম্প ছেতরে দিলে। কমেন্টেটার চিৎকার করে উঠলেন, আউট, হি ইজ ডেফিনিটলি বোল্ড আউট। বৃন্দাবনবাবুর কলেজে-পড়া মেয়ে, 'ও গাভাস্কর', বলে গোল গার্ডেন চেয়ার থেকে উল্টে মেঝেতে পড়ে গেল।

কে একজন বললেন, 'যাঃ, বাপের বদলে মেয়ের স্ট্রোক হয়ে গেল ! সানস্ট্রোক হার্ট স্ট্রোক নয় ক্রিকেট স্টোক !'

তাকে ধরাধরি করে তুলে বিছানায় শোয়ানো হল।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'বাপের রক্তেও ক্রিকেট, মেয়ের রক্তেও ক্রিকেট।'

বৃন্দাবনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে দেখাতে লাগলেন, গাওস্করের বলটা কি ভাবে খেলা উচিত ছিল, 'এই পা দুটো সামনে জোড়া করা, তার সামনে ব্যাট ফ্যাট। তারপর টুক করে ঠুক।'

স্ক্রিন আটকে গেছে। সকলের চিৎকার, 'বসে পড়ুন। বসে পড়ুন।'

বাঙালির রক্তে যে কি নেই! স্লো মোশান শুরু হয়েছে। আমাদের স্লো মোশান যেমন হয়। ব্যাটসম্যান ব্যাট তুললেন। ধীরে বাঁদিকে ঘুরলেন। ক্যামেরা খেলোয়াড়ের পাছায় ফোকাস করে সেইখানেই আটকে রইল। বলের কি হল, কোথায় গেল, কে লুফল দেখবার উপায় নেই। গাওস্কর গ্লাভস খুলতে খুলতে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসছেন।

নিতুর হাহাকার, 'এ কি করলে গুরু! তোমার খেলা দেখব বলে, ছুটি পাওনা নেই, তাও ছুটি নিলুম। ছি ছি, গুরু, এ কি করলে!'

'কপিলকে লাস্ট মোমেণ্টে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল। ছোট বড় অনেক কথা তুমি বলেছিলে ক্যাপটেন, এইবার ম্যাও সামলাও।'

'কিচ্ছু ভাবনার নেই। ভারতের ক্রিকেট খেলা-নির্ভর নয় মশাই, ভাগ্য-নির্ভর। দেখবেন লাস্ট মোমেণ্টে একজন সেভিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া আমাদের কপিলভাই আছে। এসেই বেধড়ক পেটাবে বাঘের বাচ্চার মতো। রানের ভলক্যানো ছুটবে।'

কপিলভাই এলেন। মহিলারা আদর করে বললেন, 'ওই যে কপলে এসেছে। কপলে, দেখি বাছা শ'খানেক তুলে দিয়ে যাও তো। এবারে তোমার ব্যাটও গেছে, বলও গেছে।'

কপিল ক্রিজে এসে দাঁড়ালেন। হাঁ করে, ফ্যালফ্যালে, ভ্যালভ্যালে মুখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

'কি খুঁজছেন বলুন তো?'

'স্টেডিয়াম দেখছেন। দেখছেন ক'জন ফিল্মস্টার এসেছেন।'

'না না, বউকে খুঁজছেন। তাঁর ইশারাতেই তো ছয় আর চার হবে। ইনস্পিরেশান!'

প্রথম বলটা কপিল মেরেছেন। সবাই গানের সুর গেয়ে উঠলেন, 'মেরেছে। মেরেছে। পেরেছে! পেরেছে!' গাওস্কর চলে যাবার পর দর্শকরা এত হতাশ হয়েছেন, ধরেই নিয়েছেন এ'রা আসবেন আর যাবেন। কপিল আবার সেই ফ্যালফ্যালে মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। পেণ্টের কোমরে আঙুল ঢুকিয়ে টানাটানি করছেন।

'কি হয়েছে বলুন তো?'

'অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হয় নিম্নবেগ।'

'ছারপোকাও হতে পারে।'

'না, না। ভীষণ মুডি প্লেয়ার। আজ আর খেলায় তেমন মুড নেই।'

'মুড নেই! মামার বাড়ি? ভারতকে জেতাতেই হবে। কলকাতা সেজে বসে আছে, আসতেই হবে। পেটাও ভাই পেটাও। একটু হাত খোলো। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে লবে।'

কপিল হাত খুললেন। মার ছক্কা! বল আকাশে। বাউন্ডারি লাইনের কাছে নামছে। একজোড়া হাত ধরার জন্যে প্রস্তুত। সবাই মনে মনে বলছেন, মিস্, মিস্টার, মিসেস। বিলিতি থাবা। কমেন্টেটার চিৎকার করে উঠলেন 'আউট। কপিল আউট।'

কপিল ফ্যালফ্যালে মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। বৃন্দাবনবাবু হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন, তিনি উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ইনজাংশান ইনজাংশান।'

'ইনজাংশান মানে?'

'এখনও বোম্বে হাইকোর্ট খোলা আছে। সোজা গাড়ি নিয়ে চলে যাও। তিনশো তেত্রিশ ধারায় একটা স্টে-অর্ডার নিয়ে এসে খেলা বন্ধ করে দাও। আবার গোড়া থেকে শুরু করো। স্টেডিয়ামে অতগুলো লোক বসে হায় হায় করছে। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু মাথায় আসছে না? দেশে আইন-আদালত রয়েছে কিসের জন্যে? দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার—সংবিধান-বিরোধী।'

'বেআইনি তো কিছু করেনি ইংল্যান্ড।'

'করেছেন আম্পায়ার। এল বি ডব্লু মানেই জোচ্চুরি। কপিলের ক্যাচটা বাউন্ডারির বাইরে। আই অ্যাম সিওর অফ ইট। আজ আমি বোম্বেতে থাকলে খেলা বন্ধ করিয়ে দিতুম। একটা গাড়ি ওই ওয়ান-খাড়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসত। সোজা হাইকোর্ট। ম্যাচের বারোটা।'

ভেবে আর লাভ নেই। এদিকে একে একে নিবিছে দেউটি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের অন্য কোথাও বড় ধরনের কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে মনে হয়। সব এলোমেলো। একে একে আসছেন আর উইকেট

ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন। কে কত কম রানে আউট হতে পারে তারই যেন কম্পিটিশান চলেছে।

একজন করুণ সুরে বললেন, 'আর কি কোনও আশা নেই ভাই?'

'আর ব্যাটসম্যান কোথায়! সবাই তো বোলার!'

'কেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তো পেরেছিল!'

'সে ভাই পাকিস্তান। তাদের কলজের জোর আছে।'

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'টিভি বন্ধ করে দাও। এর আর কোনও আশা নেই। হকি গেল। ফুটবল গেল। ক্রিকেটটাও গেল। ফিনিশড্। এ টিম আর কোনও দিন উঠতে পারবে না।'

শেষ ওভারের শেষ বল। রিলায়েন্স কাপ থেকে ভারতের বিদায়। কপিলস ডেভিল হয়ে গেল কপিলস ইভিল। সারা পাড়ায় নেমে এল নিস্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে দুম করে একটা বোমা ফাটল কোথায়।

'কে বোম ফাটায়? চল, চল। দেশের শত্রু। মেরে ক্যালেন্ডার করে দিয়ে আসি!'

প্রবীরবাবুর ছেলে বোম ফাটিয়েছে। 'বেরিয়ে আয় শালা!'

ছেলেটি বেরিয়ে এসে বললে, 'এ বোম সে বোম নয়।'

'তার মানে?'

'এ হল কালীপুজোর বোম। মার শালাকে। মেরে চিত্রকূট করে দে।'

'ব্যাটাকে বোম মেরে শুয়োর করে দে! ইংল্যান্ডের সাপোর্টার!'

ছেলেটা হাসপাতাল চলে গেল। মোড়ে মোড়ে জটলা। এক এক জটলায় এক এক আলোচনা।

'ওই বোম্বের টিভি কোম্পানিই এর মূলে। চার মারলে পাঁচশো, ছয় মারলে হাজার।'

'আর ওই নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় গাওস্করের সেঞ্চুরি! কত পেয়েছেন জানিস, ২৫ হাজার!'

'আর লোগো কেলেঙ্কারির কথাটা বলো! ওটা চেপে গেলে চলবে কেন? লোগোর লড়াইয়ে তো দশজন খেলোয়াড় চুক্তি সই করতে চাইছিলেন না!'

'আর বিজ্ঞাপনের কথাটাও বলো। গাওস্করকে তুমি সাতটা

কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবে। কপিলদেবকে ছুঁটায়। রোজগার জানো, প্রত্যেকে দশ লাখ টাকা কামিয়েছেন!'

'ক্রিকেট আর খেলতে হবে না। বিজ্ঞাপনেই ক্রিকেট খেলতে বলো।'

একটি মেয়ে তার প্রেমিককে বলছে, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বিশু। মনে হচ্ছে জলে ডুবে আত্মহত্যা করি।'

'কোরো না মাইরি। একে আমি ভারতের শোকে মরছি, তুমি মরে গেলে ডবল শোক সহ্য করতে পারবো না। ক্রিকেট গেছে যাক, আমি তো আছি মানু। সরে এস, এই দুঃখের দিনে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাই।'

'ওসব বাহানা ছাড়। কারুর সর্বনাশ—কারুর পৌষ মাস।'

'বাচ্চা কাঁদলে ললিপপ পায়।'

'আমার ঠোঁটটাকে তোমার ললিপপ হতে দোব না গুরু।'

ডবলডেকার বাসের পেছনে হাতে লেখা বড় বড় পোস্টার পড়ে গেল। ক্রিকণ্ট্রোল বোর্ড ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। কপিল, তুমি সরে যাও। তোমাকে চাইছি না, চাইবো না। আমার পাশের প্রতিবেশী ভারত ফাইন্যালে যাবেই জেনে দু'বোতল হুইস্কি মজুত করেছিলেন, আর বউকে দিয়ে দু'কেজি মাংস রাঁধিয়ে ছিলেন। মাংস গেল রাস্তায়। হুইস্কি চলে গেল পেটে। সারারাত ভদ্রলোকের আর্তনাদ, 'হায় হায়! ওই অপয়াটার জন্যে আমার সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল রে।' ডুকরে ডুকরে কান্না।

'কে অপয়া?'

'আমি গো, আমি। টিভির সামনে থেকে উঠে গেলেই ছয়। এসে বসলেই আউট। বন্ধুগণ, ও বন্ধুগণ, আমাকে জুতিয়ে লাশ করে দাও!'

শেষ গান ধরলেন, 'কি যে করি! উরে বাবারে, কি যে করি! উরে বাবারে!

সারারাত মাংস নিয়ে গোটাচারেক কুকুরের চুলোচুলি। বাপের জন্মে ওরকম মাংস খায়নি।

কাতারে কাতারে লোক ছুটছে ইডেনের দিকে। ক্ল্যাব হাউসের সামনে পা ফেলার জায়গা নেই। কাল ফাইন্যাল। এক প্রবীণ বলছেন, 'জিনিসটা করেছে ভাল। তবে কি জানেন, একেই বলে নেপোয় মারে

দই। কার আশায় আসর সাজানো হল, আর আসছে কারা! বেত দিয়ে গেট করেছে, দেখেছেন? একে বলে শিল্প!'

গাড়ি করে একজন ফিল্মস্টার চলেছেন। সমঝদারের চোখ। সবাই শোক ভুলে হইহই করে উঠলেন। পুলিসের ঘোড়া ছুটে এল। লম্বা-চওড়া বিখ্যাত এক লেখক ঢোলা পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে এগিয়ে আসছেন। আলোকিত ইডেন দেখতে এসেছেন। ফ্যানরা ঠিক ধরে ফেলেছে। বাসের টিকিটের পেছনে অটোগ্রাফ দেবার অনুরোধ। ফাইবার গ্লাসের স্বচ্ছ চাঁদোয়া দেখে এক মহিলার কি উল্লাস! টিভি সম্প্রসারণের ঘেরাটোপের বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষের উঁকি-ঝুঁকি। অনেকেই কলকাতার অভ্যাসবশে চারপাশে ঘুরঘুর করছে, যদি একটু করা যায়! তক্কে তক্কে আছেন। চক্ষুলজ্জা বাধা দিচ্ছে।

সূর্য পশ্চিমে তলিয়ে গেল। সুনীল আকাশ। আবহাওয়া ফিরল, ভারতের ভাগ্য ফিরল না। টিকিটের ভাগা দিয়ে সবুজ মাঠে সার সার বসে গেছেন লোভীরা। বাণিজ্য করার আশায় টিকিট ধরেছিলেন সব। এখন ভরাডুবি। ভারত নেই। টিকিটের চাহিদাও নেই। পাবলিক এক-একজনের কাছে যাচ্ছেন, আর উঁকি মেরে বলছেন, 'দেখি এই দোকানে কি পাওয়া যাচ্ছে!' বিক্রেতা ক্লান্ত শুকনো মুখে তাকাচ্ছেন। সামনে ইট-চাপা দশখানা চারশো টাকা দামের টিকিট। চারশো একশোয় নেমেছে, তবু ক্রেতা নেই। নির্জন জায়গায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। চোখে পুরু লেনসের চশমা। হাতে ধরে আছেন একটি মাত্র টিকিট। সকাল থেকে খাড়া। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। চুলে ধুলো। পাশে যেতেই বললেন, 'নেবেন দাদা?'

'কত দাম?'

'চারশো।'

'কমে?'

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। ছাত্র। থাকে খড়্গপুরে। নতুন সাইকেল বেচে ভারতের বিশ্বজয় দেখবে বলে টিকিট কিনেছিল। খেলা আর দেখতে চায় না। প্রয়োজনীয় সাইকেলটা ফিরে পেতে চায়। পকেটে একটা লজেন্স ছিল, এগিয়ে দিলুম, 'নাও, মুখে ফেলে দাও। একসময় আমি ক্রিকেট-ফ্যান ছিলুম, বৃহস্পতিবার থেকে ড্যাংগুলি-ফ্যান।'

পাশ দিয়ে একটি দল যেতে যেতে বললে, 'ঠিক হয়েছে। সব ব্যাটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।'

ছেলেরাও আজকাল কম যান না

শুনেছিলুম বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতেন, গালে হাল্কা করে রুজের ছোঁয়া। একটু অবাক হয়েছিলুম, কিন্তু যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, অভিনেতাদের জীবিকার খাতিরে একটু সাজতে হয় : কারণ তাঁদের জীবনের ভূমিকা-টাই হল মানুষের মনোরঞ্জন।

একটা সময় ছিল যে সময় পুরুষদের সাজগোজ করাটাকে হীনচোখে দেখা হত, পুরুষালি বোঝাতে বলা হত, 'গো অ্যাজ ইউ লাইক।' সেই যুগ আজ আর নেই। কলেজে পড়ার সময় আমার এক বন্ধু ছিলেন তিনি কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। তাঁর কাছেই আমার প্রথম শোনা, 'বিউটি স্লিপ'। 'বিউটি স্লিপ' বলে একটা জিনিস আছে, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে জানালার পর্দা টেনে ঘর আধো-অন্ধকার করে পা দুটো একটু উঁচুতে বালিশের ওপর তুলে মাথাটাকে একটু নীচের দিকে রেখে ঘণ্টা দুয়েকের একটা ঘুম। এরপর ঘুম থেকে উঠে পাজামা আর বুক-খোলা পাঞ্জাবি পরে মুখে পাউডার পাফ বুলিয়ে, বুকের কাছে একটু সেণ্ট ছুঁইয়ে তৈলহীন চুল আঁচড়াবার পর পেছনদিক থেকে হাতের ধাক্কা মেরে 'কেয়ারফুল কেয়ারলেস' হয়ে রাসবিহারীর মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। উদ্দেশ্য হল, একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোনও সুন্দরীর নজরে পড়ে যাওয়া।

প্রেমিক যদি একটু সাজগোজ করেন, আপত্তির কিছু নেই। কারণ জীবনসংগ্রামের মত প্রেমও এক সংগ্রাম। এই এলোমেলো পোশাকের দেশে কোনও পুরুষমানুষ যদি উগ্র সাজগোজ করেন, হয় আমরা তাঁকে পাগল বলব, না হয় তাঁকে আলাদা করে দূরে রাখব। আর যদি বন্ধুস্থানীয় হয়, তা হলে ঠাট্টা করব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করব। সে যুগ কিন্তু হঠাৎ পাল্টে গেল। বিদেশীদের মতো আমরাও সাজপোশাকে সচেতন হয়েছি।

হবে না-ই বা কেন? টিভির পর্দায় ঘন ঘন ভেসে ওঠে স্লো মোশানে একটি মেয়ে পরীর মতো ভাসতে ভাসতে রাজপুত্রের মতো

একটি ছেলের বুকে এসে প্রজাপতির মতো সেঁটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা—স্বপ্ন সার্থক, কাপড়-নির্মাতার কল্যাণে মানুষের এই অবস্থাই হয়। ঝরা পাতার মতো চতুর্দিক থেকে সুন্দরীরা উড়ে এসে ডোরাকাটা জামা আর পিন-স্ট্রাইপ প্যান্ট পরিহিত লালিমা পাল (পুং)-এর আষ্টেপৃষ্ঠে জোঁকের মতো আটকে যায়।

তারপর সবাই মিলে নাচতে নাচতে সমুদ্র সৈকতের উপর দিয়ে ঢেউ-এর কোলে আছড়ে পড়ে। আর সমুদ্র থেকে লাফিয়ে ওঠে একটি ভৌতিক বোতল। সেই বোতলে থাকে বুড়বুড়ি কাটা পানীয় জল। হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে আসে একটা লাল মোটরগাড়ি, সেই মোটরগাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় ড্রেসিং গাউন পরা একটি ছেলে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ড্রেসিং গাউনের একটি প্রান্ত একপাশে সরিয়ে দেখাতে থাকে তার জাঙ্গিয়া, আর তার কাঁধের পাশ থেকে উঁকি মারতে থাকে হাবুডুবু খাওয়া এক মহিলা। পরশুরাম যখন লালিমা পাল (পুং) নামটি আবিষ্কার করেছিলেন তখন সখী-সখী-ভাব ছেলেদের নিয়ে হাসির গল্প নাটক লেখা হত। বই খুললে দেখা যেত লেখা আছে বীর্যহীন পুরুষদেরই এই অবস্থা হয়—দাঁতে নখ কাটে, আড়ে আড়ে চায়, ফিক করে হাসে, রুমাল কামড়ে ধরে, কথা বলতে গিয়ে গায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে, উত্তেজিত হলে চড় মারে, খামচে দেয়। পরশুরামের কালে পুরুষের মতো পুরুষদের চওড়া দারোয়ানি গোঁফ অথবা হিটলারি বাটারফ্লাই রাখার রেওয়াজ ছিল, চুল কাটা হত খাটো করে; তখনকার কালের ছাঁটের নাম ছিল কদমছাঁট, পালোয়ানি ছাঁট, কম্যান্ডার কাট, কোকোনাট নাট, বাটিছাঁট। উত্তমকুমারের ঘাড়ে ইংরেজি ইউ অক্ষরের মতো চুলের কেয়ারি দেখে বাঙালি যুবকরা যেমনই দেখাক ঐ ছাঁটের ভক্ত হয়ে পড়লেন।

বর্তমানে চালু হয়েছে হিপিকাট। ভাল ভাল সেলুন তৈরি হয়েছে। কোনও কোনও সেলুন আবার এয়ারকণ্ডিশণ্ড। একদিন এক কেশশিল্পী আমাকে বলছিলেন একালে চুল না কাটাটাই কাটা।

একসময় বাঙালি পুরুষের বাড়ির পোশাক ছিল গামছা। পরে এল লুঙ্গি। তারপরে চালু হল পাজামা। লুঙ্গি আর পাজামা এখনও আছে। তারই নানা কেরামতি।

সেকালে লুঙ্গি হত মার্কিনের। দাম খুবই কম অথচ টেকসই। তারপরে এল দক্ষিণ ভারতীয় লুঙ্গি। পাড় বসানো। নেহাত কম দাম নয়। তারপর এল উত্তরপ্রদেশের দামী লুঙ্গি। এক-একটা লুঙ্গির দাম ধুতির চেয়ে বেশি।

পাজামা একসময় ছিল ঢোলা। তারপরে এসে গেল চুড়িদার, আলিগড়ি, প্যান্টকাট।

সবই এখন চলছে। যাঁরা খুব ফ্যাশন-সচেতন তাঁরা ড্রেসিংগাউন পরেন। কেউ ডাকলে কোমরে গাউনের দড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে দরজা খুলে দেন।

একালে শ্যাম্পু ছাড়া জীবন অচল। চুলে তেল গ্রাম্য মানুষরা দিতে পারেন, শহুরে মানুষরা চুলে তেল দেন না। একদিন অন্তর শ্যাম্পু করেন। শ্যাম্পুর আবার কত রকম—ফর ড্রাই হেয়ার, ফর অয়েলি হেয়ার, ফর নরম্যাল হেয়ার, উইথ কন্ডিশনার, উইদাউট কন্ডিশনার।

ছেলেদের সেন্ট, মেয়েদের সেন্ট। ছেলেদের সেন্টের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে, গায়ে মাখলে সেক্স-সেক্স গন্ধ বেরোবে। ঘামের গন্ধটাকেও একালের ফ্যাসানে সেন্ট বলে ধরা হয়।

পাউডার আর হেজলিনের চলন কমে আসছে, তার স্থান নিয়েছে বিউটি ক্রিম, স্কিন টনিক, স্কিন লোশান, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট। শেষোক্ত পদার্থটি মুখে মাখলে তেল-তেলে ভাব কমে যায়, মুখের চামড়া টান-টান হয়, যৌবন কিছুটা ফিরে আসে।

গায়ে সরষের তেল ঘষে মাথায় নারকোল তেল থাবড়ে স্নানের রেওয়াজ নেই বললেই চলে।

বাজারে হরেক রকমের সাবান। সাবান ছাড়া স্নান হয় না।

গামছা ব্যবহার করাটা অসভ্যতার লক্ষণ। এখন চাই তোয়ালে। বিজ্ঞাপনদাতারা তোয়ালের নানা বিজ্ঞাপন বের করেছেন। সেই বিজ্ঞাপনের তোয়ালে-সুন্দরী প্রায় অনাবৃত দেহে ঘোষণা করেন এই তোয়ালের নাম—'থারস্টি টাওয়েল' বা 'ওয়াটার-হাঙ্গরি টাওয়েল'। বর্ষাকালে গামছা ভাল হলেও ভিজে তোয়ালের একটা আলাদা অভিজ্ঞতা আছে। দিনের পর দিন ভিজে থাকার ফলে তার অবস্থা গন্ধগোকুলের মতো। গা মোছার পর গায়ে আশি টাকার বিলিতি গন্ধ স্প্রে করার

পরও ভদ্রসমাজে গেলে জনান্তিকে সকলে বলতে থাকেন, কী একটা পচেছে !

ট্রাউজার নিয়ে কম কেলেঙ্কারি ! প্রথমে ছিল ইংলিশ কাট। সামনে দুটো ফোল্ড ঢোলা-ঢোলা, তলাটা ভাঁজকরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসে গেল আমেরিকান ও ইটালিয়ান কাট। পায়ের দিকের ঘের বড় হয়ে চালু হল বেলবটম। বেলবটমের ঘেরের আবার মাপ ছিল এ দেশে। প্রস্তুতকারক জিজ্ঞেস করতেন, একটি দুধের টিন না দুটো দুধের টিন—মানে তলার ফাঁকে একটা টিন ঢুকবে, না দুটো টিন ঢুকবে ! বেলবটের সঙ্গে যা-তা জুতো পরলে চলবে না। প্ল্যাটফর্ম শু চাই। কাঠের সোল লাগানো উঁচু জুতো। পরিধানকারীর উচ্চতা ছয় ইঞ্চির মতো বেড়ে যেত। তার হাঁটা দেখে মনে হত, দূরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য কোনও মা বলছেন, 'আয় আয় খোকা আয় হাঁটি হাঁটি পা পা।' হঠাৎ এক সকালে উঠে দেখা গেল, বেলবট প্যারালাল হয়ে গেছে। যার যেখানে যত ট্রাউজার ছিল সব কাটাকাটি শুরু হল। প্যারালাল থেকে আবার হল ড্রেনপাইপ। এর মাঝে এসে গেছে ব্যাগপাইপ। ব্যাগির যুগ পড়েছে। অনেকটা জুতা হ্যায় জাপানির মতো প্যান্ট। তার সঙ্গে মানানসই জামা। মানানসই জামা মানে বুকের ছাতি ছত্রিশ হলে জামার মাপ ছেচল্লিশ। পুট নেমে কনুই-এর কাছে খেলা করবে। পকেট আর বুকে নেই। পেটে, পিঠে, হাতে, কাঁধে যে কোনও জায়গায় থাকতে পারে। একটা জামার ভেতর স্বচ্ছন্দে একটা 'পেয়ার' ঢুকে যেতে পারে। সাত-আটটা পকেট থাকার ফলে বাজারে ব্যাগ না নিয়ে গেলেও চলবে। এক পকেটে উচ্ছে, আর এক পকেটে ঢ্যাঁড়স। এক পকেটে কাঁচালঙ্কা, আর এক পকেটে আদা। বাড়িতে এসে পকেট ঝাড়লেই সংসারের হাঁড়ি চড়ে যাবে।

ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে জিন্স কালচার চালু হয়েছে। জিনের প্যান্ট, টি-শার্ট, বুকপকেটে টোব্যাকো পাউচ। হিপপকেটে মানি-ব্যাগ, গলায় ইষ্টদেবীর লকেট, মণিবন্ধে কোয়ার্জ ঘড়ি। বুকের কাছে ম্যাস্কুলাইন সেন্টের ছোঁয়া, মুখে ব্রেশট, গদার, ফেলিনি গ্রুফো। জিনের ব্যাকরণে কাচাকুচি বারণ। ইস্তিরি চলবে না। যত অপরিষ্কার ও ছোপ-ছোপ-ধরা হবে, ততই তার আভিজাত্য বাড়বে।

গরমের দেশে জিনস পরে ত্বকে চুলকানি হলেও ফ্যাশনের দাবিতে এইটুকু 'স্যাক্রিফাইস' করতেই হবে, কারণ শাস্ত্র বলছেন, 'ফ্যাশন মেকস এ ম্যান'।

সেকালে শয়নকালে মানুষের পরিধানে থাকত দু-পাট করে পরা ধুতি অথবা একটি লুঙ্গি। পরবর্তীকালে পাজামা। এখন এসেছে স্লিপিং স্যুট। ভাদ্রের গরমে ভদ্রলোক শুয়ে আছেন ডোরাকাটা পাজামা আর ডোরাকাটা চায়না কোট পরে। স্ত্রী হয়তো বলছেন, 'কোট খুলে ফেল না বাপু, গরমে হাঁসফাঁস করে মরছো!' ভদ্রলোক বলছেন, 'তা কী করে হয়, ঘুমের পোশাক না পরলে ঘুম আসবে কী করে?' ভদ্রমহিলা তখন তাঁর কানের কাছে ধীরে ধীরে থাবড়া মারতে মারতে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন, 'আয় ঘুম, যায় ঘুম বর্গীপাড়া দিয়ে, ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল....।'

একালের ছেলেদের যাই বলি না কেন, সেকালের ছেলেদের চেয়েও দেখতে সুন্দর হয়েছে। কত রকমের প্যান্ট, জামা, টি-শার্ট, লম্বা লম্বা ফুরফুরে চুল, গায়ে মৃদু গন্ধ, পকেট থেকে যে রুমালটি বেরোল, সেই রুমালের দামে একটা গেঞ্জি কেনা যেতে পারে। যে কোনও মধ্যবিত্তের একদিনের বাজারখরচা হয়ে যেতে পারে। সারা মাসের কসমেটিকসের খরচে যে কোনও গরিব মানুষের সংসার হেসে-খেলে চলে যেতে পারে। একালের একজোড়া জুতোর দাম শুনলে সন্দেহ হয়, এ জুতো পায়ের না হাতের! আধুনিক সমাজের রূপরেখা যাই বলি না কেন, মনোরম একটা চেহারা নিয়েছে। পেটে কলের জল, মুখে বিউটি ক্রিম। 'একসকিউজ মি ম্যাডাম' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো ভেবেছিলুম। তিনি ঘুরে তাকালেন। আই সর্বনাশ! গোঁফ রয়েছে রে। ফুলছাপ কাপড়ের হাওয়াই শার্ট। ব্লাউজ ভেবেছিলুম। ববকাট চুল নয়, বিটলে কাট। সংশোধন করে বললুম, 'একসকিউজ মি স্যার।' মিস্টার মিস, দুই-ই এক হয়ে গেছে। দুজনেই ছুটছেন বিউটি পারলারের দিকে। দুজনেই ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ে মুখে লাগাচ্ছেন—কিউকাম্বার পুলটিস।

কে আসে, কে যায়

একটা পুরানো বাড়ির দোতলার দশ বাই বারো ঘরে শশাঙ্কবাবুর শেষ জীবন কাটছে। দোতলায় ওই একটাই ঘর, বাকীটা ছাদ। একসময় শশাঙ্কবাবুর খুব দাপট ছিল। মার্চেণ্ট অফিসে ভাল সম্মানের চাকরি করতেন। মোটামুটি ভাল মাইনেও ছিল। কাজের লোক বলে সুখ্যাতিও ছিল। মিলের মিহি ধুতি পরতেন। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় হাতির দাঁতের বোতাম, পায়ে ঝকঝকে পালিশ করা নিউকাট জুতো। চলার সময় মচমচ শব্দ হতো। শনিবার শনিবার স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতেন। রাতে বাড়ি ফেরার সময়ে চিৎপুরের বিখ্যাত দোকানে চিংড়ির কাটলেট আর ডবল হাফ চা খেয়ে পান আর জর্দা চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরতেন। মজলিসী মানুষ ছিলেন। রবিবার বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা বসত। মাঝে মধ্যে সেই আড্ডায় কোনো না কোনো ভাল গাইয়ে-বাজিয়ে এসে যেতেন। গানের ফোয়ারা ছুটত। পাড়া-প্রতিবেশীরা বাইরের ঘরের জানালায়, দরজায়, রকে ভিড় করে আসত। বেশ একটা সুখের সংসারই ছিল। একটি ছেলে একটি মেয়ে মোটে, সুন্দরী একটি বউ নিয়ে তিন নম্বর ঘোড়াপুকুর লেনে শশাঙ্কবাবু স্বপ্নের একটি সংসার সাজিয়ে বসেছিলেন। যত্র আয় তত্র ব্যয়। ধারদেনা ছিল না সঞ্চয়ও ছিল না। দেড়তলা পিতার আমলের বাড়িটিকে দোতলা কি তিনতলা করার তাগিদ অনুভব করেননি। শশাঙ্কবাবুর জীবনদর্শন ছিল খাও দাও শরীর বাগাও, ছেলেমেয়েদের মানুষ কর। দুদিনের এই সংসারে হেসে খেলে তল্পিতল্পা ফেলে বাড়ি চলে যাও। বিবেকানন্দের গাওয়া সেই গানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল, 'মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে।'

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। স্ত্রীকে ভীষণ ভালোবাসতেন, স্ত্রীর ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। লোকে তাঁকে স্ত্রৈণ বললেও গ্রাহ্য করতেন না, কারণ তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা পথ ও মত আছে। যার যার পথে চলাটাই হলো জীবনের সুখ।

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন ভাবছেন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় ফাঁকা একটা জায়গায় ছোট্ট একটা বাড়িতে বুড়ো আর বুড়ীতে মিলে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে দেবেন, ঠিক সেই সময় মৃত্যু এসে তাঁর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। শশাঙ্কবাবুর আমুদে মজলিসী মেজাজটাই গেল চিরকালের জন্য হারিয়ে। পৃথিবী এমন এক জায়গা যেখানে ভাল না লাগাটাকেও মেনে নিতে হয়! কর্তব্যের জন্য মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই হয়। মানুষ একা আসে। সাজিয়ে-গুজিয়ে মেলে বসে। একে একে পাখির মতো সব উড়ে আসে, কিছুকাল কিচিরমিচির, তারপর একে একে সব উড়ে যেতে থাকে, পড়ে থাকে শূন্য একটা বাসা। তবে পৃথিবীর নিয়মে বাসা শূন্য থাকে না। সেখানে ডিম ফুটে নতুন বাচ্চা আবার নতুন সংসার। এই নিয়মেই চলছে, চলছে, চলছে। শশাঙ্কবাবু কর্তব্যের জন্য স্ত্রী-বিয়োগের পরও কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর ভেতরের আনন্দময় পুরুষটির মৃত্যু হলো। মেয়েকে মোটামুটি ভালই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, দেখতেও খুব একটা খারাপ ছিল না। সময়ে সৎ একটি ছেলের সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ছেলেটি যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত, রাজনৈতিক কারণে সেই প্রতিষ্ঠানটি আজ তিন বছর বন্ধ। মেয়েকে বলেছিলেন তোরা আমার এখানে চলে আয়, এখনও যা আছে ভাগাভাগি করে কোনোরকমে দিন চলে যাবে। মেয়ে বা জামাই কেউই রাজী হলো না। শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, এটাই কি সংসারের নিয়ম! যে মেয়েকে বিশ বছর ধরে হাতের আড়ালে প্রদীপের শিখাটিকে রাখার মতো রাখলেন সেই মেয়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রইল না। সে আজ এতটাই পর যে বাবা সম্বোধনটি ছাড়া তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রইল না। তাঁর কাছে এসে থাকার চেয়েও উপবাসে থাকাটাই তার কাছে শ্রেয় হলো। শশাঙ্কবাবু মনে মনে খুব দুঃখ পেলেও মেয়ে-জামাই-এর ওপর আর কোনো চাপ সৃষ্টি করলেন না। শুধু এইটুকুই হলো যে একবেলা তিনি যেটুকু আহার করতেন সেটুকুও আর খুশিমনে মুখে তুলতে পারতেন না। কিছু খেতে গেলেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত তিনটি প্রায়-অভুক্ত মুখ—মেয়ে জামাই ও একটিমাত্র নাতি। ফলটা এই হলো যে তিনিও নিজেকে তাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনে

একটা আত্মিক সন্তুষ্টি লাভ করতেন, বিবেকের পীড়ায় ভুগতে হতো না।

ছেলেটি মানুষ হয়েছে, ভাল চাকরি করে, বেশির ভাগ সময় বিদেশেই থাকে। ভেবেছিলেন মনের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পাখির বাসাটিকে ভরিয়ে তুলবেন, কিন্তু একালের ছেলেদের মনস্তত্ত্বই আলাদা। তারা সুস্থ সংসারে ঢুকে দায়িত্বশীল পিতার ভূমিকা পালন করার চেয়েও বাইরের স্বাধীন ও কিছুটা উচ্ছৃংখল জীবনই পছন্দ করে—এটাই হলো যুগের হাওয়া। ফুর্তি, বেহিসেবী খরচ, দায়দায়িত্বহীন ঘুরে বেড়ানো এইটাই তাদের জীবনদর্শন। ছেলের ওপর একটু চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে দু'একবার সূক্ষ্মভাবে অপমানিতই হয়েছেন। ছেলে এখন আমেদাবাদে।

দেড়তলা বাড়ির ছাদের নির্জন ঘরটিতে শশাংকবাবু এখন প্রায় সন্ন্যাসীর জীবনই কাটাচ্ছেন। নিচের তলার তিনখানা ঘর সাজিয়ে-গুজিয়ে তালাচাবি দিয়েই ফেলে রেখেছেন এই আশায়, যদি কোনোদিন ছেলের সুমতি হয় তাহলে পুত্রবধূ আসবে। এসে তার সংসার বুঝে নেবে। লোকে বলে, এটা এক ধরনের পাগলামি। তাদের বোঝাতে পারেন না বা বোঝাতে চান না নিজের মনের কথা। সেই কথাটি অতি গোপনীয় নিজের এক মানসিকতা। নিচের যে কোনো ঘরেই ঢুকলে বা সেখানে বাস করতে চাইলে নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ ও একা মনে হয়। অতীতের স্মৃতি কয়েক লক্ষ বাদুড়ের মতো অন্ধকার করে ছুটে আসে, মনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ঝাপটা মেরে উড়তে থাকে। মনে হতে থাকে এই ঘরে বসত তাঁর রবিবারের আড্ডা। অতীতের সেই বন্ধুরা আজ কোথায়। অনেকেই বেঁচে আছে। সে বাঁচা হলো মরতে পারছে না বলেই বেঁচে থাকা। সংসারের বাঘ তাদের এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে যে তাদের নামটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কখনো কারুর সঙ্গে দেখা হলে এইভাবে কথাবার্তা হয়, 'কি, কেমন আছ?' 'তুমি কেমন আছ?' 'ঐ চলে যাচ্ছে এক রকম, চালিয়ে যাচ্ছি।' সঙ্গে এমন একটা হাসি যা একমাত্র এই বয়সে ক্ষত-বিক্ষত এক মানুষই হাসতে পারে। যেটাকে বলা চলে, হাসির আবরণে মানুষের করুণতম কান্না। শোওয়ার ঘরে কিছুক্ষণ বসে থাকার চেষ্টা করে দেখেছেন আত্মহননের ইচ্ছা হয়, বাইরের জানালায় আকাশ হয়ে

ওঠে মৃত্যুর নীল আঁচলের মতো, দেয়ালে ঝোলানো মৃত প্রিয়জনদের ছবি ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'যক্ষের মতো কার সম্পত্তি আগলে বসে আছিস বুড়ো, আমরা সবাই কেমন নতুন জীবন পেয়েছি নতুন নাটকের নতুন ভূমিকায় আর তুই সেই পুরানো নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ চরিত্রে এখনও অভিনয় করে চলেছিস, শূন্য প্রেক্ষাগৃহে। চলে আয়, চলে আয়।' কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে তিনি ভয়ে পালিয়ে যান। তাঁর ছাদের ঘরে পালিয়ে এসে মনে মনে হাসতে থাকেন, জীবন যেমনই হোক মৃত্যুকে কি ভীষণ ভয়। নিচের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনে পায়ে চটি গলিয়ে ক্ষয়া ক্ষয়া আধভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে শশাঙ্কবাবু সাবধানে নামতে লাগলেন। দরজার কড়া থেমে থেমে নড়ে চলেছে, নামতে নামতে তিনি বলতে লাগলেন, 'আসছি ভাই আসছি, একটু দাঁড়াও আসছি।'

শশাঙ্কবাবু দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময়টায় তাঁর কাছে তো কারুর আসার কথা নয়, আর আজকাল কেই বা আসে কার কাছে। সকলেই তো নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। দরজা খুললেন, সামনে দাঁড়িয়ে পোস্টাপিসের পিয়ন। পিয়ন বললেন, 'টেলিগ্রাম, সই করে নিন।' টেলিগ্রাম নামটা শুনলে মানুষের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। টেলিগ্রাম সাধারণত শুভ সংবাদ বহন করে আনে না। অন্তত শশাঙ্কবাবুর জীবনে আজ পর্যন্ত যে তিনটি টেলিগ্রাম এসেছে সবই নিয়ে এসেছে মৃত্যুর সংবাদ। পিওন ভদ্রলোক একটি ডটপেন এগিয়ে দিলেন। টেলিগ্রামটা নিয়ে ভেতরে এসে শশাঙ্কবাবু দালানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনে সাবেক বাড়ির ফাটল ধরা উঠান। একটা ভাঙা বালতি, তাইতে কিছু মাটি। সেই মাটির উপর লতিয়ে উঠেছে একটা উচ্ছে গাছ। তাতে ধরে আছে গোটা দুই হলুদ ফুল। সেই ফুল দুটোর দিকে কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ছাদের কার্নিশে একটা কাক অকারণে কর্কশ সুরে ডাকছে। শশাঙ্কবাবু অনুমান করার চেষ্টা করলেন টেলিগ্রামটা কোথা থেকে আসতে পারে। হাতেই ধরা রয়েছে ভাঁজ করা কাগজটা। খুললেই হয়। টেলিগ্রামে বেশী শব্দ থাকে না। দুটি কি তিনটি। নিমেষেই জানা যেতে পারে, তবু তিনি খোলার চেয়ে ভাবাটাই ভাল মনে করলেন। নাঃ, মন কোনো হদিস দিতে পারছে না।

ছেলে বাইরে, মেয়ে দুর্গাপুরে। এর যে কোনো একটা জায়গা থেকে টেলিগ্রামটা আসতে পারে। ছেলে জানাতে পারে তার বিশাল কোনো সাফল্যের খবর। মেয়ে জানাতে পারে সংসারের বিপদ কেটে গেছে, তার স্বামীর প্রতিষ্ঠান খুলে গেছে। শশাঙ্কবাবু নিজেকেই বললেন, 'খারাপটা ভাবছ কেন?' টেলিগ্রামটা তিনি খুললেন। একটি মাত্র লাইন। টেলিগ্রাম যেমন হয় 'কাম শার্প, অরুণ একসপায়ার্ড। অরুণা।' শশাঙ্কবাবু কাগজটা হাতের মুঠোয় নিয়ে দলা পাকালেন। নির্জন দালানের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি বারকয়েক পাক মেরে এলেন। মেয়ে অরুণা অল্পবয়সেই বিধবা হলো। তাতে তাঁর কি যায় আসে। অরুণাকে যখন এখানে এসে থাকার কথা বলেছিলেন তখন সে এমন একটা ভাব করেছিল যেন সে কত দূরের। তার পক্ষে বাবার এই প্রস্তাব এত অবাস্তব যে কোনোরকম উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। নীরব থেকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। সেই পরের স্ত্রী অরুণার স্বামী মারা গিয়েছে, এতে তাঁর বেদনার কি আছে। বিবাহের পর তাঁর কাছে তাঁর মেয়ে তো একটা ক্ষীণ সম্পর্ক। একটা পরিচিতি মাত্র। একটা বেদনা জানিয়ে ছোট্ট একটা পাল্টা টেলিগ্রাম করে দিলেই তো চলে। দালানে একটা বেতের জীর্ণ চেয়ার ছিল। শশাঙ্কবাবু তার ওপর বসলেন। বসা মাত্রই তাঁর চোখের সামনে অতীতের সমস্ত দরজা খুলে গেল। সামনেই রান্নাঘর, সেখানে যেন উনুন জ্বলছে। দরজার সামনে দালানের ওই দিকটায় অরুণা আসন পেতে পরীক্ষার পড়া পড়ছে আর এপাশটায় শশাঙ্কবাবু টেবিলের ওপর একটা গোল আয়না রেখে দাড়িতে সাবান বুলোতে বুলোতে অরুণাকে পড়া বলে দিচ্ছেন আর স্ত্রীকে বলছেন, 'কই, এক কাপ চা দাও, বাজার যাবার সময় হলো।' আর যে জায়গাটায় ওই ভাঙা বালতির ওপর উচ্ছে গাছটা উঠেছে, ওইখানে তাঁর শিশুপুত্রটি দাঁড়িয়ে আধো আধো গলায় একটা শালিক পাখির সঙ্গে আপন মনে কথা বলে চলেছে। দৃশ্যটা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। তালাবন্ধ তিনটে ঘর, বন্ধ রান্নাঘর, উঠানের একপাশে ভাঙা তোলাউনুন। বহুদিনের ব্যবহৃত একটা ঝ্যাঙরা, ছোট্ট একটা কয়লার স্তূপ। একটা অপরিচ্ছন্ন ন্যাতা, ফাটল-ধরা ঘাস গজানো উঠান।

শশাঙ্কবাবু বেতের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এইবার তাঁর

বুকের ভিতরে চটকলের ভোঁ বাঁশি বাজতে শুরু করেছে। হু হু করে দ্রুতগামী ইলেকট্রিক ট্রেন যেন ছুটে যাচ্ছে তাঁর মনের লাইনের ওপর দিয়ে। ক্রমশই দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তার বাঁশির আওয়াজ। শশাঙ্কবাবু কাঁদতে গিয়েও বিয়োগান্ত নাটকের বৃদ্ধ নায়কের মতো হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'অরুণা, এইবার তুই কেমন না এসে থাকতে পারিস দেখি। এইবার তোকে কে দেখবে এই বুড়ো বাপ ছাড়া।' শশাঙ্কবাবু আবার একটি দৃশ্য দেখলেন। বন্ধ তিনটি ঘরের তালা খুলে গেছে। মেঝে লাল চকচকে হয়েছে। খাটে পড়েছে নতুন চাদর। রান্নাঘরের দরজা খোলা। উনুনে গনগনে আগুন আর দরজার সামনে তাঁর স্ত্রী নয়, বিধবা মেয়ে অরুণা কুটনো কুটছে আর যে জায়গাটায় অরুণা বসে থাকত সেই জায়গায় বসে আছে তারই সন্তান। আর শশাঙ্কবাবু গোল আয়নায় দাড়ি কামাচ্ছেন না, কারণ জীবিকা তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি বসে আছেন এই বেতের চেয়ারটায় আর আরও মনোযোগ দিয়ে নাতনীটিকে পড়া বলে দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ করছেন একটু উপদেশ, 'দাদু, তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে নাও, তোমার মাকে কে দেখবে? আমার তো যে কোনো দিনই ডাক এল বলে!'

শশাঙ্কবাবু দলা পাকানো টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে ক্ষয়া-ক্ষয়া সিঁড়ি ভেঙে তাঁর ছাদের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন তিনি কি স্বার্থপর! না পরার্থপর, না নির্বোধ কোন্‌টা? তিনি কি এই মুহূর্তে এই কথাই বলবেন গানের ভাষায়, এই করেছো ভাল নিঠুর হে। নিঠুর শব্দটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠল। বহু বহু দিন পরে প্রাণ খুলে ছেলেমানুষের মতো কাঁদার সুযোগ পেলেন। অরুণার সাদা সিঁথির মতো তাঁর ভেতরে তৈরী হয়ে গেল একটি পায়ে চলা পথ, যে পথের দুপাশে কেউ নেই, শুধু আছে সময়ের ঝরা পাতা। দিন আর দিন, বছর আর বছর শুধু শুকনো নির্জীব জীবনবৃক্ষের বেঁচে থাকার ইতিহাস।

বিকাশের বিয়ে

বিকাশ আমার বন্ধু। বিকাশ বিয়ে করবে। না করে উপায় নেই। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি পেয়েছে। পরিবারের একটি মাত্র ছেলে। নিজেদের বাড়ি আছে। বাবা মারা গেছেন। মায়ের বয়স হয়েছে। বিকাশের বিয়ে অবশ্যম্ভাবী। আত্মরক্ষার জন্যেও বিয়ের প্রয়োজন। এদেশে অবিবাহিতা মেয়ের অভাব নেই। সকলেই যে প্রেম করবেন তা-ই বা আশা করা যায় কি করে! মেয়ের বাপ-মাকেই ভাল পাত্র ধরার জন্যে উদ্যোগী হতে হয়। বিকাশের হয়েছে মহাবিপদ। বিকাশ যেন তাজা ফুলকপি। বিকাশ যেন গঙ্গা থেকে সদ্য তোলা একটি ইলিশ মাছ। যাঁরা তাকে চেনেন জানেন সকলেই তাকে ওই দৃষ্টিতে দেখেন। ঝোলাতে হবে। মেয়ের হাতের ইলিশ করে।

দু'চার কথার পরেই তাঁদের প্রশ্ন ইলিশের তেলের খোঁজে চলে যায়। কড়ায় ছাড়লে বিকাশ কতটা তেল ছাড়বে! ব্যাঙ্কের চাকরি? বাঃ বাঃ। কোন ব্যাঙ্ক? ন্যাশন্যালাইজড? এখন পাচ্ছ কতো? পাকা চাকরি? বেড়ে বেড়ে কোথায় উঠবে? প্রোমোশান আছে? বাঃ বাঃ। তা ছুটিছাটার দিন এসো না একদিন। একটু ফ্রায়েড রাইস, চিকেন। রবীন্দ্রসংগীত নিশ্চয় ভালবাসো। উমা আজকাল ভীষণ ভাল গাইছে। পল্লব সেনের প্রিয় ছাত্রী। তুমি ছবি ভালবাস না, ছবি? মেয়েটার আঁকার হাত দুর্দান্ত। নিজের মেয়ের প্রশংসা করা উচিত নয়, তবু না বলে পারছি না।

বিবাহযোগ্যা বাঙালী মেয়ের মা-বাবার বিশেষ করে মায়েদের যে কি উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের দিন কাটাতে হয় তা আমি জানি; কারণ আমার একটি বোন আছে। আমার মায়ের ঘুম চলে গেছে। এই বুঝি মেয়ে প্রেম করে বসল! এই বুঝি কোনও পাড়াতুতো মাস্তান মেয়ের হাত ধরে হেঁচকা টান মারল! আমার মায়ের যত রকমের উদ্ভট চিন্তা। আমার বাবার জীবন অতিষ্ঠ। বাবা অফিস থেকে ফেরা মাত্রই প্রথম প্রশ্ন, 'কি, খোঁজ নিয়েছিলে?'

সারাদিন অজস্র কাজের চাপে বাবার কিছু মনেই নেই; ফলে

মিথ্যে বলে কি অভিনয় করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন না। পাল্টা প্রশ্ন, 'কি খোঁজ বলো তো ?'

ব্যাস, লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। 'ওই মেয়ে যখন তোমার মুখে চুন-কালি মাখাবে তখন বুঝবে। সেইদিন তুমি বুঝবে। সেইদিন তোমার শিক্ষা হবে। কেউ বলবে না তখন আমার মেয়ে। সবাই তোমার নাম করে বলবে ওমুকের মেয়ে।'

বাবার আর জামাকাপড় ছাড়া হল না, বিশ্রাম হল না, চা খাওয়া হল না। রেগে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'আজ আমি যাকে পাবো তাকেই ধরে আনবো।'

খামোখা মাইল তিনেক অকারণ হেঁটে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এলেন রাত দশটায়। এই ভ্রমণের নাম প্রাতর্ভ্রমণ নয়, পাত্র-ভ্রমণ। এ তো হল বিয়ে রাগের পাত্র-ভ্রমণ। ঠাণ্ডা মাথায় পাত্র-ভ্রমণ অহরহই চলছে। ভাল চাকুরে, অবিবাহিত ছেলেরা ঠিক ধরতে পারে। ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা মাছ ধরতে বেরিয়েছেন। বগলে অদৃশ্য ছিপ। ছিপের সুতোয় ঝুলছে টোপ গাঁথা বঁড়শি। মেয়ের গুণের টোপ, বংশপরিচয়ের টোপ, ভালমন্দ দেয়াটেয়ার টোপ। অনেকে আবার একটু বেশি দুঃসাহসী। চোখ দিয়ে দেহ জরিপ করেন, বুকের ছাতি, গলার মাপ। কেউ কেউ আবার কায়দা করে হাতের গুলি মেপে নেন। 'এই তো চাই, ফাইন ইয়াং ম্যান। এই তো চাই। সাহস, কারেজ, হেলথ।' ওপর বাহুটা কথা বলতে বলতে ধরে, তাগার মতো মেপে নিলেন। দেখে নিলেন কতটা তাগড়া। বিয়ের ধাক্কা, সংসারের ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না। ক্ষইতে কতটা সময় নেবে বাবাজীবন। পরে হয়তো একটু উপদেশ যোগ করলেন—'ব্যায়ামট্যায়াম করো, একটু ভালমন্দ, সময়-মতো খাও, শরীরম্ আদ্যম্। শরীরটাই সব।'

বাজারের মাছ আর ব্যাগের মাছের যা পার্থক্য। কোনও ক্রমে একটা ব্যাগে ঢুকে গেলে আর দরদস্তুর নেই। কানকো তুলে তুলে দেখা নেই। বিকাশ সেই কারণেই ব্যাগে ঢুকে পড়তে চায়। ছেলে ভাল। তেমন লোভী নয়। শ্বশুর মেরে হোন্ডা চাপতে চায় না। সেরকম বন্ধুও আমার আছে। সোমেন। সে তো প্রায় দফতর খুলে বসেছিল রাজনৈতিক নেতাদের মতো। পার্টি-অফিস। ঠিক সে খোলেনি, খুলেছিলেন তার পিতা। ছেলের পেছনে ভদ্রলোকের যথেষ্ট

ইনভেস্টমেন্ট ছিল। অভাব সত্ত্বেও ছেলেকে সাংঘাতিক ভাবে মানুষ করেছিলেন। ছেলেও সরেস ছিল। শেষে আই. এ. এস. হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীকে তাক লাগিয়ে দিলে। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাবার পরই আমাদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে লাগল। আই. এ. এস. হবার পর আমাদের কোনও রকমে একটু চিনতে পারত। ভাল পোস্টিং হয়ে যাবার পর পথেঘাটে দেখা হলে চোখে চোখে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিত। টর্চলাইট ফেলার মতো। সোমেনের বাবা বলতেন, ছেলে হল হীরে। কত খুঁজে তোলা হল। তারপর অভিজ্ঞ হাতে কাটাই ছাঁটাই। কম খরচ ! তারপর নিলাম। একলাখ বিশ ! দেড় লাখ ! তিন লাখ ! কে হাঁকবে দর ? মেয়ের বাবারা।

সোমেন নামক হীরকখণ্ডটি প্রায় তিন লাখে বিকিয়ে গেল। জাহাজ থেকে মাল খালাসের বিজনেস ছিল শ্বশুরমশাইয়ের। বেহালায় বিশাল বাগানবাড়ি। সেই বাগানে আবার ফোয়ারা। মার্বেল পাথরের উলঙ্গ নারীমূর্তি। সোমেনের বাবার সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। বড়লোকের কন্যাটি অসুন্দরী ছিল না ; তবে যাদের ঘরে ছ'ছটা গরু থাকে তাদের ছেলেমেয়েরা একটু গায়েগতরে হবেই। আর বড়লোকরা একটু মোটাসোটা না হলে মানায় না। মেদ হল অর্থের বিজ্ঞাপন। খেংকুরে বড়লোক হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কাগজে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে। বড়লোকের নানা শরীর-লক্ষণ থাকা উচিত। কর্তার পঞ্চাশের পর রক্তে চিনি। চায়ের কাপে আয়েস করে স্যাকারিনের পুটকি ট্যাবলেট ফেলতে ফেলতে বলবেন, একটু বেড়েছে, একশো আশি। অর্থাৎ ওদিকে ব্যাঙ্কে যত বাড়ছে, সেই অনুপাতে এদিকেও বাড়বে। মানি হল হানি। টাকা হল সুগার কিউব। রক্ত তো বটেই। তা না হলে রক্তের চাপ বাড়ে কেন ? চল্লিশের পরেই গৃহিণীর বাত। বাতের জন্যেই রাজহংসীর মতো চলন। মেয়েটি সুন্দরী ; কিন্তু মোটা। সোমেনের বাবা কোনও রকমে একতলা একটা বাড়ি করেছিলেন। প্লাস্টার আর রঙ ছিল না। বেয়াইমশাই মেয়েকে পাঠাবার আগে একদল কন্ট্রাকটার পাঠালেন। তারা এক মাসে আড়াইতলার একটা ছবি খাড়া করে দিলে। কটক থেকে মালি এসে চারপাশের খোলা জায়গায় ফুল ফুটিয়ে দিলে। দু' তিন লরি ফার্নিচার ঢুকে পড়ল হইহই করে। তারপর বাজল সানাই। সে কি সুর কালোয়াতি ! পাড়া-প্রতিবেশীর

বুকের চাপাকান্না যেন বাতাসে কাঁপছে। প্রতিবেশীরা কাঁদবেই তো। সোমেনের বাবা ছিলেন সামান্য মানুষ। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। জীবনের প্রথম দিকটায় খুচখাচ ব্যবসা করতেন। শেষটায় করতেন ঘটকালি। সেই মানুষ কি ভাবে একটা একতলা বাড়ি করলেন। আধা-খেঁচড়া হলেও মাথার ওপর ছাদ তো! সেইটাই তো প্রতিবেশীর কাছে বিশাল এক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তো নিজেদের প্রশ্ন, আমরা কেন পারলুম না! যেই মনে হল, আমরা কেন পারলুম না, অমনি ভেতরে শুরু হল শৃগালের কান্না। যাক, সোমেনদের বাড়ি হওয়ার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে, সোমেনের এম. এ'তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া। সে যেন পুরনো ক্ষতে নুনের ছিটে। একটা ছেলে চোখের সামনে তরতর করে সৌভাগ্য আর প্রতিপত্তির দিকে এগিয়ে যাবে, এ তো সহজে সহ্য করা যায় না। এর পরের মস্ত আঘাত হল সোমেনের আই এ এস. হওয়া। যাঃ, সর্বনাশ! এ ছেলেকে তো শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনায় সাধারণের স্তরে আটকে রাখা গেল না! এ তো অফিসার হবেই। গাড়ি, কোয়ার্টার, মোটা মাইনে, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সবই তার হাতের মুঠোয়। চিন্তায় চিন্তায় একপাড়া লোক রোগা হয়ে গেল। আমরা তখন সোমেনকে বয়কট করলুম। যে ছেলে অসামাজিক হয়ে যাবে, তার সঙ্গে খাতির রেখে আর লাভ কি? শেষ আঘাত সোমেনের বিয়ে। আমরা নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, না গেলুম বরযাত্রী না গেলুম বউভাতে। যে ছেলে বিয়েতে শ্বশুরকে দোহন করে পণ নেয়, উপহার নেয়, সে একটা নির্লজ্জ লোভী। তার অনুষ্ঠানে যাওয়াটাও পাপ। বড়লোকের আবার না চাইতেই কিছু তাঁবেদার জুটে যায়। সোমেনের পক্ষে অনেকে বলতে লাগলেন, 'শ্বশুরের আছে তাই দিয়েছে, সে তো আর চায়নি।' চেয়েছে কি চায়নি বুঝল কি করে।

বিকাশ বললে, 'সোমেনের মতো আমি চামার নই। একটা পয়সাও আমি নেবো না। তবে হ্যাঁ, আমার একটা শর্ত আছে, মেয়েটি সুন্দর হওয়া চাই। বউ নিয়ে বুকফুলিয়ে যেন রাস্তায় হাঁটতে পারি।' বিকাশের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, ছেলেকে আমি নিলেমে চড়াব না। তবে মেয়েপক্ষ যদি মেয়েকে ঘর সাজিয়ে দিতে চান, তাহলে আমি রোজগেরে ছেলের অহঙ্কারে অপমান করতে পারবো না। লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। অহঙ্কার একেবারে সহ্য করতে পারেন না।'

শনিবার রবিবার বিকাশের কাজই হল আমাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে বেরনো। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি, ছেলেরা যখন বেকার থাকে তখন সে প্রেমিক। প্রেম করে বেড়ায়। যেই সে ভাল চাকরি পেল অমনি তার প্রেম ঘুচে গেল, তখন তার আটকাঠ বেঁধে, ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে বউ আনার তাল। বিকাশের একজন প্রেমিকা ছিল, তাকে আর পাত্তাই দেয় না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, ব্যাপারটা কি। প্রথমে বলতেই চায় না, শেষে বললে, 'আমি একটু ভাল মেয়ে চাই। আর এখন আমার চাইবার অধিকারও এসেছে। প্রেমের আবেগে বোকামি করলে আমাকেই পস্তাতে হবে। সারাজীবনের ব্যাপার। সারাজীবন প্রেমের চশমা পরে একটা মেয়ের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। বাস্তব হল অঙ্কের মতো।'

'তোর প্রেমিকাটি তো ভালই দেখতে।'

'ভাল দেখতে হলে কি হবে, ভীষণ ঘামে আর সর্দির ধাত।'

আমি হাঁ করে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। পৃথিবীতে কত রকমের মাল আছে ভগবান!

জিজ্ঞেস করলুম, 'একটা মেয়েকে বাইরের দেখায় তুই রূপটা দেখলি, অন্তরঙ্গ খবর পাবি কি করে? ঘামে কি না, সর্দি হয় কি না! তোকে তাহলে অবজেকটিভ টেস্টের মতো প্রশ্নপত্র বিলি করতে হবে রে! তুই কি কি চাস বল তো!'

'অনেক মেয়ে আছে খাওয়াদাওয়ার পর ঢেউ করে গ্যাসের রুগির মতো ঢেঁকুর তোলে।'

'তারপর?'

'সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খোঁটে। হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মোছে। চিৎকার করে কথা বলে। দুমদুম করে সিঁড়ি ভাঙে। কথা বলার সময় গায়ে ধাক্কা মারে। দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না, পা নাচায়। খাওয়ার সময় চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ করে। ঠুকে জিনিস রাখে। চিরুনিতে চুল ওঠে। মাথায় খুসকি হয়। পেটে গুড়গুড়, গুড়গুড় শব্দ হয়। জ্বর হলে উঁ আঁ করে। ধনুকের মতো বেঁকে শোয়। হাঁউ হাঁউ করে হাই তোলে। নির্জনে নাক খোঁটে। খেতে বসে আঙুল চোষে। দাঁত দিয়ে নখ কাটে।'

'অসম্ভব! তোর বিয়ে হওয়া অসম্ভব! হলেও ডিভোর্স হয়ে

যাবে। এই সব ডিফেক্‌ট একটা মেয়ের খুব কাছে না এলে ধরা যায় না।'

'ধরার চেষ্টা করতে হবে। বউ করব বাজিয়ে। এ তো প্রেম করা নয়, যে মেনে নিতে হবে প্রেমের প্রলেপ দিয়ে।'

আমি সব শুনে রাখলুম। মনে মনে হাসলুম। এমন মেয়ে মানুষের বাড়িতে মেলা অসম্ভব। কুমোরটুলিতে অর্ডার দিতে হবে। স্বয়ং মা দুর্গাও হয়তো অসুর মারার সময় ঘেমেছিলেন।

রবিবারের এক বিকেলে আমরা রামরাজাতলায় মেয়ে দেখতে গেলুম। বেশ বড় সাবেক আমলের বাড়ি। গ্যারেজ আছে। বিকাশ ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িই আমার শ্বশুরবাড়ি।'

'হলেই ভাল, তবে তোমার যা চাহিদা!'

বৈঠকখানায় আমরা বসলুম। বসতে না বসতেই মেয়ের বাবা সবিনয়ে এসে হাজির। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। ঢোলা পাঞ্জাবি পরিধানে। ভুঁড়িটা সামনে ফুটবলের মতো উঁচু হয়ে আছে। ভদ্রলোক সোফায় বসামাত্র বিকাশ উঠে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হল আপনার?'

'আমার পছন্দ হল না।' বিকাশের সরাসরি উত্তর।

'কি করে! আপনি তো আমার বোনকে এখনও দেখেননি!'

বিকাশ একটু থতমত খেয়ে গেল। আমরা দুজনেই ভদ্রলোককে পিতা ভেবেছিলুম।

মেয়ের দাদা বললেন, 'আমার বোনকে আগে দেখুন, তারপর তো পছন্দ অপছন্দ!

বিকাশ বললে, 'শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আপনাকে দেখেই আমার ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে আপনার মতোই হবে। আপনারই স্ত্রী-সংস্করণ।'

ভদ্রলোক বেশ আহত হয়ে বললেন, 'ছিঃ, চেহারা তুলে কথা বলবেন না। ওটা এক ধরনের অসভ্যতা।'

আমি বললুম, 'আমার বন্ধুর কোনও দাবি-দাওয়াও নেই, পছন্দ হলেই পত্রপাঠ কাজ সারবে; তবে ওর একটাই শখ বউ যেন সুন্দরী হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে দেখে আমার বোন সম্পর্কে কোনও ধারণা করলে ভুল করবেন। সে কিন্তু প্রকৃতই সুন্দরী।'

বিকাশ বললে, 'ও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলে না। আমি শুধু সুন্দরী মেয়েই চাই না, আমি চাই সুন্দরের বংশ। আপনি আমার শ্যালক হলে পরিচয় দিতে পারব না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'গেট আউট। আভি নিকালো হিঁয়াসে।'

আমরা এক দৌড়ে রামরাজাতলার রাস্তায়। ভদ্রলোক এই ভদ্রতাটুকু অন্তত করলেন যে রাস্তা পর্যন্ত তেড়ে এলেন না। এলে পাবলিক আমাদের পিটিয়ে লাশ করে দিত। বেশ কিছু দূরে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে বিকাশকে বললুম, 'তাহলে আরও কিছু নতুন শর্ত যোগ হল।'

'হলই তো। একটা পয়সাও যখন নোবো না, তখন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে বিয়ে করব। অনেকে কি করে জানিস তো, মেয়ের এক একটা ডিফেকটের জন্যে টাকা দাবি করে। একটু খাটো মাপের, দু হাজার। নাকথেবড়া, পাঁচ হাজার। চাপা রঙ, তিন হাজার। সামনের দাঁত উঁচু, সাত হাজার। পৃথিবীটা লোভী মানুষে ছেয়ে গেছে। অনেকে দেখবি ওই কারণে ওই রকম মেয়েই খোঁজে। বিয়ে নয় ব্যবসা।'

'তুই মেয়েটিকে না দেখে ওই রকম একটা অভদ্র কাণ্ড করলি কেন?'

'শোন—লুঙ্গি পরা শ্বশুর, ভুঁড়িঅলা শালা, দাঁত বড় শাশুড়ী, এইসব আমার চলবে না। আমি যে বাড়ির জামাই হব সে বাড়িতে যেন চাঁদের হাটবাজার হয়।'

'বাড়িতে লুঙ্গি পরা চলবে না?'

'না, লুঙ্গি অতি অশ্লীল জিনিস। আমার শ্বশুরকে ড্রেসিং-গাউন পরতে হবে।'

'বেশ ভাই, যা ভাল বোঝো তাই করো!'

'সবসময় একটু দূরে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবি। ধর বিয়ের পর আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হল। আমার পাশে হিড়িম্বা, আমার ওপাশে সূর্পনখা, পেছনে ঘটোৎকচ, তার পাশে হিরণ্যকশিপু। কেমন লাগবে!'

বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর শুকচরে আবার একটি মেয়ে দেখতে যাওয়া হল। সেও বেশ সাবেককালের বাড়ি, বনেদী বাড়ি। লোকজন নেই বললেই চলে। বাড়ির আকার আকৃতি দেখলে মনে হয়, শতাব্দীর শুরুতে এই গৃহ ছিল শতকণ্ঠে মুখর। উঠানের পাশে ভেঙে পড়া একটি বাড়ির কাঠামো দেখে মনে হল, এখানে একসময় একটি আস্তাবল ছিল। আমার অনুমান সত্য প্রমাণ করার জন্যে পড়ে আছে কেরাঞ্চি গাড়ির দুটি ভাঙা চাকা। বিকাশের কি মনে হচ্ছিল জানি না, আমার মনে ভিড় করে আসছিল অজস্র সুখস্মৃতি। মনে হচ্ছিল আমি যেন ইতিহাসে ঢুকে পড়েছি। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ। ভেঙে এলেও, অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাটকা স্বস্তিকা চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলুম এখনও পুজোপাঠ হয়। উঠানের একপাশে ফুটে আছে এক ঝাঁক কৃষ্ণকলি আর নয়নতারা। ভীষণ ঘরোয়া ফুল। দেখলেই মনে হয় দুঃখের মধ্যে সুখ ফুটে আছে। যেসব পরিবার, বড় পরিবার ভেঙে গিয়েও নতুন করে বেঁচে আছে, নতুন ভাবে, তাঁদের সেই অতীত বর্তমানের জমিতে ফুটে থাকে কৃষ্ণকলি হয়ে। বিশাল দরজা, ততোধিক বিশাল উঠান পেরিয়ে আমরা চলেছি। তখনও মানুষজন চোখে পড়েনি। ভেতরের বাড়িতে সবাই আছেন। দূরে কোথাও একটা গরু পরিতৃপ্ত গলায় ডেকে উঠল। এই ডাক আমার চেনা। এ হল গরবিনী গাভীমাতার ডাক। আমি জাতিস্মর নই, তবু মনে হতে লাগল এই বাড়ি আমার অনেককালের চেনা।

ভেতর বাড়িতে পা রাখা মাত্রই শীর্ণ চেহারার এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন। শীর্ণ কিন্তু সুশ্রী। ভদ্রলোকের পরিধানে পাজামা ও পাঞ্জাবি। মুখে ভারি সুন্দর হাসি। একমাথা ঘন কালো চুল। ভেতরের বাড়িটা যাকে বলে চকমেলানো বাড়ি, হয়তো সেই বাড়িই ছিল এক সময়। দেখেই মনে হল বাড়িটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের নিচের তলার ঘরে নিয়ে এলেন। বিশাল বড় ঘর। শ্বেত-পাথরের মেঝে। ঘরে তেমন আসবাবপত্র নেই। কার্পেট ঢাকা একটি চৌকি পাতা। ভদ্রলোক আমাদের বসিয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বিকাশকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি মনে হচ্ছে? তোমার ষষ্ঠ অনুভূতি কি বলছে?'

'পড়তি !'

'আর পড়বে না। এখন একটা জায়গায় এসে আটকেছে। আর তোমার তো দাবিদাওয়া নেই।'

'দাবি না থাক, এই ভাঙা গোয়ালে কে বাসর পাতবে! সাপে কামড়ালে কে বাঁচাবে ভাই! লক্ষ্মীন্দরের বাসর হয়ে যাবে। আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িতে কম-সে-কম এক হাজার জাত সাপ আছে।'

বিকাশের কথায় গা জ্বলে গেল। আমাদের সঙ্গে রকে বসে আড্ডা মারতো। চা, চপ খেত। হঠাৎ ভাল একটা চাকরি পেয়ে মাথা বিগড়ে গেছে। ধরাকে সরাজ্ঞান। মনে মনে বললুম—যা ব্যাটা মরগে যা। বিকাশের ওপর আমার একটা ঘৃণা আসছে।

ভদ্রলোকের নিজেই একটা ট্রে দু'হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার ওপর সাধারণ দুটো কাঁচের গেলাস। গেলাসে ডাবের জল। ট্রে-টা সামনে রেখে সাবধানে গেলাস দুটো আমাদের হাতে তুলে দিলেন। বিকাশ ডাঁট মারতে শুরু করেছে। গেলাসটা এমন ভাবে নিল, যেন দয়া করছে। কার্পেটের একপাশে রেখে ভারিক্কি গলায় বললে, 'এই সব ফর্মালিটি ছেড়ে কাজের কাজ সারুন। আমার অনেক কাজ আছে।'

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তবে দূর থেকে আসছেন, গরমকাল, এখনও কিছু পিতার আমলের নারকোল গাছ আছে। খেয়ে দেখুন, খুব মিষ্টি জল।'

'ও জলটল পরে হবে, দেখাদেখিটা সেরে নিন।'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ বিব্রত মুখে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বিকাশকে বললুম, 'তোর সঙ্গে আর আমি যাব না কোথাও। এবার তুই ছোট-লোকমি শুরু করেছিস।'

'ছোটলোকমির কি আছে! আমার এই রোগা-রোগা-চেহারার পড়তি বড়লোকদের বিশ্রী লাগে। বিনয়ের আদিখ্যেতা। স্পষ্ট উচ্চারণে নিচু গলার কথা।'

'তা হলে এলি কেন? খামোখা একটা মানুষকে অপমান করার জন্যে?'

'জানবো কি করে?'

একটা চেয়ার নিয়ে ভদ্রলোককে আসতে দেখে এগিয়ে গেলুম। ভারি চেয়ার। একা সামলাতে পারছেন না।

'সরুন আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বইছেন কেন? আর কেউ নেই?'

'না, আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমার চেহারা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না, আমি খুব খাটতে পারি।'

চেয়ারটাকে জানালার পাশে আমাদের দিকে মুখ করে রাখা হল। কিছু পরেই তিনি পাত্রীকে নিয়ে এলেন। সাজগোজের কোনও ঘটা নেই। ফিকে নীল শাড়ি। হাতাঅলা সাদা ব্লাউজ। চুলে একটা এলো খোঁপা। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটি টিপ।

মেয়েটি নমস্কার করে চেয়ারে বসল। পুরো ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর। বোকা বোকা, হৃদয়হীন, নির্দয় একটা ব্যাপার। দু জোড়া চোখ প্রায় অসহায় একটি মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আমি সেভাবে না দেখলেও বিকাশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখছে। মাপজোক করছে। সুন্দরী বউ চাই। ডানাকাটা পরী চাই। লেখা-পড়ায়, চাকরিতে বাল্যবন্ধু সোমেন মেরে বেরিয়ে গেছে। হেরে আছে একটা জায়গায়, বিয়েতে। পেয়েছে খুব, কিন্তু বউ নিখুঁত সুন্দরী নয়। বিকাশ বউ দিয়ে মেরে বেরিয়ে যাবে।

মেয়েটি মুখ নিচু করে বসে আছে। ভদ্রলোকের মুখের আদলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ মেলে। ধারালো অভিজাত মুখ। চাঁপা ফুলের মতো গাত্রবর্ণ। লম্বা, ছিপছিপে বেতসলতার মতো চেহারা। ভারি সুন্দর। বেশ একটা মহিমা আছে। অন্তত আমার চোখে। মেয়েটিকে খুব নম্র, ভীরু মনে হল। মনে হল বসে আছে অসহায় অপরাধীর মতো।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'ছেলেবেলায় দিদি আর জামাইবাবু মারা যাবার পর আমার এই ভাগনী আমার কাছেই মানুষ। তখন আমাদের সাংঘাতিক দুরবস্থা। তবু আমি আমার কর্তব্য করে গেছি। পড়িয়েছি। গান শিখিয়েছি। নাচ শিখিয়েছি। সভ্যতা, ভদ্রতা, সংসারের যাবতীয় কাজ শিখিয়েছি। একটাই আমি পারিনি, তা হল ভাল করে খাওয়াতে পারি নি। তার জন্যে দায়ী আমাদের অভাব। আমার রোজগার করার অক্ষমতা। তবে এই গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি, এমন মেয়ে সহজে পাবেন না। দুঃখের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় হয়েছে। ওদিকে বড় ঘরের সংস্কারও কাজ করেছে। মেয়েটিকে আপনারা গ্রহণ করুন। আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে আসছে।'

বিকাশ ফট করে উঠে পড়ল। একেবারে আচমকা।

ভদ্রলোক অপদস্থ হয়ে বললেন, 'কি হল? আমি কি কোন অন্যায় করে ফেললুম?'

বিকাশ একেবারে গুলি ছোঁড়ার মতো করে বললে, 'যে মাল বিজ্ঞাপনের জোরে বিকোতে হয় সে মাল ভাল হয় না।'

মেয়েটি শিউরে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। আপনার ভাগনীর স্ত্রীরোগ আছে।'

আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। সমস্ত শক্তি এক করে বিকাশের ফোলা ফোলা গালে ঠাস করে এক চড় মারলুম। আর একটা চড় তুলেছিলুম! ভদ্রলোক ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন। বিকাশের নিতম্বে কষে একটা লাথি মারার বাসনা হচ্ছিল। বিকাশ মুখে অহংকারে প্রবল, শরীরে দুর্বল। হনহন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ফিরে তাকালুম। ভীরু মেয়েটির ঠোঁট ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। বড় বড় পাতা ঘেরা চোখে জল টলটলে। সেই মুহূর্তে ভেতরের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। পুজো হচ্ছে গৃহদেবতার। ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে। আমি পিছোতে পিছোতে চৌকিটার ওপরে গিয়ে বসলুম। আমার ভীষণ একটা তৃপ্তি হয়েছে। একটা অসভ্য, একটা ইতরকে আমি আঘাত করতে পেরেছি। অসীম সুখে আমার মন ভরে গেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন শাঁখ আর ঘণ্টা বাজছে পুজোর ঘরে, আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সাংঘাতিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোককে বললুম, 'আপনি দিন দেখুন, আমি বিয়ে করব। আমি বড় চাকরি করি না, তবে মানুষ। বিয়ে এখন বড়লোকের ব্যবসা, তবু আমি এই ঝুঁকি নেবো। আমার পিতা এসে পাকা কথা কয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তার আগে আপনার ভাগনীকে জিজ্ঞেস করুন, আমাকে পছন্দ কি না?'

ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তখনও হাত কাঁপছে।

মেয়েটি অস্ফুটে বললে, 'আপনাকে আমি চিনি।'

'কি করে?'

'আমি বইয়ে পড়েছি এমন চরিত্রের কথা।'

'আমি বাস্তব নই!'

'কাল বোঝা যাবে।'

মেয়েটি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ভদ্রলোক আবেগের গলায় বললেন, 'তুমি বাস্তব হবে তো!'

তালা-চাবি

বীরেন বিডন স্ট্রিটে নামবে। বাস গ্রে স্ট্রিট পেরোতেই নামবার প্রস্তুতি শুরু হল। বেশ জমিয়ে বসেছিল জানালার ধারে। ফুরফুরে বাতাসে মাঝে মাঝে তন্দ্রার মত আসছিল। দু'একবার ঢুলে পাশের ভদ্রলোকের কাঁধে ঢুঁ মেরে, পালটা ঢুঁয়ে আবার সোজা হয়েছে। একালের সহযাত্রীরা কেউই তেমন সহিষ্ণু নয়। প্রোটিন আর ভিটামিনের অভাবে সকলেই স্বভাবে খেঁকি। সামান্য একটু ছুতো পেলেই হল। লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। ফাটাফাটি। দু'চারটে লাশই হয়তো গিরে গেল। ভদ্রলোক ধাক্কা মেরে সোজা করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা চটকে গেলেও পালাজ্বরের মত ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল না। আবার ধাক্কা। আবার খাড়া। আবার ঢুল। এতক্ষণ এই চলছিল। ভদ্রলোক একবার বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, রাতে কি করেন মশাই, ব্যবসা ? বীরেন মুখ বুজে খোঁচা হজম করে নিজেকে খাড়া রাখার চেষ্টা করেছিল, কারণ সে অপরাধী।

যাক, বিডন স্ট্রিট এল বলে। নেমে গেলেই সব সমস্যার সমাধান। বীরেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ধপাস করে বসে পড়ল। ডানদিকের পাঞ্জাবির পকেটে টান পড়েছে। এ আবার কী ধরনের রসিকতা! পকেট ধরে কে টানছে! পেছনদিকে তাকাল। নাড়ুগোপাল চেহারার দুই যাত্রী অর্ধ-নিমীলিত চোখে বসে আছেন। এর মাথা ওর দিকে, ওর মাথা এর দিকে। পকেট টেনে ধরায় পেছনের যাত্রী দু'জনের কোনও ভূমিকা নেই। আসনের তলায় কোনও শিশু বসে নেই তো! না, তা কী করে হয়! ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের মত বীরেন হাত দিয়ে ধীরে ধীরে শরীরের পাশ বেয়ে বেয়ে নিচের দিকে নেমে রহস্য সন্ধানের চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে বিডন স্ট্রিট পালাচ্ছে। বসে বসেই চিৎকার করল, রোক্‌কে, রোক্‌কে।

যাঁরা জড়ামড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই তাল তাল মানুষের সমবেত কণ্ঠ গর্জে উঠল, এতক্ষণ কী করছিলেন—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ? জানলার ধারের ফুরফুরে বাতাসে ভাত-ঘুম ? খুব ঘুম, অ্যাঁ, খুউব আরাম!

বীরেনের পাশের ভদ্রলোক বললেন, ঘুম মানে ? অল অ্যালং চুম মেরে মেরে লাইফ হেল করে দিলে মশাই ।

বীরেন ডানপাশে ঘাড় হেঁট অবস্থায় আর একবার করুণ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল—রোক্‌কে । আমি বিডন স্ট্রিটে নামব ।

কে একজন ভেঙচি কেটে বললেন, নামবেন তো দয়া করে নেমে পড়ুন না । বসে বসে দ্যায়লা না করে ।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বিধান দিলেন, টেনে নিয়ে চলুন, টেনে নিয়ে চলুন ধরমতলা অবদি ।

বীরেন নামতে পারে ভেবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুই যাত্রীতে বসার জন্যে কনুই-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল । কে কাকে টেক্কা দিয়ে বসতে পারে । পা আর কোমরের কেরামতিও সমানে চলেছে । তৃতীয় এক প্রবীণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আহা, আগে নামুক তারপর যে কেউ একজন বসবেন'খন । এখন থেকে মারামারি করে লাভ কী !

নানা ভাবে চেষ্টা করেও বীরেন পকেট ছাড়াতে পারছে না । একগাদা খুচরো পয়সা আর লাইটার-মাইটার নিয়ে হরিনামের ঝুলির মত পকেট সিটের পাশের ফাঁকে অ্যায়সা আটকান আটকেছে—এ যেন সেই একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল । ঢুকলি ঢুকলি, যেভাবে ঢুকলি সেভাবে বেরোতে কি হয় ! পৃথিবীটা দিন দিন এত ছ্যাঁচড়া মেরে যাচ্ছে কেন ? কারণটা কী ? ছ্যাঁচড়া বিয়ে-বাড়িতে বন্ধ হলে কী হবে ! সর্বত্র ছ্যাঁচড়ামি ।

যাঁরা বসার প্রত্যাশায় কনুই-মারামারি করছিলেন, তাঁদের একজন অধৈর্য হয়ে বললেন, কী হল মশাই ? বিডন স্ট্রিট তো চলে গেল ।

বীরেন করুণ মুখে বললে, কী করব বলুন ? পকেট আটকে গেছে । কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না ।

অ্যাঁ, সে আবার কী ! পকেটে ম্যাগনেট-ফ্যাগনেট কিছু আছে বুঝি ?

ম্যাগনেট ? বীরেন অবাক হল, ম্যাগনেট থাকবে কেন ?

তাহলে আটকাল কী করে ?

খাঁজে ঢুকে গেছে ।

টেনে বের করে নিন । না, তাও পারছেন না ?

কিছুতেই বেরোচ্ছে না যে !

তার মানে? যে রাস্তায় ঢুকেছে, সেই রাস্তাতেই বেরোবে। ওর বাপ বেরোবে। মারুন টান!

বীরেনের পাশে বসে যে ভদ্রলোক এতক্ষণ তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন, দেখা গেল তাঁর সহানুভূতিই সবচেয়ে বেশি। তিনি বললেন, টান মারবে কী? টান মারলেই হোলো? পাঞ্জাবি ছিঁড়ে যাবে না? এই বাজারে ছেঁড়া মানেই পঞ্চাশ-ষাট টাকার ধাক্কা! বাসের মালিক ষাটটা টাকা দেবে?

বাসের মালিক দেবে কেন মশাই? কী আবোল-তাবোল বকছেন? বাস-মালিকের দোষটা কোথায়? বসতে হলে পকেট সামলে বসতে হয়। হাঁ করে ঘুমোলেই হয় না। আজকালকার ইয়াংম্যানরা সব আয়েসী!

ভদ্রলোক ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন, থামুন। সমালোচনা করে করে আর জ্ঞান দিয়ে দিয়ে জাতটা ফিনিশ হয়ে গেল।

বীরেনের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে ভদ্রলোক বললেন, পকেট থেকে কিছু জিনিস আগে বের করে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে চেষ্টা করো!

মধ্যবয়সী মানুষের স্নেহ-মিশ্রিত পরামর্শ, বীরেনের মনে দাগ কেটে গেল। পৃথিবীতে ভালো মানুষ এখনও আছে। কিংবা সব মানুষই ভালো। ওপর দেখে বিচার করা হয়, যার ফলে সত্য চাপা পড়ে থাকে।

বীরেন বললে, খুচরো পয়সার ভারে হরিনামের ঝুলির মত নিচে ঝুলে পড়েছে। কিছু বের করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

পেছনের আসনে বসে যাঁরা নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, এই সময় একটা বাচ্চা ছেলে পেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সিটের তলায় ঢুকে পকেটটা কোনও রকমে ক্লিয়ার করে দিলেই অল-ক্লিয়ার হয়ে যেত।

তাঁর পাশের ভদ্রলোক খুব ভারিক্কি চালে, চোখ বোজানো অবস্থাতেই বললেন, বি প্র্যাকটিক্যাল, বি প্র্যাকটিক্যাল! বিশ মণ তেল পুড়লে তবেই রাধা নাচবে, এই সব শর্তেই জাতটা আজ কোথাও আর পাত্তা পাচ্ছে না। বোম্বে, বিহার, আসাম, দার্জিলিং, কিক্‌ড আউট। কিকড্‌ আউট ফ্রম এভরিহোয়্যার। মোস্ট ইমপ্র্যাকটিক্যাল, ফুলিশ জাত।

ফুলিশের কী হল? ফুলিশের কী দেখলেন? একেবারে জাত তুলে কথা! ডু ইউ নো, মাই ফাদার ওয়াজ এ ইঞ্জিনিয়ার!

এ ইঞ্জিনিয়ার নয়, অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। ভাওয়েলের আগে অ্যান হয়।

ইংরিজী আমাকে শেখাতে আসবেন না। দু'রকমের ইংরিজী আছে, ডু ইউ নো? অ্যামেরিকান ইংলিশ আর ইংলিশ ইংলিশ। অ্যামেরিকান ইংলিশে কোনও গ্রামার নেই। একমাত্র বাঙালীরাই গ্রামার গ্রামার করে মরল। গ্রামারে যে কোনও ভাষা ডিসব্যালেন্‌ড হয়ে যায়। নতুন সাইকিস্টের সাইকেল চালানোর মত।

অ, জানা ছিল না। পাকা ইংরিজীর গ্রামার নেই? অতি উত্তম। চতুর্দিকেই যখন অরাজকতা চলেছে তখন ভাষাতেই বা চলবে না কেন?

মডার্ন ইংলিশে ভার্ব নেই। ভার্ব নেই বলে টেন্‌সও নেই। আর্টিক্‌ল নেই। প্রিপোজিশান নেই। বিদ্রোহ মশাই বিদ্রোহ! রেভলিউশান!

কী আছে তাহলে?

শুধু ওয়ার্ড। শব্দ। শব্দ।

তার মানে পুরোপুরি বাঙালী। যে জাতের কোনও ক্রিয়া নেই, নিষ্ক্রিয়। কোনও কাল নেই। অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। বাঃ, ভালই হয়েছে!

বীরেন ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, একটা ছুরি কী ব্লেড পেলে পকেটটা কেটে ফেলতুম। ওইটাই একমাত্র রাস্তা। মেডিসিনে কিছু হচ্ছে না, সার্জারি করতে হবে।

দাঁড়িয়ে থাকা যে দু'জন ভদ্রলোক বসার আশায় পরস্পর লড়ছিলেন, বসার আর কোনও আশা নেই দেখে তাঁদের মধ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। তাঁদেরই একজন বললেন, পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলুন না! এই দুর্দিনে পাঞ্জাবি কেউ পরে? পাঞ্জাবিজ আর ফর ওনলি ওয়ান নাইট। পাঞ্জাবি অ্যান্ড টোপর।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বললেন, এই ধুতি আর পাঞ্জাবি জাতটাকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট ধরে কোনও রকমে বেঁচে গেল। এই তো সেদিন আমার বসের ছেলের বিয়ে হল। নো ধুতি-পাঞ্জাবি! প্যান্‌ট্‌, কোট, টাই, বুট। আর বউ-এর কী সাজ!

জিন্স, হাফশার্ট। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার এসে স্যাট স্যাট সেরে দিলে। নব দম্পতি মোটরবাইক চেপে ফট ফট করে হনিমুনে চলে গেল। হাউ নাইস! হোয়াট এ লাইফ!

ভদ্রলোক উত্তেজনায় রড ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভারসাম্য হারিয়ে পাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ছিলেন। তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন, ভালো করে ধরে দাঁড়ান। এই নিয়ে বারপাঁচেক ঘাড়ে পড়লেন।

অসুবিধে হলে ট্যাক্সি করে যান।

ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিন।

ট্যাক্সি ভাড়া দেবার ক্ষমতা থাকলে নিজেই তো ট্যাক্সি করে যেতুম।

পেছন দিক থেকে বাজখাঁই গলায় কে একজন বললেন, দুটোকেই ঘাড় ধরে নামিয়ে দিন। হুলো বেড়ালের মতো ঝগড়া করছে তখন থেকে।

আচ্ছা, এই পনের কুড়ি মিনিট ঝগড়া না করে একটু শান্তিতে যাওয়া যায় না? রোজ, রোজ, এভরি-ডে যেতে আসতে চুলোচুলি!

তা না হলে বাঙালী হয়ে মরেছে কেন!

বীরেন অসহায়ের মত ভাবতে লাগল, পাঞ্জাবিতে মানুষ ঢোকে কত সহজে, অথচ প্রয়োজনে বেরোতে চাইলে বেরোবার উপায় নেই। একেবারে অসহায়! না খুলে বেরোবার যদি উপায় থাকত! তলা দিয়ে খুস্ করে গলে বেরিয়ে গেলুম, আমের আঁটির মত।

বাস অফিসপাড়ায় ঢুকে পড়েছে। যাত্রীরা টুপ্‌টাপ সব খসে পড়ছেন। বীরেনের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি উঠতে উঠতে বললেন, এমন ফাঁদেও মানুষ পড়ে! এ যেন সেই কথামালার বাঁদরের গল্প। বাঁশ চিরে গোঁজ পুরে রেখে গিয়েছিল ঘরামিরা। বাঁদর কেরামতি করতে গিয়ে গোঁজ খুলে ফেলল, চেরা বাঁশের মাঝখানে ন্যাজ গেল আটকে।

মুচকি হেসে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগোলেন।

বীরেনের একবার মনে হল প্রতিবাদ করে। বাঁদরের উপমা আসে কী করে। পরমুহূর্তেই মনে হল, অনর্থক কথা খরচ করার মানে হয় না। আজকালকার মানুষ কিছু না ভেবেই দুম্‌দাম্ কথা বলে। কিসের কী মানে হয় ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না।

বহু লোক নিজের ছেলেকেই শুয়োরের বাচ্চা বলে গালাগাল দেয়।

বাস ধর্মতলার গুমটিতে এসে ঢুকল। সমস্ত যাত্রী নেমে গেছে। কণ্ডাকটার কোলে ব্যাগ নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছেন। বীরেন করুণ সুরে বললে, কী করা যায় বলুন তো?

মুখ না তুলে টাকা গুনতে গুনতে কণ্ডাকটার বললেন, কী হল?

সিটের খাঁজে পাঞ্জাবির পকেট ঢুকে গেছে। বেরোচ্ছে না কিছুতেই।

দাঁড়ান দেখছি।

মানুষটির মেজাজ ভালো। যৌবন চলে গেলে মানুষ একটু ঝিমিয়ে পড়ে। জীবনটাকে বুঝতে শিখলে সহজে দুর্ব্যবহার করা যায় না। ব্যাগের খাঁজে পাট করা নোট ভরে উঠে এলেন।

কই দেখি কী হয়েছে? অ, এই ব্যাপার! দেখি পেছনটা একটু তুলুন।

বীরেন একটু উঠতেই তিনি গদিটাকে একটু টেনে নিলেন। পকেট খুলে গেল। বীরেন মুক্ত। এতক্ষণ যেন কারাবাসের অভিজ্ঞতা হল। একগাল হেসে বলল, সেই বিডন স্ট্রিটে আমার নামার কথা।

আমাকে ডাকলেন না কেন? এ তো সামান্য ব্যাপার! এর চেয়ে কত বড় বড় ব্যাপার হয়ে যায়! সেদিন এক ভদ্রমহিলার কানের দুল জানলার খাঁজের মধ্যে দিয়ে বাসের বডিতে ঢুকে গেল।

তারপর?

সে দুল এখনও ঢুকেই আছে। ভদ্রমহিলার ঠিকানা নিয়ে রেখেছি। বাসের বডি যখন খোলা হবে তখন দুল পাওয়া গেলে ফেরত দেওয়া হবে।

কবে খোলা হবে?

দু'দশ বছর পরে, যখন একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে।

মানুষটিকে বীরেনের ভীষণ ভালো লেগে গেল। সংসার সারা মুখে কর্কশ হাত বুলিয়ে একটা রুক্ষতা এনেছে। কপালের ভাঁজে ভাঁজে জীবনের ঢেউ খেলছে। বীরেন পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে সামনে এগিয়ে ধরল। পাঞ্জাবির পকেট আটকে গিয়েছিল

লাইটারের জন্যে। ভালোবাসার উপহার। সেই লাইটার জেবলে সিগারেটে আগ্নুন ধরিয়ে দিল।

কণ্ডাক্টার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, যাবেন কোথায় ?

বিডন স্ট্রিট।

এই গাড়িতেই যেতে পারেন। তবে কখন ছাড়বে জানি না।

উঠোনের এক পাশ দিয়ে একটা নারকেল গাছ সামান্য একটু বেঁকে হুশ করে আকাশের দিকে উঠে গেছে। নীল আকাশ ছোঁয়ার আনন্দে শত শত আঙুলের নৃত্যভঙ্গিমা। চিল উড়ছে ঘুড়ির মত পাকে পাকে, উদ্দেশ্যহীন। গোটাকতক কাক ডাকছে কর্কশ সুরে। যে ডাক শুনলেই মনে হয়, গেরস্থের দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে। চোখ জড়িয়ে আসছে গ্রীষ্মের নিদাঘ-ঘুমে।

পরিষ্কার তকতকে উঠোন। চারপাশে বারান্দা। আলোছায়া ঘেরা ঘরের সারি। তিনটে ঘরে বড় বড় তালা ঝুলছে। একটা ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতর থেকে খুব মৃদু খুটুর খুটুর আওয়াজ আসছে। নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ দুপুরে সেই সামান্য আওয়াজই বেশ কানে লাগে। দূরে কোথাও রেডিও হিন্দি গান ধরেছে। দরজার বাইরে একজোড়া লেডিজ স্লিপার হতাশ হয়ে পড়ে আছে। দুপুরের ফিকে বাতাসে বাহারী পর্দা মৃদু মৃদু দুলছে।

বীরেন জুতোর শব্দ না করে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের ভেতর সাবেক আমলের বিশাল খাটে কনুইয়ের ওপর শরীরের ভর রেখে করুণা আধশোয়া। সামনে লুডোর ছক। দুপাশে ঘুটি সাজানো। মুখ নিচু করে আপন মনে ছক নাড়ছে। টিকোলো নাকের ডগায় নাকছাবি চিকমিক করছে। যে পাশে কাত হয়ে আছে সেই পাশের কানের দুল খুশিতে ডগমগ করছে। হালকা নীল রঙের ফিনফিনে শাড়ি। নীল ব্লাউজ। অন্ধকার-অন্ধকার ঘরে মা লক্ষ্মী যেন কড়ি খেলছেন। বীরেন সম্বিত প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। এমন একটা ভাঙাচোরা রুক্ষ শহরে এমন মোলায়েম দৃশ্য ভাবা যায় না। মনে মনে দেবী নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন। আসার কথা বেলা এগারোটায়, এখন বাজছে একটা পনেরো।

পিঠে মৃদু হাতের স্পর্শে বীরেন চমকে উঠেছিল। পর্দার আড়াল

থেকে চুপি চুপি মনোরম দৃশ্য দেখার অপরাধ ধরা পড়ে গেছে। পেছনে করুণার পিতা সুশোভনবাবু। বাঁ হাতে এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই। সারামুখে শিশুর মত দুষ্টুমি ভরা হাসি। প্রৌঢ়, গৌরবর্ণ, সৌম্যদর্শন মানুষ। লুঙ্গি অথবা পাজামা পরা পছন্দ করেন না। কোঁচানো, কালোপাড় ধুতি, গোল গলা পুরো হাতা ধবধবে গেঞ্জি। কাঁধের কাছে চেয়ে আছে পইতে।

হাসতে হাসতে বললেন, ধরা পড়িয়া গিয়াছ। ভিতরে ঢুকিও না, অম্ল-মধুর বাক্য শুনিতে হইবে।

করুণা ভেতর থেকে বললে, উঃ, কখন তুমি সিগারেট আনতে গেছ! গেছ তো গেছই। তৈরি করে আনলে নাকি?

সেই রকমই অবস্থা। খুচরো সমস্যা। কলকাতার কোথাও খুচরো নেই। এই দ্যাখ কাকে ধরেছি। কট রেড-হ্যাণ্ডেড। পর্দার এপাশে চুপটি করে চোরের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলো। ভেতরে আসার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভেতরে যে চলে এসেছে!

আবার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখো এসো। বাইরের জিনিস বাইরে থাকাই ভালো।

বাইরের জিনিস কী রে, ও যে আমার অন্তরের জিনিস!

তুমি তাহলে ওনাকে অন্তরে নিয়ে ভেতরে বোসো। আমি বাইরে যাই।

তুমিও যে মা আমার অন্তরের জিনিস।

তোমার অন্তর কত বড় বাবা? এত বড় বড় দুটো জিনিস ঢুকবে কী করে?

অন্তরে কী স্থানের অভাব হয় মা! ইনফাইনাইট স্পেস।

বীরেন আমতা আমতা করে বললে, আমি এগারোটাতেই আসতুম করুণা, কিন্তু কী হল জানো—

আমার জানার দরকার নেই। ওসব বানানো গল্প যে বিশ্বাস করে সে করুক। আমি ওসব শুনতে চাই না। এই নাও তোমার টিকিট। নুন-শোয়ের নিকুচি করেছে!

তালগোল পাকানো হলদে রঙের দুটো কাগজ মেঝেতে এসে পড়ল।

সুশোভন বললেন, অ, তোমাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল বুঝি? তাই এত ক্রোধ! কিন্তু অপরাধীকে সাজা দেবার আগে বিচারের ব্যবস্থা সভ্য জগতের নিয়ম। অতএব গল্টা শোনা যাক। বীরেন তুমি বোসো।

করুণা বললে, আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, ও খাটে বসলে আমি কিন্তু নেমে যাবো।

বাইবেল কী বলছেন জানিস মা, হেট দি সিন নট দি সিনার।

আমি খ্রীশ্চান নই, হিন্দু। আমার বাইবেল হল, যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তাদের সঙ্গে একাসনে বসা উচিত নয়।

বাবা বীরেন, তুমি তাহলে মুখোমুখি ওই সোফাটায় বোসো।

বীরেন সোফায় বসল। তার মানসম্মান-জ্ঞান তেমন টনটনে নয়। শরীরে রাগ নেই বললেই চলে। দুঃখেও হাসে, সুখেও হাসে। বাবার মৃত্যুর পর বড় ভাই দূর করে দেবার পরেও ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়মিত খবর নেয়। তখন বউদি তার ওপর যে অবিচার হয়েছে, সে কথা বারে বারে বলেন। দুঃখ প্রকাশ করেন। আসলে পৃথিবীটাই এই রকম। কোথাও কোনও বিচার নেই। বীরেন ভাবে আর হাসে। বউদির বাবাকে তাঁর দাদা ঘর-ছাড়া করেছিলেন। বিষয়ী মানুষ সন্ন্যাসী হতে পারে না। আর যেখানেই বিষয়, সেইখানেই লোভ, অবিচার, বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা। সেই রামকৃষ্ণের উপদেশ, চিল মাংসখণ্ড মুখে নিয়ে উড়ছে। একঝাঁক কাক অনবরতই ঠোকরাতে ঠোকরাতে আসছে। চিল বিরক্ত হয়ে মাংসের টুকরোটা যেই ফেলে দিলে অমনি শান্তি। বউদির দুঃখ দেখে বীরেন মজা পায়। যার কোনও দুঃখ নেই, তার জন্যে অহেতুক দুঃখ কেন! আসলে অন্যের দুঃখ নিয়ে দুঃখ করা এই পৃথিবীর অনেক কালের প্রথা।

হ্যাঁ বলো, তোমার পাঞ্জাবির গল্পটা শোনা যাক। তুমি কিছু খাবে? জল, সরবত, চা, কফি?

না, এখন আর কিছু খাবো না।

তা হলে গল্প।

গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আপনিও গল্প বলছেন?

আহা, একটা ঘটনা যখন ঘটে তখন ঘটনা, পরে সেইটাই হয়ে যায় গল্প। বর্তমান অতীতে চলে গেলেই কাহিনী। এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নেই।

বীরেন এতক্ষণ চেয়ারের পেছনে পিঠ রাখেনি। এইবার একটু আরাম করে বসল। করুণা শুয়ে পড়েছে। লুডোর ছক ঘুঁটি গড়াগড়ি যাচ্ছে একপাশে।

বিডন স্ট্রিটে নামবো বলে সিট থেকে যেই উঠতে যাচ্ছি, পাঞ্জাবির পকেটে খচাং করে টান পড়ল। করুণা কুক করে হাসল। বীরেনের গল্প থেমে গেল। সুশোভন বললেন, হাসির কী হল?

শুরুতেই গলদ। অফিস-টাইমের বাসে সিট থাকে না।

সে আবার কী? সিটগুলো তাহলে যায় কোথায়?

কিছু ভাগ্যবানের দখলে থাকে। বাকি সবাই দাঁড়িয়ে গুঁতোগুঁতি করে।

বীরেন বললে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিলুম বলে আজ আমি স্ট্যান্ড থেকে উঠে জানলার ধারে বসেছিলুম।

করুণা বললে, তাহলে সত্যি কথাটা হল এই, ফুরফুরে বাতাসে নিদ্রাকর্ষণ, টার্মিনাসে গিয়ে খোঁচা খেয়ে অবতরণ। পুনঃ বাসে আরোহণ। পুনরায় নিদ্রা, আবার বিপরীত টার্মিনাসে খোঁচা খেয়ে পতন। আবার আরোহণ। মাতৃজঠরে পুনঃ পুনঃ গতাগতি, অবশেষে শুভ যোগে বিডন স্ট্রিটে ভূমিষ্ঠ।

বীরেন হাঁ করে সুশোভনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

সুশোভন বললেন, ঘাবড়ে যেও না বাবা, আদালতে বিরোধী পক্ষের উকিল এই ভাবেই আসামীকে সত্যভ্রষ্ট করতে চান। জেনে রাখো, ট্রুথ ইজ ট্রুথ। তুমি বলে যাও।

খ্যাচাং করে পকেটে টান পড়তেই আবার বসে পড়লুম। পকেটে একগাদা খুচরো পয়সা ছিল।

করুণা বললে, অবিশ্বাস, অবিশ্বাস, আবার অবিশ্বাস। এখন খুচরোর ক্রাইসিস চলেছে। কারুর পকেটে এখন অ্যাতো খুচরো থাকতে পারে না, যে পকেট ঝুলে পড়বে!

বীরেন ধড়ফড় করে বললে, অন গড, পকেটে অনেক খুচরো ছিল। আমি জমিয়েছিলুম।

সুশোভন বললেন, তুমি অতীত কালে কথা বলছ কেন? ছিল কেন? সে খুচরো এখনও থাকা উচিত। তুমি অবিশ্বাসীকে দেখিয়ে দাও। সব খুচরো বের করে টেবিলে রাখো।

বীরেন সমস্ত খুচরো টেবিলে রাখল। একটাকা পঞ্চাশ পয়সা, একগাদা দশ পয়সা।

আচ্ছা দেখে নেওয়া হোক, আসামী সত্য বলছে, না মিথ্যা বলছে!

আসামীকে বলা হোক, দশ পয়সাগুলো পকেটে পুরে বাকি সব আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ে ফেলে দিতে।

বাঃ, ভালো নির্দেশ! ও বেচারা কত কষ্টে যোগাড় করেছে, তোর ভাঁড়ে ফেলে শুকিয়ে মরুক।

অত কাঁচা পয়সা বাচ্চা ছেলের পকেটে থাকা ঠিক নয়। আবার পকেট আটকে যাবে। সারাজীবন বাসেই বসে থাকতে হবে। যাবজ্জীবন আসামীর মত।

তা তুমি মুক্তি পেলে কী ভাবে?

টার্মিনাসে যেতে হল। সেখানে সিটের গদি সরিয়ে কণ্ডাক্টারের সাহায্যে ছাড়া পেলুম।

উঃ, বড় তকলিফ গেছে তাহলে! এখন এক গেলাস ঠাণ্ডা কিছু খাওয়া উচিত।

সুশোভন উঠতে যাচ্ছিলেন। করুণা বললে, বোসো, তোমাকে আর উঠতে হবে না। আমি করে আনছি।

তুই যে একটু কৃপণ আছিস মা। গেলাসে স্কোয়াশ ফেলবি আই-ড্রপসের মাত্রায়, তারপর চিনি দিবি কী দিবি না!

তুমি তো বলবেই। আবার বোতল তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে বলবে, কোনও কিছুই তুই ম্যানেজ করতে পারিস না!

বেশ, আজকে বীরেনের অনারে একটু মানুষের মতো করে বানাস!

কেন? বীরেনচন্দ্রবাবু কী এমন পীর?

তুই আজকাল ভীষণ ঝগড়াকুটে হয়ে যাচ্ছিস!

যে যেমন, তার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার। জগৎটা হল আরশিতে মুখ দেখা।

ও কথা বলিস নি। বীরেনের মত ছেলে হয় না। অমন ছেলে লাখোঁমে এক।

আর আমার মত মেয়ে?

সেও লাখোঁমে এক।

করুণা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পাশের ঘরে চলে গেল। সুশোভন হাসতে হাসতে বললেন, জীবন কত সুন্দর বীরেন! সুখে থাকবো, আনন্দে থাকবো মনে করলে থাকা যায়। মানুষ এমন আজব জীব, অশান্তি ছাড়া বাঁচতে পারে না। অশান্তি যেন ভিটামিন! মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ, প্রকৃতি নয়, বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়। আমি এ বেশ আছি বীরেন। বেশ আছি। যা চলে যায়, যারা চলে যায়, তারা সব স্মৃতিতে স্থান পায়। স্মৃতির চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর কী আছে! মনের সেফ ডিপজিট ভল্ট! কারুর ক্ষমতা নেই কেড়ে নেয়! মূল্যবান পাথরের মত এক-একটি তুলে নাও, নাড়াচাড়া কর, তারপর আবার রেখে দাও। অনেক ছুটেছি বীরেন। অর্থের পেছনে, বিত্তের পেছনে, রূপের পেছনে, যৌবনের পেছনে। কিছু পেলুম, কিছু পেলুম না, কিছু পেয়ে হারালুম। এখনও আমার পায়ে ছোটা আছে, কিন্তু মনে নেই। আমার মন মজেছে অন্য রসে। আমি অরূপ-রতন পাবার আশায় বসে আছি। তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো।

এ আপনি কী বলছেন! আমি আপনার ছেলের মতো।

ছেলের মতো কী গো! তুমি তো আমার ছেলেই। ভুলে যেও না মুখাগ্নি তোমাকেই করতে হবে।

যান, আমি আপনার ওই সব দুঃখের কথা শুনতে চাই না।

বোকা ছেলে, দুঃখেই তো সবচেয়ে বেশী আনন্দ। মন মুচড়ে, চোখ নিংড়ে যত জল বেরোবে ততই ভেতরটা ভরা নদীর মত ভরে যাবে।

আমি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, দুঃখকে একবারও চরম আনন্দ বলে মনে হয়নি।

মনে হয়নি? কেন মনে হয়নি জানো? সে-সব দুঃখের কোনও-টাই দুঃখের মত দুঃখ ছিল না! সে-সব ছিল কষ্ট। আমরা বলি না, দুঃখ-কষ্ট? কষ্টটাকে ফেলে দাও, এইবার দুঃখের কারবারে এসো। আঃ, তোফা জিনিস। কষ্ট হল দেহের জিনিস আর দুঃখ হল মনের। সেই রাতটার কথা মনে করো বীরেন। আমার দু'হাতের ওপর শোয়ানো কাপড়ে জড়ানো আমার তিনবছরের সন্তানের মৃতদেহ। কলকাতার রাজপথ ধরে আমি হেঁটে চলেছি ধীরে ধীরে। জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। অবিস্মরণীয় দুঃখ। জীবনে রাত তো ফিরে ফিরে

আসবেই। চিতা জ্বলেছিল, চিতা নিবে গেছে। সে তো বাইরের চিতা। ভেতরের চিতা অনবরতই জ্বলছে। দেখা যায় না, কিন্তু জ্বলছেই। জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক গভীর, গম্ভীর। জীবনের তল পাওয়া যায়, মৃত্যুর তল পাওয়া যায় না। রহস্যময়, অন্ধকার পথ। একা যাত্রী। কই, সুখের স্মৃতি তো তেমন মনে নেই, যেমন মনে আছে দুঃখের স্মৃতি! জীবনের মধ্যপথে করুণার মা হঠাৎ চলে গেল। বীরেন, সে কী যাওয়া? সে যে আরও কাছে আসা। করুণার মুখে ওর মায়ের মুখটি একেবারে কেটে বসানো। সেই নাক, সেই চোখ, সেই হাসি। হাসলেই গালে সেই একই টোল। সেই এক স্বভাব। ওকে দেখি আর ওর মায়ের অভাব মনে দগদগ করে ওঠে। সে আজ নেই বলেই আরও বেশী করে আছে।

করুণা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, তোমার সেই এক কথা। জীবন মৃত্যু, মৃত্যু জীবন। ভালো লাগে না বাপু। এবার নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবো।

সুশোভন বললেন, পাগল নয়, পাগলী।

ওই হোলো। আমার লিঙ্গ-জ্ঞান হারিয়ে গেছে।

বীরেন বললে, গরমে ঠাণ্ডা খাবো, গলা ধরে যাবে না তো?

করুণা বললে, হ্যাঁ, তাও তো বটে, রাতে আবার গানের জলসা আছে তো? ওস্তাদ বীরেনুদ্দিন খাঁ সায়েবের খেয়াল!

ঠাট্টা করার কী আছে, আমি খুব একটা খারাপ গাই না।

তা ঠিক, তবে আসর থেকে লোক উঠে চলে যায়!

সে আমার গানের বা গলার দোষ নয়, যুগের দোষ। মানুষের এমন টেস্ট হয়েছে!

সুশোভন বললেন, ভালগার, চিপ। হইহই, রইরই, চিৎকার, চেঁচামেচি। যাক অনেক বাজে বকেছি, এইবার কিছু বিষয়ের কথা হোক। বীরেন, তুমি কয়েকদিন ছুটি পাবে?

আমি তো ছুটিতেই আছি। এক মাস। আজ হল প্রথম দিন।

ভেরি গুড! তাহলে চলো, দিনকতক দেরাদুন ঘুরে আসি।

হঠাৎ দেরাদুনে! এখন তো ভীষণ গরম হবে।

না না, কী এমন গরম! দু'হাত দূরে হরিদ্বার। মাথার ওপর মুসৌরী। দু'কদম হাঁটলে বদরীনাথ, কেদারনাথ।

আমরা কী বেড়াতেই যাবো ?

বেড়ানোও বলতে পারো, আবার রথ দেখা কলা বেচাও বলতে পারো। ব্যাপারটা তোমাকে তাহলে খুলেই বলি। আমার মাথায় আবার একটা আইডিয়া এসেছে।

আবার আইডিয়া ? আইডিয়া মানেই তো কিছু টাকা নষ্ট !

তুমিও বেসুরো গাইছ বীরেন্দ্রনাথ ! আমার কখনও কোনও আইডিয়া ফেল করেনি। ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান সাকসেসফুল। যেটা ফেল করেছে, তা হল আমার অনেস্টি। সেন্টপারসেন্ট অনেস্ট হতে গিয়ে আমি ধীরে ধীরে ডুবে গেছি। অপরে আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে সরে পড়েছে।

এবারেও তো সেই একই ব্যাপার হবে !

না, এবারে তা হবে না, হতে দোব না। এবারে আর মানুষ নিয়ে কারবার নয়। এবারে গাছ। জানবে গাছই হল মানুষের একমাত্র বন্ধু। গাছ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

গাছ নিয়ে কারবার মানে ? জঙ্গলে যাবেন ? দেরাদুনে অনেক ফরেস্ট আছে !

ঠিক জঙ্গল নয়, তবে জঙ্গলের মতই। ওখানে আমি একটা আপেল বাগান আর লিচু বাগান কিনব। এই শহরে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। টায়ার্ড অফ ইট ! এখানে থাকা মানেই পুরনো সব বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া। আই ডিসলাইক দেম মোস্ট ! বাজে কথা, পরচর্চা, কাপ কাপ চা, প্লেট প্লেট জলখাবার ধ্বংস। ওয়েস্ট অফ টাইম, এনার্জি অ্যান্ড মানি। আমার বিপদে কোনও দিন এরা আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। অকারণে শত্রুতা করেছে। আবার নিজেদের স্বার্থে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দাঁত বের করে। আমি অপ্রিয় সত্য বলতে পারি না, সেই অ্যাডভান্টেজটা সকলে নেয়।

করুণা বললে, তোমার পরিকল্পনাটা ভারি সুন্দর। ইউনিক। শুনেই আমার ভালো লাগছে। চারপাশে পাহাড়। একটু দূরেই হিমালয়। এদিকে আপেল আর লিচু বাগান।

শুধু আপেল আর লিচু নয়, সঙ্গে চেরি।

চেরি ! সেই লাল-লাল, মিষ্টি-মিষ্টি। উঃ, ওয়ান্ডারফুল ! আনন্দে করুণার চোখ বুজে এলো।

বীরেন বললে, এর ব্যবসায়িক কোনও দিক আছে ?

অফ কোর্স ! অবশ্যই আছে। আপেল, লিচু আর চেরি পেটি পেটি সাপ্লাই যাবে সমতলের বাজারে।

গুড বিজনেস ! রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসাররা বহু অরচার্ড করেছে ওখানে। এ আইডিয়াটা আমার আজকের নয়। বহুদিন মাথায় ঘুরছে। আমার এক আর্মি অফিসার বন্ধু বহুকাল আগে বলেছিল। রিটায়ার করার পর সে ওখানে বসে পড়েছে। অ্যান্ড হি ইজ সাকসেসফুল ! মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। চিঠি পড়ি আর মনে মনে ছটফট করি। দ্যাখো বীরেন, বাঁধা মাইনের চাকরির মোহে জীবনটাকে স্ট্যাগন্যাণ্ট করে ফেলো না। জীবনে ভ্যারাইটি আনার চেষ্টা করো। খাঁচার পাখি দানাপানি পায়, নিরাপত্তা পায়, আকাশের স্বাধীনতা পায় না। ভালো বাঁধা মাইনের চাকরি চেষ্টা করলে আমিও পেতুম।

এই বয়েসে বিদেশে নতুন কিছু করতে যাওয়ার অনেক ঝুঁকি আছে না !

তুমি তো আছো বীরেন। তুমি হবে আমার ডান হাত।

করুণা বললে, ও হবে তোমার ভাঙা হাত। আপেলতলায় ঘুমিয়ে পড়বে। মাল নিয়ে বিডন স্ট্রিট যেতে সিটে পকেট বাধিয়ে ধর্মতলা চলে যাবে।

বীরেন বললে, তুমি আমাকে কী ভাবো বলো তো ! জানো একসময় আমি ছাগলের ব্যবসা করতুম ?

কোন্ সময়ে ? এখন বয়েস কতো ?

সেই ছাগলের পয়সায় আমি বি.-এ. করি, বুঝলে ?

বিয়ে ? তোমার বিয়ে হয়ে গেছে ?

বিবাহ নয়, বিবাহ নয়, বি. এ. পাস !

তাই তোমার বিদ্যেটা যেন কেমন কেমন !

আজ্ঞে না। বিদ্যেটা আমার ভালোই। পরীক্ষা করে দেখতে পারো। ছেলে আমি খারাপ ছিলুম না। তবে একটু বোকা বোকা। তেমন চালাকচতুর নই।

সুশোভন বললেন, বোকা হওয়াই ভালো। চালাক হয়ে দরকার নেই। তোমার ছাগলের ব্যবসাটা আমাকে বলো নি তো !

ওঃ, সে খুব ইন্টারেস্টিং !

ছাগল-দুধ ?

দুধও ছিল, আবার পাঁঠাও ছিল। তখন আমি গ্রামে। দেবানন্দপুরে স্কুলমাস্টার। সামান্য মাইনে। স্কুলের গেমটিচার তারকবাবু ছিলেন অসম্ভব করিতকর্মা। মাথায় নানা বুদ্ধি, ফান্দিফিকির খেলত। তিনি একদিন বললেন, মানুষ-পাঁঠা চরিয়ে তো পেট ভরছে না মশাই ! কিছু তো একটা করতে হয় ! ভাবছি রিয়েল পাঁঠাই এবার চরাবো। ব্যাঙ্ক-লোন নিয়ে শুরু হল আমাদের ব্ল্যাক-বেঙ্গলের চাষ।

ব্ল্যাক-বেঙ্গল কী বস্তু ?

ছাগলকে ব্যাঙ্কের ভাষায় বলে, ব্ল্যাক-বেঙ্গল। সংখ্যায় হুহু করে বাড়ে। খায় কম। জল তেমন চায় না। বেশ লাভের ব্যবসা।

তা ছাড়লে কেন ?

রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন দেখে। চোখ বুজলেই পাল পাল ছাগল স্বপ্নে তাড়া করত। বিশাল একটা রামছাগল বুকে চেপে মুখের কাছে দাড়িঅলা মুখ এনে ফ্যাফ্যা করে নিঃশ্বাস ফেলত। রাতের পর রাত কেন এমন হয় ? শেষে এক সন্ন্যাসী বললেন, যত ছাগল তুমি বেচেছ, তাদের মৃত আত্মা রাতে তোমাকে তেড়ে আসে। তুমি পাপ করছ—পাপ ! জীব-হত্যার কারণ হওয়া তোমার ধর্মে সইবে না। ভয়ে সেই লাভের ব্যবসা ছেড়ে দিলুম।

আরে তোমার সঙ্গে দেখছি আমার ভীষণ মিল। আমি একবার পোলট্রি করেছিলুম। ব্রয়লারের ব্যবসা। বড় করো আর বেচে দাও। বছরখানেক বেশ চলল। তারপরই শুরু হল দুঃস্বপ্ন। চোখ বুজোই, ঘুম আসে। লাখ লাখ মুরগীর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসি। সে এক মহা জ্বালাতন। ব্যাস, ব্যবসা খতম। আপেল বা লিচুতে সে ভয় নেই। কী বলো ?

না, সে ভয় নেই। আপেল আর লিচুতে তো জীবন নেই। আর স্বপ্নে যদি লিচু আর আপেল আসে, মন্দ কী ? পাঁঠা আর মুরগীর মত ডেকে জ্বালাবে না !

হ্যাঁ, তা যা বলেছ। আচ্ছা, আমার পরিকল্পনা কিন্তু পাকা। সামনের সপ্তাহেই বেরোতে চাই। দ্যাখো, বসে বসে খাওয়া ঠিক নয়। শরীরে জং ধরে যাবে। তাছাড়া কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ।

এখনও অথর্ব হয়ে যাই নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নেই লীন হয়ে গেলে মন্দ হবে না বীরেন। জীবন তো এক ধরনের খেলা। পুতুল খেলা। সময়টাই যা একটু দীর্ঘ। এসব কোনও কিছুর কোনও মূল্য নেই। যা ফেলে যেতে হয়, যা নিয়ে যাওয়া যায় না, সারাজীবন সেই সব জিনিসের পেছনে কেন যে মানুষ পাগলের মত ছোটে! একটিমাত্র জিনিস যা আমার জীবন থেকে জীবনান্তরে বয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হল অনুভূতি। নাঃ, জ্ঞানের কথা অনেক হল, করুণার হাই উঠছে! তোমরা কী তাহলে সিনেমায় যাবে? ইভনিং শো?

বীরেন করুণার মুখের দিকে তাকাল।

করুণা বললে, যেতে পারি এক জায়গায়, তবে সিনেমায় নয়। রবীন্দ্রসদনে। আমরা তিনজনেই যাবো গান শুনতে।

সুশোভন বললেন, কার গান?

ক্ল্যাসিক্যাল। গিরিজা দেবী আর ভীমসেন যোশী।

টিকিট পাবি না।

খুব পাবো। এ হল মাসের যুগ, ক্লাসের যুগ শেষ হয়ে এসেছে। খেয়াল, ঠুংরি শোনার শ্রোতা কমে এসেছে।

হ্যাঁ, তা ঠিক। মানুষের উত্থান হচ্ছে, না পতন—গবেষণার বিষয়। আমি তাহলে ঝট করে দাড়িটা কামিয়ে নিই।

বীরেন বললে, আমি আর একবার চান করে নিই।

করুণা বললে, আমি ততক্ষণ একটা ঘুম দিয়ে নিই।

বীরেন বললে, অবেলায় ঘুম! মাথা ধরে যাবে!

ঘুমোলে মাথা ধরে, এমন কথা এই প্রথম শুনলুম।

সব কথাই মানুষ প্রথম শোনে, অভিজ্ঞতায় পুরনো হয়।

গ্রীষ্মের বিকেল। ফুরফুরে বাতাস। বড় মধুর। দ্বিপ্রহরের নিথর নিদ্রা থেকে শহর আবার জেগে উঠেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুশোভনের অতীত স্মৃতি জাগছে। জীবনের যা কিছু ভালো, তা কী এইভাবেই হারিয়ে যায়! ছাত্রজীবনে স্কটিশে যখন পড়তেন তখন বিকেলে রাস্তায় রাস্তায় জল পড়ত। সারাদিনের উত্তপ্ত পথ জলসিক্ত হয়ে একটা ভিজে ভিজে উত্তাপ ছাড়ত। সোঁদা সোঁদা এক ধরনের গন্ধে বাতাস ভরে যেত। নামজাদা সব সরবতের দোকান ছিল। ডাবের সরবত।

ঘোলের সরবত। আমপোড়ার সরবত। থলে জড়িয়ে কাঠের মুগুর মেরে বরফ ভাঙা হত। জমাট জলকন্যা চুড়ির শব্দে কুঁচো কুঁচো হত। তখন এত বোতল পানীয়ের চল ছিল না। ছিল সোডা-ওয়াটার আর আইসক্রিম সোডা। বেঁটে বেঁটে বোতলের গলায় গুলি আটকে থাকত।

সুশোভন সাজতে-গুজতে ভালবাসেন। রাস্তার পাশে ফুলবাবুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নাকে চাপা ধবধবে সাদা একটি রুমাল। খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে শহরের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। দমকা বাতাসে ধুলো উড়ছে। সাবধানী সুশোভন। হাঁপানি অথবা ক্যানসারে মরতে চান না। মৃত্যু হবে নিঃশব্দে। তীর থেকে একটি তরী যেন খুলে গেল। ওকাকুরা অথবা অবনীন্দ্রনাথের ছবির মত। টেনিসনের কবিতা যেন, অস্তসূর্যক্ষণে আকাশের গায়ে সাঁঝের তারাটি জ্বলে, স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কে যেন ডাকে—আয় চলে আয়, বড় নিস্তব্ধ চারপাশ, সমুদ্রেও ঢেউয়ের সাড়া নেই।

একবার বড় মরার বাসনা হয়েছিল। করুণার মায়ের মৃত্যুর পর। নিখুঁত পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছিলেন। সিল্কের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, গলায় ফুলের মালা চড়িয়ে, গায়ে আতর মেখে ঘুমের বড়ি খাবেন। সেতারে ইমনের আলাপ শুনতে শুনতে দিনের শেষে ঘুমের দেশে চলে যাবেন, ঘোমটাপরা ওই ছায়ার হাত ধরে। সে পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে করুণা। এত বড় একটা পৃথিবী, বিশাল বিশাল দাঁত মেলে আছে, সেই সাংঘাতিক পৃথিবীতে করুণাকে একা রেখে যাবেন কী করে! নরমাংস-ব্যবসায়ীরা রাতের অন্ধকারে দোকান সাজিয়ে বসে আছে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে হায়নার চিৎকার। প্রায় প্রতিটি চোখের দৃষ্টিতে ছুরি নাচছে। অধিকাংশ হাতই খুনীর হাত।

অসম্ভব রোমাণ্টিক সেই মৃত্যু-পরিকল্পনা মনে উঠে মনেই মিলিয়ে গেছে। এখন তিনি বাঁচতে চান। ভালভাবে বাঁচা। বাঁচার ব্যাপারে তিনি বিবেকানন্দের শিষ্য। স্বামীজীর সেই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন—দুখচেটে সংসারী হোস নে।

সুশোভন আড়চোখে করুণার দিকে তাকালেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সাজসজ্জার কোনও ঘটা নেই। তবু সুন্দরী। কবে কোন্ কালে সুশোভন বলেছিলেন, সুন্দরীদের সাজা উচিত নয়। স্বাভাবিক

সৌন্দর্যই সৌন্দর্য। পিতৃভক্ত মেয়ে অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ মেনে চলেছে। করুণার ঠোঁটে হাসি খেলছে।

হাসছিস কেন?

দ্যাখো না, একটা ট্যাক্সি ধরার জন্যে তখন থেকে কী ছোটাছুটি করছে! এই ছোটাটা ঈশ্বরের পেছনে ছুটলে এতক্ষণ পেয়ে যেত!

আমি তখনই বলেছিলুম, ট্যাক্সি তুমি পাবে না বীরেন। এর নাম শহর কলকাতা। রাজনীতি এ দেশ শেষ করে দিয়েছে। সভ্যতা-ভদ্রতা, আইন-কানুন কিছুই নেই। সব শেষ। যাই আমি, গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বের করি। বহুকাল স্টিয়ারিং-এ হাত দিইনি, তাই একটু ভয় পাচ্ছিলুম।

আর একটু অপেক্ষা করো না। দ্যাখো না কী হয়।

আর আমার ধৈর্য নেই। এ দেশে সময়ের কোনও দাম নেই। আমার সময়ের দাম আছে।

সুশোভন ইশারায় বীরেনকে ডাকলেন। বীরেন আর একটা ট্যাক্সি তাক করে ঝাঁপাবার চেষ্টায় ছিল। ফিরে এলো গলদঘর্ম হয়ে। করুণা বললে, কোনও কর্মের নয়। তখন থেকে শুধুই কত্থক নাচ হল! স্টেজ হলে তবু দুটো পয়সা পেতে।

হাতের তালুতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বীরেন বললে, মাস্তান কিংবা ছেনতাইবাজ না হলে এ শহরে আর বাঁচা যাবে না।

সুশোভন বললেন, ওই জন্যেই পালাতে চাইছি। সামথিং ইজ রটন ইন দি স্টেটস অফ ডেনমার্ক! তোমরা দাঁড়াও, আমি গাড়িটা বের করে আনি।

বহুকাল পরে সুশোভন গ্যারেজের তালায় নিজে চাবি ঢোকালেন। রোজ সকালে একটি ছেলে এসে গাড়ি ঝাড়পোঁছ করে। স্টার্ট দেয়। স্টার্ট বন্ধ করে। মাঝেমধ্যে ব্যাটারি চালু রাখার জন্যে এক পাক ঘুরিয়ে আনে। গাড়ির ঝোঁক এখন আর নেই। প্রয়োজনও নেই। গাঢ় নীল রঙের গাড়ির দিকে সুশোভন স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এই রঙ অরুণার ভীষণ প্রিয় ছিল। গাঢ় নীল, আকাশী নীল, ফিকে সবুজের দিকে বড় ঝোঁক ছিল জীবনসঙ্গিনীর। সুশোভনের নিজের প্রিয় রঙ হল ধূসর, চাঁপাফুলের রঙ, সরষে ফুলের রঙ।

গ্যারেজের চালে বেলা-শেষের দোয়েল জোর শিস দিচ্ছে। সুশোভনের মনে হল, কেউ থাকে কেউ চলে যায়। জীবনের এমন মজা একসঙ্গে শুরু করে একসঙ্গে শেষ করা যায় না। হাসতে হাসতে হাত ধরাধরি করে মঞ্চে ঢুকলুম, হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলুম, এমনটি হবার উপায় নেই। অসম্ভব সহ্যশক্তি না থাকলে পৃথিবী এক দুঃসহ জায়গা।

দরজায় চাবি পরাতে পরাতে গাড়ির পেছনের আসনে দৃষ্টি চলে গেল। সময় যেন শ্বেতপাথরের মত জমাট হয়ে আছে। অতীত যেন লুটিয়ে আছে আসনে ঝরা বকুলের মত। অরুণার বসার ভঙ্গিটি ছিল বড় অদ্ভুত। আলতো। যে কোনও একপাশে সামান্য হেলে। একটা হাত কোলে। একটা হাত পাশে। ফর্সা গোল গোল হাতে দু'গাছা চুড়ির ঝিলিক। ডানহাতের আঙুলে হীরের আংটি আলোর তীর ছুঁড়ছে। গাড়ি যখন দূরপাল্লায় যেত তখন কোনও শহরে, কোনও দোকানের সামনে ছোটার ক্ষণবিরতি হত। সুশোভন স্পষ্ট যেন দেখতে পেলেন, পেছনের জানলায় অরুণার উজ্জ্বল মুখ। কুচকুচে কালো চুলের ঢল কাঁধের ওপর। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সুশোভন এগিয়ে দিচ্ছেন হয় চায়ের গেলাস, না হয় একখিলি পান। স্মৃতি এক আজব বাক্স। সব—সবই সেখানে জমা থাকে মণিমুক্তোর মত। শেষ নিঃশ্বাসে ডালা খুলে যায়, তখন একে একে সব উড়ে যায় রঙবেরঙের পাখির মতো। ধীরে ধীরে চালকের আসনে উঠে বসে পেছন ফিরে একবার তাকালেন। অরুণা, তুমি আছো তো?

করুণা বীরেনকে বললে, তুমি গাড়ি চালানোটা শিখতে পারো! ভীতু কোথাকার!

যদি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়ি?

মাঝে মাঝে নস্যি নেবে।

সামনের আসনে বসে নস্যি নিলে হাওয়ায় উড়ে পেছনের আসনে তোমার চোখে পড়বে।

আমি তো তোমার পাশে বসব।

তখন আবার আড়চোখে তাকাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলব।

তোমার দেখি সবেতেই বিপদ। এগোলেও বিপদ, পেছলেও বিপদ।

সুশোভন পেছনের দরজার লক খুলে দিয়ে বললেন, নাও নাও উঠে পড়ো। দেরি করে ফেলেছি।

বীরেন বললে, আমি সামনে আপনার পাশে বসি।

বেশ চলে এসো।

সুশোভন গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, না হে, হাত এখনও নষ্ট হয়নি। ইঞ্জিনও বেশ সুরেই বলছে। জড়পদার্থ হলে কী হবে, বুঝেছে আমরা গান শুনতে যাচ্ছি।

করুণা পেছনে সুর ধরেছে। চারপাশ দিয়ে ঝাঁঝাঁ করে গাড়ি ছুটছে। কানফাটানো বৈদ্যুতিক হর্নের আওয়াজ। মাঝে মাঝে সুর হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে ভেসে উঠছে।

সুশোভন বীরেনকে জিজ্ঞেস করলেন, কী সুর ধরেছে বলো তো?

এই সময়ে যা ধরা উচিত—ইমন।

বড় সুন্দর সুর। আজকাল চলিত সুর আর কেউ গাইতে চায় না, কেন বলো তো?

পৃথিবী ক্রমশই খুব জটিল হয়ে আসছে তো। মনে হয় সেই কারণেই।

হুঁ, তা হতে পারে।

গাড়ি পার্ক স্ট্রিটে বাঁক নিল। করুণা জিজ্ঞেস করল, কী হল, এই রাস্তায় ঢুকলে?

দাঁড়া, কয়েক প্যাকেট বিলিতি সিগারেট আর এক শিশি ভালো পারফ্যুম কিনে নিই। বাদশাহী গান শুনতে যাচ্ছি, বাদশাহী মেজাজ চাই।

হলে ধূমপান নিষেধ, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ!

বাইরে তো বারণ নেই। ফুড়ুক ফুড়ুক বেরবো আর ফুস ফুস টেনে যাবো।

অনেককালের চেনা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন সুশোভন। সুশোভন গাড়ি থেকে নামতেই প্রবীণ দোকানদার মৃদু হেসে বললেন, আসুন, আসুন, অনেকদিন পরে। কেমন আছেন?

ভেরি ফাইন। সুপারফাইন। তুমি কেমন আছ আলি?

খোদার মেহেরবাণীতে চলে যাচ্ছে এক রকম। তবে আর বেশিদিন চলবে না।

কেন ?

দিনকাল খুব খারাপ। বিপ্লব এসে গেল।

বিপ্লব ? এ দেশে বিপ্লব ? বিপ্লবের জন্য মর‍্যাল স্ট্রেংথ চাই। চরিত্রহীনের দেশে বিপ্লব হয় না, হয় গদির লড়াই। তোমার চুল যে সব পেকে গেল আলি !

বয়েস তো কম হল না। একটা ছেলে থাকলে সব ছেড়েছুড়ে দেশে গিয়ে বসতুম।

তোমার ছেলের কোনও সন্ধান পেলে না ?

নাঃ, সে আর নেই। মনে হয় মেরেই ফেলেছে। এখন তো মানুষ আর কুত্তা এক হয়ে গেছে।

তা ঠিক। ছোরাছুরি, পাইপ, বোম। মানুষ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। কথায় কথায় ছুরি চালাতে হাত কাঁপে না।

তামাম দুনিয়ার একমাত্র অসুখ রাজনীতি। কোথাও শান্তি নেই। কোনওখানে শান্তি নেই।

যা যা কেনার কিনে সুশোভন গাড়িতে ফিরে এলেন। বীরেন আর করুণা ডুয়েটে ইমনের আলাপ চালিয়েছে। সুশোভন মনে মনে দুজনকে পাশাপাশি রেখে একটা ছবি তুলে ফেললেন। ফুল সাইজ এনলার্জও হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চমৎকার জুটি। সুশোভন আর অরুণার মতই আইডিয়্যাল পেয়ার। আচ্ছা. পৃথিবীর ভালো আর মন্দ পাল্লায় চাপালে কোন্ দিকটা ঝুলে পড়বে ? নাঃ, কোনও ধারণা নেই। অন্ধকারের কাছে আলো কী তাহলে পরাভূত ? তা কী করে হয় ? সভ্যতার ধর্মই তো এগিয়ে চলা। মানুষ কী তাহলে আবার অরণ্য-সভ্যতায় ফিরে যাবে ? এ কী বন্দুক নাকি ? ব্যাকফায়ার করছে ? রিকয়েল করছে ?

ভাবে তন্ময় সুশোভন আপনমনে গাড়ি স্টার্ট করলেন। বীরেন আর করুণার গান থেমে গেছে। জীবনের ওপর দিয়ে যত ঝড়ঝাপটাই যাক না কেন, সুশোভনের মুখের হাসিটি কেউ কোনও দিন মিলিয়ে যেতে দেখেনি। আজ এমন কী হল ? কী হতে পারে ? প্রশ্ন করার সাহস নেই।

সুশোভন গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছেন, বেঁচে থাকার কী মজা ! সবাই হাঁটছে। না জেনেই হাঁটছে। পথের পাশে সমান্তরাল রেখায়

চলে গেছে গভীর খাদ। যে যাচ্ছে সে বেশ যাচ্ছে। একটু পাশে সরলেই পতন। এমন জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না! এমন জানলে কে জন্মাত!

সুশোভন দূরে থেকে আবার কাছে ফিরে এলেন। গাড়ির ভেতরের জগতে।

এ কী, তোমরা এমন চুপচাপ কেন? চুপচাপ কেন, ধরো ধরো, সুর ধরো। ইমন তো হল। এবার পূরীয়া ধরো।

নিজেই এক কলি গেয়ে ফেললেন—অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা। কি নিয়ে আর ঘরে ফিরি॥

ভিক্টোরিয়া পেরিয়ে গাড়ি রবীন্দ্রসদনে ঢুকে পড়ল। ফোয়ারা জল ছুঁড়ছে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সবাই ওপরে উঠছে। সকলেরই সুন্দর পোশাক। পৃথিবীতে যেন অভাব নেই, দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, মৃত্যু নেই। সব রাতই যেন উৎসবের রাত। উজ্জ্বল মুখ, ফিনকি হাসি। সেন্টের হরেক সুবাস। কাঁচের আড়ালে উঁচু লবিতে সবাই যেন অমৃতের পুত্র। আজ কত কথা! কত গান! ফুরফুরে বাতাস, ফুরফুরে ফোয়ারা, ফুরফুরে চুল, ফুরফুরে যৌবন, ফুরফুরে শাড়ির আঁচল। সব রাতই সত্যিই যদি এমন উৎসবের রাত হত! কেমন হত? কেন এমন হয় না? মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। না, মানুষ নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আলোকিত রঙমহলের সামনে সুশোভন মুগ্ধ মুখে অচল।

করুণা বললে, চলো বাবা, ভেতরে যাই। আর তো মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি!

বীরেন একটা বাড়িতে পেয়িং-গেস্টের মত থাকে। শান্ত পরিবার। ভদ্রমহিলার স্বামী আর্মিতে ছিলেন। চায়না ওয়ারে যুদ্ধক্ষেত্রেই দেহ রাখেন। বাড়ি হয়েছে মৃত্যুর পরে পাওয়া টাকায়। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। মা আর মেয়ের সংসার। মহিলার এক জাঁদরেল ভাই মাঝেমধ্যে এসে দেখাশোনা করে যান।

বীরেনের এক বন্ধুর মাধ্যমে এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বন্ধুর নাম অসীম। ডাকসাইটে অধ্যাপক। বিজ্ঞানের। নামজাদা কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ায়। আবার কবিতা লেখে। গানের গলাও

ভালো। রাজনীতি করে। মেয়ের নাম অসীমা। বন্ধু একসময় অসীমাকে পড়াত। অসীমার সাংঘাতিক মামার সঙ্গে সাংঘাতিক খাতির। এইসব যোগাযোগের টানাপোড়েনে বীরেনকে মেসে পচতে হয়নি। ছোট্ট নতুন বাড়ির ছাদের ঘরে গদি সাজিয়েছে। বীরেনকে সাজাতে হয়নি। সাজানোই ছিল। বীরেন এসে অধিকার করেছে।

অসীমার মায়ের নাম ছায়া। মেজরের স্ত্রী হলেও স্বভাবটি ভারি নরম। নবদ্বীপের মেয়ে। যে মাটিতে শ্রীখোল তৈরি হয়, সেই মাটির মেয়ে নরম তো হবেই। অসীমা অবশ্য বাবার দিকেই গেছে। বীরেনের তাই ধারণা। বীরেন অবশ্য অসীমার বাবাকে দেখেনি। ছবি দেখেছে। মিলিটারি পোশাকে স্মার্ট একজন যুবক। কম বয়সেই মারা গেছেন। ছায়ার বয়স বেশি নয়। সময় সময় ছায়া আর অসীমাকে সমবয়সী মনে হয়। এ বাড়িতে বীরেন দুজনকে ভয় করে। প্রথমজন অসীমা, দ্বিতীয়জন অসীমার মামা বিপুল চৌধুরী। জমিদারের মত চেহারা। ভরাট গলা। পুরুষ্টু গোঁফজোড়া। শতকরা একশো ভাগ পুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই।

এ বাড়ির অতিথি হবার সময় বিপুলবাবু ঝাড়া এক ঘণ্টা বীরেনের ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন।

'তোমার পার্সোন্যাল হ্যাবিটস কী রকম ?'

'আজ্ঞে খুব একটা রাগী না। সবাই বলে, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ।'

'রাগটা হ্যাবিট নয়, নেচার। আমি হ্যাবিটের কথা জিজ্ঞেস করেছি। বাথরুম ব্যবহার করতে জানো ? কর্পোরেশনের নয়, ভদ্রলোকের বাড়ির ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'কী জানো ?'

'জল ঢেলে বসতে হয়। উঠে আসার সময় জল ঢালতে হয়। বেসিনে নাকঝাড়া অসভ্যতা। থুতু ফেলা বেআইনী। সাবানদানীতে জল ফেলা অনুচিত। কলের আর শাওয়ারের মুখ টাইট করে বন্ধ করতে হয়। যেন ফোঁটা ফোঁটা জল টুপ টুপ করে না পড়ে। কলের মাথায় সাবান বা তেল মাখিয়ে হড়হড়ে করতে নেই। তেল মাখলে তেলের শিশির, শ্যাম্পু মাখলে শ্যাম্পুর শিশির ছিপি ঠিকমত বন্ধ করা উচিত। বাথ-রুমের মেঝেতে বসে সাবান মাখলে সাবানের ফেনা জল দিয়ে ঢেইয়ে দিতে হয়। এই আর কী!'

'হ্যাঁ, প্রায় সবই বললে, কেবল একটা বড় জিনিস বললে না। সেটা হল দাঁত মাজা। কবার দাঁত মাজ ?'

'আজ্ঞে দুবার। সকালে একবার আর রাতে একবার—খাবার পর।'

'দেখি দাঁত।'

বীরেন ই করে দাঁত দেখিয়েছিল।

'হুঁ, মিথ্যে বলোনি। বুরুশ ব্যবহার করো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেতর দিক মাজার সময় বুরুশ বাইরে টানো, মুখ হাঁ করে তলা থেকে ওপরে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দেয়াল থেকে ডিসটেন্স কত ?'

'দাঁতের দেয়াল ?'

'আরে না রে বাপু! বাথরুমের দেয়াল থেকে তোমার মুখের ডিসটেন্স্ !'

'কখনও মেপে দেখিনি।'

'হুঁ। আমি বলে দিচ্ছি, অন্তত তিন হাত। সেণ্টারে দাঁড়ালেই ভাল হয়, কারণ বুরুশ থেকে পেস্টের ফেনা মোজাইক করা দেয়ালে ছিটকে ছিটকে লাগতে পারে। বুঝলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাথরুম থেকে বেরোবে কী ভাবে ?'

'পা মুছে, বাইরে ছেড়ে রাখা স্লিপারে পা ফেলবো।'

'গুড্! মুখ ধোওয়ার পর বেসিন ধুয়ে দেবে। ঝাঁঝরির মুখে এমন কিছু ফেলবে না যাতে বুজে যায়। যেমন, দাঁত থেকে টেনে বের করা ডাঁটার ছিবড়ে, চিরুনি থেকে ছাড়ানো চুলের নুটি। বুঝলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার দাঁতে অবশ্য কিছু আটকায় না, চুলও ওঠে না।'

'হবে হবে, ওসব ব্যামো বছর দুয়েকের মধ্যে ধরে যাবে।'

বীরেন ভেবেছিল, ইণ্টারভিউ বুঝি শেষ হল! তা নয়। পরমুহূর্তেই প্রশ্ন হল, 'মাথায় তেল মাখো ?'

'আজ্ঞে না।'

'দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে বসার বদ-অভ্যাস আছে ?'

'মাঝে মাঝে।'

'ছাড়তে হবে।'

বীরেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'পাস করেছি ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও যুবক, অধৈর্য হয়ো না। এখনও একটা বড় প্রশ্ন বাকি আছে। রাস্তা কী ভাবে হাঁটো ?'

'আজ্ঞে ধীরে ধীরে বাঁদিক ঘেঁষে।'

'তোমার কাছে কেতাবী পদ্ধতি শুনতে চাইনি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটো ? কী মাড়াচ্ছ না মাড়াচ্ছ দেখে হাঁটো ? না উটমুখো ? গোবর, কাদা মাড়ানোর অভ্যাস আছে ?'

'আজ্ঞে না। দেখেই হাঁটি। জুতোর তলা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি।'

'শোনো। ডিসটিংশানেই পাস করলে। তবে কি জানো ! বাঙালীর কথায় আর কাজে আকাশপাতাল ফারাক থেকে যায়। বাঙালীর নীতি কি জানো ? আমি যা বলি তাই করো, আমি যা করি তা কোরো না। তোমার ওপর কড়া নজর রাখা হবে। কোনও গলতি দেখলে ওয়ার্নিং দেওয়া হবে। তখন শোধরাবার চেষ্টা করলেই খুশি হবো। ঠোঁট ফোলালে চলবে না।'

বীরেন ঘাবড়ে গিয়ে বন্ধু অসীমকে বলেছিল, 'ভাই, ও বাড়িতে আমি এক সপ্তাহ থাকলে ভয়ে শুকিয়ে মরে যাব। তোর ওখানে ব্যাপার আছে তাই সয়ে যায়, আমার ভাই চলবে না। তোমার ছাত্রী অসীমার মুখ দেখেছ, যেন বর্ষার আকাশ। একমাত্র ওয়েসিস ভদ্রমহিলা। তিনি তো আবার মেয়ের ভয়ে তটস্থ, তার ওপর ওই ভাই ! সপ্তাহে বার-দুয়েক নিশ্চয়ই আসেন !'

'ব্রাদার, ওটি হল বাইরের আবরণ। অমন পরিবার তুমি দুটি পাবে না। ঝুনো নারকেল। কঠিন আবরণ সরালেই মিষ্টি জল, আর দু'মালা নারকেল।'

আজকালকার মেসে আর থাকা যায় না। মোদো-মাতালে কাণ্ড। বাধ্য হয়েই বীরেন হলুদরঙের বাড়ির ছাদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। পাশে একমানুষ উঁচুতে ঠাকুরঘর। পশ্চিম-মাথায় জলের ট্যাঙ্ক। কল লাগানো আছে। জলের অভাব নেই। অসীমা ছাদে একটা ছাদ-বাগান

বানিয়ে ফেলেছে। ভারি সুন্দর। হরেক রকম, হরেক রঙের ফুল। যেন সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরে অজস্র শিশু সারাদিন নেচে চলেছে।

গলায় সাতপাক মাফলার জড়িয়ে বীরেন খাটে শুয়ে আছে চোখ বুজিয়ে। শরীরের অবস্হা স্টেট বাসের চেয়ে খারাপ। গলনালী সাইলেন্সারের মত বুজে গেছে। চোখ দুটোর রঙ হয়েছে ফগলাইটের মত। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কপালে হাত দিলেই ছ্যাঁক করে উঠছে। পর পর তিন কাপ আইসক্রিম খাবার ঠ্যালা সামলাও!

শুয়ে শুয়ে বীরেন ভাবছে, পুরুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ সুন্দরী নারী। সুন্দরী রমণীর স্নেহে অকালমৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। ও যদি খায় আর একটা খেতে পারি, ও যদি খায় আর একটা খেতে পারি —এইভাবে করুণার চাপে রবীন্দ্রসদনের রাতে পর পর তিন কাপ। টু ইন ওয়ান, থ্রি ইন ওয়ান, পেস্তা। পেট গরম, গলা ঠান্ডা। প্রিজমের ভেতর দিয়ে আলো পাস করালে সাত রঙ। বীরেনের গলা দিয়ে শব্দ পাস করালে আট রকম সুরের অর্কেস্ট্রা। একই সঙ্গে বনি এম, মাইকেল জ্যাকসন, এল্টন জন। গোটা অ্যামেরিকার মিউজিক্যাল ট্যালেণ্ট গলায় বাসা বেঁধেছে, পোড়ো বাড়ির পায়রার মত। মনে যদি একবার কেউ বাসা বাঁধে, তার সঙ্গে মনে মনেই ঝগড়া চলে। মান অভিমান চলে। সামনাসামনি হলে বোবা হয়ে যেতে হয়।

বীরেন বিছানায় চিৎ, কপালে হাত, চোখ বোজানো। ঠ্যাং দুটো দু'পাশে ছড়ানো। চোখের সামনে করুণা। অদৃশ্য করুণাকে বীরেন বলছে, 'তোমার আর কী! আমার ম্যাও কে সামলাবে এখন?' এইটুকু মনে মনে বলেছিল। বাকিটা জোরে, 'তুমি এখন টিপে দেবে?'

'কী বললেন?'

বীরেন অবাক। আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যযুগ এসে গেল নাকি? যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে বাতাসে উড়তে উড়তে চলে এল! করুণা দেবী না কী! অন্তর্যামী! চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না! স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়! বরং আর একবার পরীক্ষা করা যাক। বীরেন বেশ খেলিয়ে বললে, 'তুমি এখন টিপে দেবে?'

'ইডিয়েটের মত কী যা-তা বলছেন?'

ওরে বাবা রে! বীরেন ভয়ে ভয়ে ডান চোখটা খুলল। ডান দিকেই দরজা। একটি নারী-শরীরের মধ্যস্হলে নজর আটকে গেল।

এ তো করুণা নয়! করুণার চেয়ে চওড়া। চোখ আর একটু ওপর-দিকে ওঠাতেই সেই দৃঢ় চিবুক, পাতলা ঠোঁট, খাড়া নাক।

বীরেন পিট পিট করে দু'চোখে তাকিয়ে, তার অষ্টধা কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব বাগে এনে বললে, 'বিশ্বাস করুন, মায়ের দিব্যি বলছি, আপনাকে বলিনি!'

অসীমা বললে, 'ছিঃ ছিঃ, মেয়েদের সামনে দিব্যি গালছেন! আশেপাশে আমি ছাড়া আর কে আছে যার সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন! দাঁড়ান আজ মামা আসুক!'

বীরেনের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল। বিছানার পাশ দিয়ে দুম্ করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। হাতকয়েক দূরে দরজার বাইরে অসীমার পদযুগল। পরে বেইজ্জত হওয়ার চেয়ে এখনই পায়ে পড়বে কী না ভাবছে।

অসীমা বললে, 'সার্কাস দেখাচ্ছেন?'

হাত জোড় করে বীরেন বললে, 'বিশ্বাস করুন, অন গড, আমি ভয়ে পড়ে গেছি। আপনার ভয়ে।'

'আমাকে ভয় করেন?'

'কে না আপনাকে ভয় করে?'

'যদি ভয় করেন, তাহলে আমার গোলাপ গাছের বেড়ে এসব কে ফেলেছে?'

অসীমা একটা ওষুধের ফয়েল, তালগোল পাকানো একটুকরো কাগজ, গোটাচারেক পোড়া দেশলাইকাঠি বীরেনের চোখের সামনে মেলে ধরল।

'এই জানোয়ারেই ফেলেছে দিদি, তবে বেহুঁশ অবস্থায়। রাতে তিন জ্বর, তখন কী করেছি কিছুই খেয়াল ছিল না। আমায় ক্ষমা করবেন।'

'তিন জ্বর?' উঁচু চৌকাঠ পেরিয়ে অসীমা ঘরে চলে এল।

'তিন জ্বর! আমাদের বলতে কী হয়েছিল? এখন কত?'

মেঝেতে থেবড়ে বসে থাকা বীরেনের কপালে হাত রাখল, 'বাবা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!' শীতল হাতের স্পর্শে বীরেনের চোখ যেন বুজে এল। আহা, জ্বরে কী সুখ!

'এমন হাই ফিভার কীভাবে বাধালেন ? জ্বর হয় অত্যাচারে। জলে ভিজেছিলেন ?'

'না তো।'

'তাহলে ? গলায় এই গরমে মাফলার জড়িয়েছেন কেন ?'

'গলা ভেঙে গেছে।'

'টনসিল আছে ?'

'কী জানি ! আমার বরাতটাই খারাপ। অসুখ হয় না, হয় না—হলে আর রক্ষে নেই। এ এখন কত রকম হবে ! জ্বর, প্রলাপ, কেলোর কীর্তি।'

'আপনি খুব অসৎ-সঙ্গে মেশেন, না ? এইসব ভাষা পেলেন কোথায় ?'

'শুনে শুনে শিখেছি। এমনি আমি খুব খারাপ ছেলে নই। বিলেত থেকে কত কষ্ট করে সি. এ. করে এলুম।'

'সি. এ.—আপনি সি. এ. ? বলেন কী ! দেখলে মনে হয় মার্চেন্ট অফিসের কেরানী !'

'আমার যে কোনও পার্সোন্যালিটি নেই। প্যান্ট, শার্ট পরে অফিসে গেলে, সঞ্জয় বলে এক ফচকে ছোঁড়া আছে, সরি, শব্দ দুটো তেমন ভালো নয়, রেগে বলে ফেলেছি—সেই সঞ্জয় পেছনে লাগবে, এই যে মিস্টার পাশবালিশ এলেন ! তারপর বলবে, প্রাপ্রি, প্রাপ্রি !'

'প্রাপ্রি কী ?'

'সে আপনাকে আমি বলতে পারব না। মুখফসকে বেরিয়ে গেছে।'

'শব্দটা বড় অদ্ভুত। কৌতূহল প্রকাশ করা অসভ্যতা, তবু জানতে ইচ্ছে করে। কোনও স্ল্যাং নয় তো ?'

'স্ল্যাং নয়, তবে একটু যেন কেমন-কেমন। আপনার সামনে বলতে মুখে আটকায়। আসলে দুটো শব্দের প্রথম অক্ষর।'

'দুটো শব্দ ! প্রা দিয়ে একটার শুরু, আর একটা প্রি দিয়ে ? প্রা ! প্রা দিয়ে হয়—প্রায়, প্রাগৈতিহাসিক, প্রাণায়াম, প্রাণ। আর প্রি—প্রথমেই মনে আসছে প্রিয়। প্রাণপ্রিয়, তাই না ?'

'স্ত্রীলিঙ্গ—স্ত্রীলিঙ্গ করে ফেলুন।' বীরেন মুখ নিচু করে বললে।

'প্রাণপ্রিয়া ? আপনি সেই অসভ্যটার প্রাণপ্রিয়া ?'

'আমি না। স্টোরিটা এই রকম। অফিসের কাছে একটা আইসক্রিম

বুথ আছে। সেই বুথ চালাতেন এক মহিলা। ছোট্টখাট্টো, ফর্সা চেহারা, চোখে চশমা। আইসক্রিমে আমার ভীষণ লোভ। প্রায় খেতে যেতুম। যেতে যেতে আলাপ। তারপর একদিন সঞ্জয়কে নিয়ে গেলুম। ঘাড় ভেঙে দু'কাপ পে'—সরি, খেয়ে নিলে।'

'পে' কী ?'

'শব্দ স্লিপ করে অন্যদিকে যাচ্ছিল—ডোণ্ট মাইন্ড! সেই সঞ্জয় বলে বেড়াতে লাগল, ওই মহিলা আমার প্রাণপ্রিয়া!'

'মনে মনে তাকেই বলছিলেন, কে টিপবে ? গলার অবস্থা আর জ্বর দেখে মনে হচ্ছে, আইসক্রিম ফ্রি হয়ে গেছে!'

'আজ্ঞে না, সে বুথ উঠে গেছে, মহিলার বিয়ে হয়ে গেছে। আর সত্যি বলছি, আমার কোনও দুর্বলতা ছিল না। টিপে দেবার কথা বলছিলুম আর এক জনকে, যাকে সঞ্জয় বলে প্রাপ্রি টু।'

'যাক, ওসব আমি শুনতে চাই না। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, গলায় মাফলার জড়িয়ে, মেঝেতে থেবড়ে বসে, কলেজের ছ্যাবলা ছোক-রাদের মত প্রাপ্রি ওয়ান, প্রাপ্রি টু করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিতেন। যান, শুয়ে পড়ুন। আমি ডাক্তারকে কল দিচ্ছি।'

'আমার কাছে খুচরো নেই।'

'তার মানে ?'

'দুটো একশো টাকার নোট, আর কয়েক পয়সা খুচরো পড়ে আছে। ডাক্তারবাবুর ভিজিট কী ভাবে দেব ?'

'সে ভাবনা তাদের ওপরেই ছেড়ে দিন, যারা ডাক্তার ডাকছে। ওখানে অ্যাকাউন্টেন্সি আর না-ই বা ফলালেন!'

অসীমার দাবড়ানি খেয়ে বীরেন আবার বিছানায় কাত হল। মিনিট দশেকের মধ্যে অসীমা আর তার মা একসঙ্গে ঘরে এলেন। বীরেনের জ্বর ক্রমশই বাড়ছে। অসীমা কপালে হাত রেখে মাকে বললে, 'ইস, ক্রমশই বাড়ছে! বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে!'

জ্বর হলে বীরেনের স্বভাবই হল, উঁ আঁ করে পাড়া মাথায় করা। ছাত্রজীবনে, তখন ক্লাস টেনে পড়ে, জ্বরের ঘোরে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে বাছুরের মত দৌড়েছিল। পেছন পেছন ধরার জন্যে ছুটেছিলেন বীরেনের ব্যায়ামবীর কাকা, জগত্তারিণী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আর

স্কুলের দারোয়ান রামাধর। বীরেন ভুবনডাঙার বিলে কচুরিপানায় ঝাঁপ মেরেছিল। আর একবার থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় বিকারে বৃদ্ধ ডাক্তারের গলা টিপে আধ হাত জিভ বের করে দিয়েছিল। শেষে ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার জন্যে আরও বড় ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। বীরেনের এইসব রেকর্ডের কথা এঁরা জানেন না। জানলে হয়তো ত্রিসীমানায় ঘেঁষতেন না।

বীরেন উঁ আঁ ছেড়ে এইবার 'বাবারে, মারে' শুরু করেছে। দু'বার করুণা করুণা করেছে। মা আর মেয়ে দু'জনেই ভেবেছে ঈশ্বরের করুণা। অসীমার হাতে হট-ব্যাগ। ছায়া বললেন, 'এত হটে হট-ব্যাগ, না আইস-ব্যাগ ?'

অসীমারও মাথায় আসছে না। এমন সময় বীরেন জ্বরের ঘোরে বললে, 'বাড়ি যাবো।'

ছায়া বললেন, 'তোমার যে বাড়ি নেই, বাবা !'

অসীমা বললে, 'কার সঙ্গে তুমি বকছ ? দেখছ না জ্ঞান নেই ? ডিলিরিয়াম !'

'আমার মনে হয়, এই অবস্থায় কপালে জলপটি দেওয়া উচিত।'

'তুমি ঠিক জানো ?'

'আমি দেখেছি। পাশের বাড়ির সন্তুর জ্বর হয়েছিল গতবার।'

'তাহলে দেওয়া যাক।'

টেবিলের ওপর বীরেনেরই একটা নীল রঙের রুমাল ছিল। গেলাসের জলে ভেজাতেই ভারি সুন্দর একটা গন্ধ বেরুলো। করুণা সেদিন একটু সেন্ট মাখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ভদ্রসমাজে মেলা-মেশা করতে হলে, শরীরে বোকাপাঁঠার গন্ধ বেরুলে লোকে ঘেন্নায় দশহাত দূরে পালাবে !

রুমাল চিপে জল বের করতে করতে অসীমা বললে, 'জানো মা, করুণা কোনও মেয়ের নাম !'

'কী করে বুঝলি ? ভক্ত ছেলে—সব সময় ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করছে।'

'হ্যাঁ, ভক্ত ছেলে !'

বীরেন এই সময় হুঙ্কার ছাড়ল, 'মা, মা, মাহা !'

মা, মেয়ে দু'জনেই চমকে উঠেছিল। ছায়া বললে, 'শুনলি, কী রকম অন্তর্ভেদী মা ডাক !'

'এ মা জ্বরের মা। সেরে গেলেই কণ্ঠ থেকে অদৃশ্য।' ভিজে রুমাল মায়ের নাকের কাছে ধরে অসীমা বললে, 'পাচ্ছ? ফরাসী সুগন্ধ! একসময় তুমিও মাখতে।'

'তোকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। পাট-পাট করে কপালে চেপে ধর। আমি পাখাটা খুলে দিই।'

অসীমা রুমাল কপালে রাখতেই বীরেন ধরা-ধরা গলায় বললে, 'কে, করুণা? করুণা, আমি মারা যাচ্ছি!'

অসীমা গম্ভীর মুখে বললে, 'শুনলে?'

'কে করুণা?'

'সে এক আইসক্রিমউলী। এনার প্রাপ্রি।'

'প্রাপ্রি মানে?'

'প্রাণপ্রিয়া!'

বীরেনের জ্বর কি আর জলপটিতে নামার? অত সহজ নয়। দক্ষযজ্ঞ করে আরোগ্য—এই হল বীরেনের শরীর-যন্ত্র। ডাক্তারবাবু এলেন। তিনতলায় উঠে হাঁফ ধরে গেছে। হাপরের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, 'রুগী কোথায়?'

অসীমা বীরেনের ঘরে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল। মাঝারি মাপের ঘর। ছিমছাম সাজানো। চারপাশে জানলা। শহরের দিকে চোখ মেলে আছে।

ঘরে ঢুকেই ডক্টর বোস বললেন, 'উঁহু, এ ঘরে রুগীকে রাখা চলবে না। অসম্ভব রোদের তাপ। সুস্থ মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়বে। ট্র্যান্সফার হিম ডাউন-স্টেয়ারস।'

বিছানার একপাশে বসে ডক্টর বোস রুগীর নাড়ী ধরলেন। ধরেই ছেড়ে দিলেন, 'সাধারণত মানুষের, বিশেষ করে এই বয়েসের মানুষের এত হাই টেম্পারেচার বড় একটা দেখা যায় না। আণ্ডারটাং টেম্পারেচার নেওয়া যাবে, না থার্মোমিটার কামড়ে দেবে?'

অসীমা বললে, 'রিস্ক না নেওয়াই ভালো। ভীষণ ছট্‌ফট করছেন। ভুল বকছেন। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জোরে লাথি ছুঁড়ছেন।'

'তাই নাকি? তাহলে সাবধান হওয়াই ভালো। সরে বসি বাবা।'

ডক্টর বোস বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। দূর থেকে রুগী দেখছেন। দূর-দর্শন!

'নাঃ, ভালো মনে হচ্ছে না। ঘাড়ের তলায় হাত রেখে মাথাটা তোলার চেষ্টা করে দেখুন তো, স্টিফ হয়ে আছে কিনা ?'

অসীমা ঘাড় তুলে বললে, 'হ্যাঁ, বেশ শক্ত হয়ে আছে।'

'হুঁ, ম্যানেনজাইটিসের লক্ষণ। ব্লাড, স্টুল, ইউরিন, এক্সরে, লাম্বার জুস সব কিছু টেস্ট করাতে হবে। উইদাউট টেস্ট নো মেডিসিন। আমি কম্পাউন্ডারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে সব নিয়ে যাবে।'

'ওসব হতে তো সময় লাগবে। ততক্ষণ বিনা ওষুধে পড়ে থাকবে?'

'দেখুন আমার চিকিৎসা একটু পাকাপাকি। অন্ধকারে আমি ঢিল ছুঁড়ি না। রোগ আগে ধরব, তারপর মারবো এক কোপ। ইন দি মিন টাইম, মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়ে রাখুন। ইনি তো আপনাদের পেয়িং-গেস্ট, নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে ? কে সেবা করবে ?'

অসীমা বললে, 'না, নার্সের প্রয়োজন হবে না। সেবা আমরাই করব।'

'বাঃ, ফাইন স্পিরিট! আজকাল আপনজনকেই সেবা করে না। স্বামী ভুল বকছে আর স্ত্রী ম্যাটিনিতে শ্রীদেবীর নাচ দেখছে!'

ছায়া বললে, 'এ বাড়িতে স্বামীর পাট উঠে গেছে তো, তাই সেবা বেঁচে আছে।'

'তাই যেন চিরকাল থাকে। ওষুধের চেয়ে সেবা বড়। আচ্ছা আমি চলি।'

বীরেন হঠাৎ দানোয় পাওয়া মানুষের মত উঠে দাঁড়াল। চোখ জবাফুলের মত লাল। ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললে, 'কে আমার জুতো চুরি করেছে ? পুলিস, পুলিস!'

ডাক্তারবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, 'চেপে ধরে শুইয়ে দিন। মাথায় বরফ— বরফ!'

অসীমা বীরেনকে দু'হাতে জাপটে ধরে বিছানায় চিৎ করে ফেলল। ছায়া ছুটল নিচে। ফ্রিজ থেকে বরফ আনতে।

করুণা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। তিনটের সময় আসার কথা, পাঁচটা বাজল। কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে থেঁতো করে, আখের গুড় দিয়ে কচি কলাপাতায় জবরদস্ত আচার মেখে বেলা তিনটের সময় অল্প একটু চেখেছে। নিজের কেরামতিতে নিজেই মুগ্ধ! বাকিটা কলাপাতায় মোড়া আছে। বীরেন এলে ছাদে বসে রসিয়ে

রসিয়ে একসঙ্গে খাওয়া হবে হু-হা করতে করতে। পাঁচটা বেজে গেল। বিয়ের যেমন লগ্ন আছে, আচার খাবারও সেই রকম লগ্ন আছে। কলাপাতা মোড়া আচার ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্যারেজের ছাদে। শেষ-বেলার গোটাকতক কাক পাতা ধরে টানাটানি, খাবলাখাবলি করছে। ছাদের আলসেতে হেলান দিয়ে করুণা দেখছে। গোদামত একটা গুণ্ডা কাক প্রথমে সামান্য একটু ঠুকরেছিল। একপাশে সরে গিয়ে ঝালে আর টকে কলকাতার বিসর্জনে দিশি বচ্চনের মত কেতরে কেতরে নাচছে। আরও গোটাচারেক আছে। সেগুলোরও ওই একই অবস্থা হবে। খা বেটা, আচার খা!

সুশোভন ব্যাঙ্কে গেছেন। দেরাদুনই জীবনের শেষ ভরসা। মাথার ওপর মুসৌরী। দেরাদুনের নামে করুণার ভেতরেও নৃত্য শুরু হয়েছে। অখদ্যে কলকাতায় ঘেন্না ধরে গেছে। ধুলো, ধোঁয়া, শব্দ। তিনটে বাড়ির পরে চতুর্থ বাড়ির ছাদে করুণার দৃষ্টি আটকে গেল। সেই অসভ্য ডেঁপো ছেলেটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে। টিভির এরিয়ালের খোঁটার পাশে। করুণা গালে হাত রাখলে সেও হাত রাখছে। কপালে হাত রাখলে কপালে। রাস্তার দিকে ঝুঁকলে সেও ঝুঁকবে। আকাশের দিকে মুখ তুললে সেও মুখ তুলবে। মহা পাজি ছেলে। ইচ্ছে করে পটাপট জুতো মারতে। আজকালকার ছেলেরা কেন যে এমন হয়ে যাচ্ছে! নাঃ, ছাদে দাঁড়াবার উপায় নেই। করুণা নিচে নেমে এল। নির্জন বাড়ি। সন্ধ্যে নেমে আসছে। বাবা কী ব্যাঙ্ক তৈরি করে, তারপর টাকা তুলবে? কে জানে বাবা!

শোবার ঘরে মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে করুণা বসে রইল চুপ করে। বীরেনের ওপর অভিমান, বাবার ওপর রাগ। এমন কী আজ মায়ের ওপরেও রাগ হচ্ছে। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার জমাট হচ্ছে। বীরেনের সঙ্গে আজ নিউ মার্কেটে যাবার কথা। ও ছেলের ওপর যে নির্ভর করবে সে ডুববে, ওনার ভরসায় বাবা আমার আপেল বাগান করবেন। সে আপেল যে কী আপেল হবে!

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠছে, সেই সময় সুশোভন এলেন। শ্রান্ত, ক্লান্ত। ময়দানে বড় দলের খেলা ছিল। রাস্তাঘাট, যানবাহন সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

'কী রে, বীরেন আসেনি?'

করুণা রাগ-রাগ-গলায় বললে, 'না। তিনি আজ বললে এক মাস পরে আসবেন!'

'ছি, ছি! আজ খেলা ছিল, আমারও আসতে দেরি হয়ে গেল। কোনও কিছুই পাই না—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি। বীরেনের ঠিকানা জানিস?'

'কেন, কী হবে? পায়ে ধরে ডাকতে যাবে? আসতে যখন ইচ্ছে করে না, আসবে না। অত কিসের!'

'তুই খুব রেগে গেছিস। তিনদিনের মধ্যে দেরাদুন পোঁছতে হবে। প্রয়োজন হলে প্লেনে যেতে হবে। যাঁর বাগান তিনি রেজিস্ট্রি করিয়ে, টাকা বুঝে নিয়ে সামনের সপ্তাহেই অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেবেন।'

'ঠিক আছে, তোমাতে আমাতে যাব। আমাদের যখন কেউ নেই, আমরাই আছি।'

'তুই যাই বল না কেন, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানিস, ওর একটা কিছু হয়েছে। আমি কাল একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।'

'তুমি কবে আর সুশ্রী স্বপ্ন দেখ! একবার স্বপ্ন দেখলে, আমি ছাদ থেকে পড়ে গেছি। এক মাস আমার ছাদে ওঠাই বন্ধ হয়ে গেল।'

'তোরা আধুনিকা, এসব বিশ্বাস করিস না। আমি খুব করি। ওমেন। ঘটনা ঘটার আগে জানান দেয়। সাবধান হতে বলে। আমরা ধরতে পারি না। কাল স্বপ্ন দেখলুম, বিশাল এক মাঠে বীরেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কোন্ দিকে যাবে, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। দিশেহারা অবস্থা। কোথা থেকে অদ্ভুত এক সুর ভেসে আসছে। অনেকটা সংস্কৃত স্তোত্রপাঠের মত। গম্ভীর, উদাত্ত। শেষটা আর দেখতে পেলুম না। ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন কখনও পরিণতিতে পৌঁছয় না, সেইজন্যেই স্বপ্নের নাম স্বপ্ন!'

'অনেক গবেষণা হয়েছে। এখন যাও মুখ হাত পা ধুয়ে নাও। মনে করো, বীরেন বলে কাউকে চিনতে না।'

'ঠিকানাটা পেলে বেশ হত।'

'ওর কোনও ঠিকানা নেই। একজনদের বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট থাকে। চিলেকোঠায়! সেখানে তাঁদের বিরক্ত করতে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।'

...

অসীমার মামা বিপ্লববাবু বীরেনের মাথার কাছে। অসীমা পায়ের দিকে। বিপ্লববাবু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'হ্যাঁরে, ওর ঘাড়ে বা কোমরে লাগল না তো?'

অসীমা বললে, 'মনে হয় লাগেনি। তুমি তো এমন কিছু জোরে ফেলনি। তাছাড়া বিছানায় পুরু গদি রয়েছে।'

'তাহলেও আর একটু ধীরে নামানো উচিত ছিল। বয়েস হচ্ছে, শরীরে সে জোর আর নেই। ছেলেটা বেশ কাবু হয়ে পড়েছে। কী করবি, নার্সিং হোমে ট্রান্স্ফারের ব্যবস্থা করব?'

'সেটা কী ঠিক হবে? কেমন যেন পর-পর করে দেওয়া হবে। আত্মীয় না হতে পারে, মানুষ তো।'

'তা ঠিক। তবে তোদের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে যাবে। যাই—আমি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাই। ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা দেখি।'

যাবার মুখে বীরেনের কপালে একবার হাত রাখলেন। বীরেন সামান্য চোখ মেলেই আবার চোখ বুজিয়ে ফেলল। বিপ্লববাবু বললেন, 'বেশ জ্বর। ছেলেটার মুখ দেখে প্রথম দিন থেকেই আমার কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। নিজের কথা তেমন তো বলে না। অসীমের কাছে যেটুকু শুনেছি, অবাক হবার মত। কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে। তেমনি চরিত্র। এসব জীবন বড় হবেই। কেউ চেপে রাখতে পারবে না। তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।'

বিপ্লববাবু বুক চিতিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একসময় ওয়েট-লিফ্টার ছিলেন। গ্রামের দিকে খামার করেছেন। বোট্যানিতে এম. এসসি। কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন। প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে কৃষি-সাংবাদিকতা করেছেন। ইজরায়েলে বেশ কিছুকাল ছিলেন। বর্তমানে শিক্ষিত চাষী। আদর্শ একটি গ্রাম তৈরি করেছেন। বিদেশীরাও দেখতে আসেন। সরকারী মহলে খাতির যথেষ্ট।

ছায়ার ঘরে বীরেনের স্থান হয়েছে। দক্ষিণ খোলা। পুব খোলা। অসীমা মৃদু আলো জেবলে দিল। সন্ধ্যে হয়েছে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল বীরেনের মুখের দিকে। এত কাছ থেকে, এত ভাল করে এ মুখ সে কোনও দিন দেখেনি। ছেলেদের নিয়ে আদিখ্যেতা

তার কোনও কালেই ভালো লাগে না। বীরেনের মুখের সঙ্গে তার বাবার মুখের ভীষণ মিল আছে। আগেও মনে হয়েছে। আজ আরও বেশি মনে হচ্ছে। দেওয়ালে পিতার কম বয়সের ছবি ঝুলছে। আশ্চর্য মিল! এমন কী গলার স্বরও প্রায় এক। বাড়ির কোথাও বীরেন কথা বললে অসীমা চমকে উঠত, বাবা ফিরে এলেন নাকি! বীরেনের ওপর মামার মায়ার চেয়ে তার মায়া হয়তো অনেক বেশি। নিজের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করার অভ্যাস তার নেই। থাকলে ফল কী হত কে জানে!

অসীমা বীরেনের চুলে দুবার আঙুল চালিয়ে পাট-পাট করে দিল। চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুদিন আগের দৃশ্য। পুরীর সমুদ্র থেকে বাবা উঠে আসছে। মাথার মিলিটারি-কাট চুল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বালি থেকে ঠিকরে ওঠা সূর্যের কিরণে রোদে পোড়া তামাটে শরীর ব্রোঞ্জের মূর্তির মত ঝলমল করছে। মনে পড়ছে সেই দিনের কথা। মেঘলা সকালে যেদিন খবর এল, 'ইওর হাজব্যান্ড হ্যাজ ডায়েড ইন অ্যাকশান। দি প্রেসিডেন্ট ইজ প্লিজড টু কনফার অন হিম এ পসথুমাস হনার অফ বীরচক্র।' পৃথিবীতে আলো সেদিন কম ছিল, আরও কমে এল। রাস্তায় সুর করে ফেরিওলা হাঁকল, পুরানা কাগজ! যা ঘটে যায়, অসীমার মনে সব যেন ছবির মত গাঁথা থাকে। কোথায় যেন পড়েছিল, 'বেঁচে থাকার কৌশল হল সময়মত ভুলতে পারা!'

'যা, এবার তুই কাপড় কেচে আয়। আমি আছি।'

অসীমা চমকে উঠল। মায়ের কথায় খেয়াল হল, এতক্ষণ তার হাতের মুঠোয় বীরেনের হাত ধরা ছিল। হাতের তালু গরম হয়ে উঠেছে।

অসীমা বললে, 'অদ্ভুত মিল আছে, না!'

'তুই এতদিনে লক্ষ্য করলি?'

'এত কাছ থেকে কবে আর দেখেছি!'

বিপুলবাবু একটা কাগজের পেটি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, 'বুঝলি, থ্রি-ইন-ওয়ান হয়েছে! ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ফ্লু। সব একেবারে গুছিয়ে এনেছি। ফল, ওষুধ, পথ্য। ওষুধ, ফ্রুটজুস আর প্রচুর জল। এই এখন চলবে। তিন দিন ভোগাবে। মাসখানেক লাগবে নর্মাল হতে। নে জল আন। আটটা পাঁচ। প্রথম রাউন্ড ওষুধ চালিয়ে

দেওয়া যাক। রাতে ফলের রস চলবে না। খাবার ইচ্ছে হলে ড্রিংকস।'

'বীরেন ?'

বিপুলবাবু মৃদুস্বরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'বীরেন ?'

বীরেন চোখ মেলে তাকাল।

'উঠে একটু বস তো বাবা। ওষুধের আক্রমণ হবে।'

বীরেন ফ্যালফ্যালে চোখে তাকাল। বোঝার ক্ষমতা নেই। ওঠার ক্ষমতা নেই। ছায়া বললে, 'আমি মাথা তুলে ধরছি, তোমরা খাইয়ে দাও।'

মা যেমন অসুস্থ ছেলেকে কোলে তুলে ধরে, ছায়া বীরেনকে সেইভাবে তুলে ধরল। ওষুধ খাওয়ানো নয় তো, যেন সমবেত সঙ্গীত। বড়ি, ক্যাপসুল, বড়ি জল—পর পর ঢুকছে। একবার বিষম খেল। বিপুলবাবু ব্রহ্মতালুতে এক চাঁটি মেরে সামলে দিলেন।

'নাও, এইবার চাপা দিয়ে শুইয়ে দাও। ঘুমের ওষুধও আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোক। এইবার আমি এক কাপ কফি খাবো বারান্দায় বসে। হ্যাঁরে অসীমা, চানাচুর আছে স্টকে ?'

'আছে মানে! উপচে পড়ছে।'

বিপুলবাবু বারান্দার চেয়ারে বসে মৃদু স্বরে গান ধরলেন, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। তাঁর প্রিয় গান। একসময় বেশ ভাল গলাই ছিল। চর্চার অভাবে সুর আর এখন তেমন খেলে না, তবে ভাবে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। জীবন আর মৃত্যু, দুটির প্রতিই তাঁর সমান ভালবাসা। বেঁচে থাকতে যেমন ভালো লাগে, মৃত্যুকেও তেমনই রোমান্টিক মনে হয়।

চানাচুরের প্লেট রাখতে রাখতে অসীমা জিজ্ঞেস করলে, 'মামা, তুমি আজ থাকবে তো ?'

'অবশ্যই। এই রাতে তুই আমাকে কোথায় তাড়াতে চাস ?'

'তাড়াতে চাইব কেন ? তোমার যে আবার অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেয়াল হয়!'

'যা যা, ভাব চটকে দিস নি। ভালো করে কফি বানা।'

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। অসীমা বললে, 'কে আবার এলেন ?'

'এ বাড়িতে কে আসবে! মনে হয় সামনের বাড়িতে। বিয়ে লাগার কথা। আত্মীয়স্বজনের যাওয়া-আসা শুরু হয়েছে।'

কলিং বেল বাজল ঠিক বিপুলবাবুর মাথার ওপর।

'না রে, এই বাড়িতেই। দাঁড়া আমি দেখছি। তুই চানাচুর হাটা।'

সদর খুললেন। সামনেই ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বনেদী চেহারার এক ভদ্রলোক। পাশে সুন্দরী এক তরুণী।

'নমস্কার। কিছু মনে করবেন না। এ বাড়িতে বীরেন নামে কেউ....।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বীরেন থাকে।'

'আছে সে?'

'আছে, তবে শয্যাশায়ী। আপনারা?'

'আমরা বীরেনের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার নাম সুশোভন, আমার মেয়ে করুণা।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। আমার নাম বিপুল। নামের সঙ্গে চেহারার মিল আছে।'

'আপনারা বিরক্ত হবেন না?'

'আমরা তো সেরকম অভদ্র নই। মা, তুমি আগে এস তো, তোমার বাবা একটু বেশি ফর্মাল।'

তিনজনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। বিপুল হাঁক মারলেন. 'অসীমা—'

'কী হয়েছে বীরেনের?'

'জগাখিচুড়ি। ফ্লু, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু একসঙ্গে। হাই ফিভার। ডিলিরিয়াম।'

অসীমা সামনে সিঁড়ির মুখে। বিপুল বললেন, 'আমার ভাগনী অসীমা। আপনার মেয়ের বয়সী। তবে মামারবাড়ির স্বাস্থ্য পেয়েছে। আমরা মশাই সকলেই অ্যাভারেজ বাঙালীর চেয়ে লম্বাচওড়া। আমার ভগিনীপতি আর্মি অফিসার ছিল। যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছে। অসীমা, এঁরা বীরেনের পরিচিত, শুভাকাঙ্ক্ষী সুশোভনবাবু, কন্যা করুণা।'

অসীমার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। এই সেই করুণা! এ তো আইসক্রিমওলী নয়? অসীমা স্বাভাবিকের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললে, 'আসুন, আসুন।'

করুণা সুশোভনের গা ঘেঁষে এল। অসীমার গলা আর মুখ, চোখের ভাব দেখে ঘাবড়ে গেছে। তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। ফিসফিস করে সুশোভনকে বললে, 'বাবা, তুমি আগে যাও।'

বিপুল শুনে ফেলেছেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ভয় নেই মা। ওর স্বভাবটাই হেডমিস্ট্রেসের মত। বীরেনকেও মাঝে মাঝে ধমকায়। ওর মা তো মেয়ের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। সুবিধে করতে পারে না আমাকে।'

অসীমা মুখে মেকি হাসি ফুটিয়ে বললে, 'মামার কথা বিশ্বাস করবেন না। আপনারা ভেতরে আসুন। সিঁড়ির মুখে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?'

আমতা আমতা করে সুশোভন বললেন, 'আমরা না জেনে কোনও অসুবিধে করে বসলুম না তো !'

'আবার আপনার সেই কিন্তু-কিন্তু ফর্মালিটি !'

বারান্দাতেই বসা হল। মনোরম জায়গা। সাজানো, গোছানো। লতাপাতা। যুঁই, পাম।

অসীমা করুণাকে বললে, 'তুমি একটু বোসো ভাই, আমি ভেতর থেকে আসছি।'

করুণা মাথা নাড়ল। চলে যাওয়া অসীমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এমন মেয়ে তো বীরেনকে হাতের মুঠোয় রেখে দেবে। খুলে দিলেও উড়ে যাবার সাহস হবে না।

করুণা বললে, 'বাবা, চলো না, আমরা আগে দেখে আসি। শুনেছি ছাদের ঘরে থাকে।'

বিপুল বললেন, 'না না, ছাদ থেকে আমরা নামিয়ে এনেছি। ওই তো ও-ঘরে আছে। এখন তো কোনও কথা হবে না মা। জ্বর আর ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।'

সুশোভন বললেন, 'তা হলে ?'

'এক কাপ কফি খেয়ে নিন। অসীমা আপনারা আসার আগেই জল বসিয়েছে।'

'আমরা আবার কফি—।'

'এইবার মশাই আমি আপনাকে বকব। জানেন তো, একসময় আমি ভদ্রলোক ছিলুম, এখন পুরোপুরি ছোটলোক। ছ'বার বিদেশ

গেছি। সাংবাদিকতা করেছি। সব ছেড়ে আমি এখন এজুকেটেড চাষা।'

'তার মানে?'

'স্বর্ণময়ী গ্রামের কথা কাগজে পড়েছেন কখনও?'

'হ্যাঁ, কতবার পড়েছি।'

'আমার হাতে তৈরি। মায়ের নাম স্বর্ণময়ী। ইজরায়েলে থাকার সময় আইডিয়াটা আমার মাথায় আসে। এদেশে একা অনেকেই ওপরে উঠেছে, উঠছে, উঠবে—সকলকে নিয়ে উঠতে না পারলে ঊর্ধ্বে বড় নির্জন মনে হবে। তাই না?'

'আপনার সঙ্গে আমার আজকের যোগাযোগ মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে গেল।'

'কেন?'

'আমিও ব্যবসায়ী। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কয়েক বছর চাকরি করেছিলুম। পোষাল না। শেষে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম খুলে বসলুম। বেশ জমে গেল। বড় হল। বেশ বড়। তারপর স্বাধীন দেশের মানুষ রাজনীতি শিখল। শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। ঝান্ডা, মিটিং, চলবে না, চলবে না। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি, রুখবই রুখব। ভাঙচুর। আগুন। লালবাতি। সেই ঝকঝকে কারখানা এখন প্রাগৈতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের মত পড়ে আছে শহরের একপ্রান্তে। মেশিনে জং। চারপাশে আগাছা। আদ্দেক চুরি হয়ে গেছে। সাইনবোর্ড একপাশে ঝুলে পড়েছে। এখন সেখানে শ্মশানের শান্তি। ভোরে পাখি গান গায়, বেলায় গরুর পাল মশমশ করে আগাছা মুড়োয়।'

'বাঃ, ভারি সুন্দর!'

'এইবার আমার মগজে আর এক প্ল্যান এসেছে। এবার আর মানুষ নিয়ে কারবার নয়। গাছ। দেরাদুনে একটা আপেল বাগান কিনছি। পরিকল্পনাটা কেমন?'

'খুব ভাল পরিকল্পনা। অর্চার্ড! গুড আইডিয়া।'

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন। আমার তো কোনও জ্ঞান নেই।'

'নিশ্চয় করব।'

'বাগান তৈরিই আছে। পাঁচ-ছ' ভ্যারাইটির আপেল হয়। তবে সব ব্যবসারই তো একটা ইকনমি আছে।'

'অবশ্যই আছে। নেমে পড়ুন। আমি দেরাদুনে গিয়ে দেখিয়ে দিয়ে আসব। বড় ভালো জায়গা মশাই। সুখে থাকবেন। সুখে থাকবেন।'

কফি এল। চানাচুর এল। বরফি এল। অসীমা এল। ছায়া এল। করুণা আড়ষ্ট। সুশোভন স্বপ্নে। বিপুল ধ্যানে। বীরেন ঘুমে। ধীরে ধীরে রাতের চাকা ঘুরছে।

বিপুল পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'চলে নাকি ?'

'একসময় চেন-স্মোকার ছিলুম। এখন একেবারে মাপা। ওর মা যাবার সময় ওকে আমার গার্জেন করে গেছে। বড় কড়া শাসন মশাই। তার কাছে অনুরোধ চলত, এর কাছে চলে না। একেবারে ডিক্টেটার।'

'আপনি উইডোয়ার !'

'হ্যাঁ। বাপ-বেটি ছাড়া দুনিয়ায় আপাতত আর কেউ নেই।'

ছায়া করুণার পিঠে হাত রেখে বললে, 'ভারি মিষ্টি মেয়েটি। আমার ছেলে থাকলে পুত্রবধূ করতুম।'

করুণা মুখ নিচু করল।

ছায়া বললে, 'আমার মেয়েটা যেন মিলিটারি। যে সত্যি মিলিটারি ছিল, মেজাজে, চালচলনে, তাকেও হারিয়ে দিয়েছে। ওর শাসনে ভটস্থ।'

সুশোভন বললেন, 'আপনার মেয়েকে আমার ভীষণ ভাল লাগল। বেশ পার্সোন্যালিটি আছে। যে হাল, যার হাল ধরবে, ধরবে বেশ শক্ত মুঠোয়। মেয়েরা খুব বেশি মেয়েলি হলে ভাল লাগে না।'

বিপুল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'রাইট মিকশ্চার না হলে ভাল লাগে না।'

'আমরা বীরেনকে একবার তাহলে দেখে যাই ?'

'হ্যাঁ রাত হল, আপনাদের অবশ্য গাড়ি আছে।'

'তা হলেও দিনকাল আর আগের মত নেই।'

বিপুল বসেই রইলেন।

চারজন বীরেনের ঘরে। বীরেন পাশ ফিরে শুয়ে আছে। শ্বাস-

প্রশ্বাসের শান্ত চলন। ভাল লক্ষণ। জ্বর কমছে। করুণা পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বীরেনদা!'

অসীমা বললে, 'ডেকো না। অনেক কষ্টে ঘুমিয়েছে।'

সুশোভন বললেন, 'থাক থাক, বিরক্ত করিস নি।'

করুণা পেছিয়ে এল। তিন-চার হাত তফাতে থমকে রইল। বীরেনের ওপর তার আর কোনও অধিকার নেই। অসীমা বীরেনের কপালে হাত রেখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠাকুরের কৃপায় জ্বর নামছে। অসম্ভব ঘেমেছে। গেঞ্জি পাল্টাতে হবে। তা না হলে ঘাম বসে আর এক কীর্তি হবে!'

কথা বলতে বলতে অসীমা বীরেনের বুক থেকে চাদর নামিয়ে দিল। বীরেন চোখ মেলে ঘরের চারপাশে তাকাল। করুণার সঙ্গে চোখাচোখি হল। করুণা মৃদু হাসল। বীরেন কিন্তু চোখ মুদে ফেলল। সেই মিষ্টি হাসি মধুর হয়ে ফিরে এল না। করুণা বাবার হাতে চাপ দিয়ে বললে, 'চল আমরা যাই!'

'হ্যাঁ, চলো। আমরা তাহলে আসি আজ।'

দরজার সামনে পাইপ মুখে বিপুলবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'দেরাদুনে যাচ্ছেন কবে?'

'দু'এক দিনের মধ্যেই যেতে হবে।'

'চিঠি দেবেন। আমি গিয়ে দিনকয়েক থেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসব। দুই বুড়োতে জমবে ভাল।'

গাড়ির আসনে বসে সুশোভন মেয়েকে বললেন, 'একটা সিগারেটের অনুমতি দিবি!'

'ধরাও।'

'কেমন যেন একটা টেনসান হচ্ছে। ছেলেটা এত ভাল, সৎ, নিরীহ। সবচেয়ে বড় গুণ একেবারে শিশুর মত সরল। ভয় হচ্ছে, কোনও বাঁকা অসুখ করল না তো!'

'সামান্য জ্বরে আদিখ্যেতাটা একবার দেখলে? যেন পোষা পাখি! লোককে দেখাচ্ছে, দ্যাখো আমরা কত উদার, কত মহৎ। দূরকে করেছি নিকট বন্ধু, পরকে করেছি ভাই!'

'না রে না, বীরেন সত্যিই খুব অসুস্থ। মুখ-চোখ কী রকম হয়ে আছে দেখলি? যেন অন্য জগতে চলে গেছে!'

'অভিনয়, অভিনয়। মেয়েদের সেবা নেবার ধান্দা। মাথার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা অমন একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ও ব্যামো জীবনে সারবে না! কোনও দিন সারবে না!'

সুশোভন গাড়ি ছাড়লেন। বড় রাস্তায় পড়ে বললেন, 'যুগ যুগ ধরে সেই এক নারী! একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারে না। ফ্যামিলিটা খুব ভালো। অসীমার মধ্যে একটা বিদেশী-বিদেশী ভাব আছে। কোনও জড়তা নেই। বোল্ড স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড। এদেশে ওইজাতীয় মেয়ে খুব একটা দেখা যায় না।'

'তা হবে। আমরা একটু অন্য রকম।'

'অমনি মেয়ের আমার অভিমান হল! পাগলী, তোর মত মেয়ে লাখে এক মেলে কী না সন্দেহ। কী বন্ধনে যে বেঁধেছিস!'

'থাক, আমাকে আর ভোলাতে হবে না। বাবা—'

'বল।'

'আমার একটা কথা রাখবে?'

'তোর কোন্ কথা আমি রাখি না!'

'আজ আমরা বাড়িতে খাব না।'

'বেশ, কোথায় খাবি বল?'

'সেদিন পার্ক স্ট্রিটে আমরা যে রেস্তোরাঁয় খেয়েছিলুম।'

'কাজিনস! ঠিক হ্যায়। আর্জি মঞ্জুর।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে করুণা পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। হঠাৎ বললে, 'বাবা!'

রাস্তার দিকে চোখ রেখে সুশোভন বললেন, 'বল?'

'কালই চলো না।'

'কোথায়?'

'দেরাদুন।'

'কাল কী করে যাবি মা? টিকিট?'

'কেন, প্লেনে চলো!'

'প্লেন আর ট্রেন কোনওটাতেই চাইলে টিকিট মিলবে না। ঘুরতে

হবে। অপেক্ষা করতে হবে। আমিও তো তাড়াতাড়ি যেতে চাই। দেখি কী হয়!'

কাজিনস। রাতের পার্ক স্ট্রিট। এখনও একটু সায়েবী-সায়েবী। লোক-চলাচল কম। লরির উৎপাত নেই। প্রাইভেট কার আর ট্যাক্সির ছোটাছুটি। কাজিনসের পার্কিং প্লেসে গাড়ি পার্ক করে মেয়ের হাত ধরে সুশোভন ইংরেজ আমলের রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। চ্যাংড়ার ভিড় নেই। বনেদী কলকাতার অবশিষ্ট মানুষেরা এখানে যাওয়া-আসা করে। বৃদ্ধ গোয়ানিজ একজন মাঝেমধ্যে বেহালায় একটু-আধটু করুণ সুর তুলে মন খারাপ করে দেন। এখানে আসা মানে অতীতে বেঁচে ওঠা। সুশোভন যৌবনের গৌরবের দিনে স্ত্রীকে নিয়ে মাঝে মাঝেই আসতেন। তখন আরও বোলবোলা ছিল। বিদেশীদের হাতে তৈরি কেক আর প্যাস্ট্রির আলাদা স্বাদ আর সুবাস ছিল। হলুদের আভাযুক্ত পেঁয়াজের খোলার মত পাতলা কাপে ইংরেজি চা। সেসব দিন কোথায় গেল? হায় অতীত! সেই ঘর, সেই আয়োজন, সেই সময় কোথায়? সেই সব মানুষেরা? করুণা চেয়ারে বসেছে। সুশোভন তাকিয়ে আছেন। ঘাড়ের কাছে দুলছে আলগা খোঁপা। কপালে আটকে আছে চাঁপাফুল রঙের টিপ। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। মেয়ের আর মায়ের চেহারায় অদ্ভুত মিল। অতীত যেন বর্তমানে এসে বসে আছে। মেয়ের দিকে তাকালে বুকে ধাক্কা লাগে, যে নেই সে আছে বলে মনে হয়।

করুণা খেতে খেতে বললে, 'এমন করো যেন আমাদের আর ফিরতে না হয়।'

'দাঁড়া। আগে ওই দিকটা জমে উঠুক, তারপর কলকাতার পাট একেবারে তুলে দোব। তুই তো কিছুই খাচ্ছিস না! খাবার নিয়ে খেলা করছিস!'

'আমি তো খেতে আসিনি বাবা। আমি এই পরিবেশে আসতে চেয়েছি। কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হয়।'

'তা ঠিক। এখানে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি পড়ে আছে। একটা আইসক্রিম বলি তোর জন্যে?'

'বলো। ভ্যানিলা স্ল্যাব।'

'আর একটু ভাল কিছু নে না !'

'না।'

'বি চিয়ারফুল, মাই গার্ল। বুঝেছি তোমার কী হয়েছে। শোনো, জীবন বড় রসিক। সব কিছু ধরা যায় না। যা ভাবা যায় তা হয় না। তবু আমাদের হাসতে হবে। যতদিন দম আছে ততদিন এই ঘড়ি চলবে। কখনও স্লো, কখনও ফাস্ট। চিয়ারআপ, চিয়ারআপ !'

করুণা দেওয়ালে গাঁথা অ্যাকোয়ারিয়ামের দিকে মুখ ঘোরাল। সবুজ জলে সোনালী রুপোলী মাছ খেলছে। খুব চেষ্টা করছে, চোখ দুটো যেন ছলছলে না দেখায়। প্রেম কাকে বলে জানে না, তবে ভাল লাগা আর না-লাগা জীবনের এক অতি সহজ ব্যাপার। জল পড়ে, পাতা নড়ের মত।

রেস্তোরাঁর বাইরে রাত বেশ জমে উঠেছে। আশেপাশে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে ঠাণ্ডার কামড়। অন্ধকার আকাশে মেঘের তৈরি সাদা ভাল্লুক শহর ছুঁই-ছুঁই করে ভেসে চলেছে ময়দানের দিকে। শরৎ এসে গেল। রাজা, তুমি মৃগয়ায় যাবে না ? মনে মনে বলেই সুশোভন হাসলেন। বেঁচে থাকার সুর আর তাল কেটে গেছে। আপেল বাগান ! কোনও বাগানেই আর মন বসবে না।

'পান খাবি করুণা ?'

'খাবো। সেদিন যা যা হয়েছিল, আজও সেই সব হবে। নাই বা রইল একজন, তুমি আর আমি তো আছি !'

শেষের দিকে করুণার গলা ধরে এল। মেয়ের কাঁধে হাত রেখে সুশোভন বললেন, 'তুই অকারণে উতলা হচ্ছিস। বীরেন সুস্থ হলে নিজেই আসবে, ঠিক আসবে। ভালবাসার শৃঙ্খল !

'ও আর ভালই হবে না।'

'তোর যেমন কথা ! আধুনিক যুগে সামান্য জ্বর ভাল হবে না !'

'জ্বর ভাল হবে, তবে ও আর ভাল হবে না।'

সুশোভন গাড়ি ছেড়ে দিলেন। মোড়ের মাথায় একজন টাটকা গোলাপ বিক্রি করছে। লাল টুকটুকে।

করুণা বললে, 'ফুল কেনো।'

একতাড়া ফুল কিনলেন।

'তোমাকে আমি কবে থেকে বলছি, মায়ের ছবিটা বেশ সুন্দরমত সোনালী ফ্রেমে বাঁধাও। আমার একটা কথাও তুমি শোন না।'

'তোর মাও ঠিক একই কথা বলত। কোনও কথাই আমি শুনি না!'

'যাবার আগে বাঁধাবে। এই তো এইখানেই দোকান। দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে নিয়ে যাবে।'

'তাই হবে মা। কালই হবে।'

গ্যারেজের বিশাল দরজা হিড়হিড় করে বন্ধ করতে করতে সুশোভনের মনে হল, জীবনের একটা অধ্যায় সশব্দে শেষ হতে চলেছে। আবার অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে, অন্য ভাবে। শুরু হবে, তবে শেষ কী হবে? বাইরে থেকে বাড়িটার দিকে একবার তাকালেন। দশটা বছর পেছোতে পারলে বারান্দায় একজনকে দেখতে পেতেন। এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করত, কী গো, আজ এত দেরি করলে! সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা-প্রশ্ন হত, করুণা কোথায়?

বারান্দা আছে। আলোও জ্বলছে। কিন্তু সেই ছায়া আজ আর নেই। দীর্ঘ হয়ে লুটিয়ে নেই পথের ওপর। ওই কারখানা এই বাড়ি বেচলেই বেচা যায়। দামও পাওয়া যাবে ভাল। টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। নিষ্কর্মার জীবন ভাল লাগে না।

প্রতিটি ঘরে পর-পর আলো জ্বলে উঠছে। করুণা সব আলো জেলে মনের অন্ধকার কাটাতে চাইছে : পাগলী! বাইরে আলো জেলে কী হবে—ভেতরে আলো জ্বালা! বীরেনকে ঘিরে আমার স্বপ্ন ছিল তোর চেয়ে বেশি। গ্যারেজের বিশাল তালায় চাবি ঘুরিয়ে টেনে পরীক্ষা করলেন। দুটি কড়ার বন্ধনে একটি তালা। অন্ধকারেই হেসে উঠলেন। একটু জোর গলাতেই বললেন, 'তালা, তোর নাম বীরেন। পেতলের শরীর, পেটে বাইশটা লিভার। বর্তুলাকার দুটি শূন্যতায় ঝুলে থাক কিছুকাল। কেউ না কেউ একদিন আসবে। চাবি ঘোরাবে। খুলে যাবে। না, মুক্তি নয়। তখনও তুমি ঝুলবে—হয় এটায়, না-হয় ওটায়। কোন্‌টায়? সে তোমার ভাগ্য জানে।'

বাড়ি-বদল

আমাদের অমন সুন্দর বাড়িটা শেষ পর্যন্ত বিক্রিই হয়ে গেল। যে আরাম-কেদারাটায় আমার ঠাকুরদা বসতেন, সেই কেদারায় বসে আছেন আমার ঠাকুমা। ঠাকুমার অনেক বয়েস হয়েছে। কী সুন্দর দেখতে। আমি এলাহাবাদের গাছপাকা পেয়ারা দেখেছি। আমার ঠাকুমার গায়ের রঙ সেই গাছপাকা পেয়ারার মতো। সব দাঁত পড়ে গেছে। মুখটা তাই একেবারে শিশুর মতো। চোখ দুটো এখনও খুব উজ্জ্বল। যেন দুটো প্রদীপ জ্বলছে। ঠাকুমার হাসি ফোটে চোখে। প্রথমে চোখ দুটো হেসে ওঠে। আমাদের সিদ্ধেশ্বরী-তলায় পুরোহিত মশাই যে চামরটা দুলিয়ে মায়ের আরতি করেন, আমার ঠাকুমার চুলগুলো ঠিক সেইরকম। ভোরের আলোয় নাইলনের সুতোর মতো চিকচিক করে। আমাদের এই বাড়ির ছাদে সুন্দর একটা ঠাকুর-ঘর আছে। একেবারে ঝকঝকে। লাল টকটকে মেঝে। বেদি। বেদির ওপর ঝকঝকে সব দেবদেবী। পেতলের, পাথরের। ঠাকুমা রোজ সকালে ধবধবে সাদা কম্বলের আসনে বসে পুজো করেন। আমি সেই সময়টায় প্রসাদের লোভে ঘুরঘুর করি। ঝকঝকে পেতলের সাজিতে নানা রঙের ফুল, বেলপাতা। থালায় সাজানো প্রসাদ। ধরানো ধুপের গন্ধ। পিলসুজে চকচকে প্রদীপে নিখুঁত শিখা। ঠাকুমার আঙুলে ঘুরছে স্ফটিকের জপের মালা। ছাদে প্রথম-সকালের হলুদ রোদ। আমাদের পেছনের বাগানের বিশাল বেলগাছ। গোলগোল বেল ঝুলে আছে। কতক কাঁচপাতা, কতক পুরনোপাতা। আবার নতুন বেলকুঁড়ি এসেছে। দু'ডালে দুটো পাখির বাসা। আবার একটা মৌচাক হয়েছে। বেলগাছে নতুনপাতা এলে ঠাকুমার ভীষণ আনন্দ হয়। শিবের মাথায় চড়াবেন মনের আনন্দে। উত্তরদিকে জোড়হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বলেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ'। ওই দিকে নাকি কাশী। ঠাকুমা জীবনে সাতবার কাশী গিয়েছেন। আমি একবারও কাশী যাইনি। ঠাকুমার মুখে গল্প শুনে শুনে আমার যাওয়া হয়ে গেছে। আমি দশাশ্বমেধ ঘাট দেখতে পাই। হরিশ্চন্দ্র

ঘাট। গোধুলিয়া। রোজ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের এই গল্পের আসর বসে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমার ঠাকুমার মতো গল্প কেউ বলতে পারবেন না। আমার মা তো হঠাৎ মারা গেলেন। মায়ের যেমন কাণ্ড। বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে মারা গেলেন। কোনও মানে হয়! আমি মা বলে যতই ডাকি, এখন আর কে সাড়া দেবে! সবাই বলে, ওই অনেক উঁচুতে, আকাশের ওপারে একজন বড়মা আছেন। তাতে আমার কী হল। ওসব ছেলে-ভোলানো কথা। সেই মাকে তো আর শীতের রাতে লেপের তলায় হালুমমালুম করে জড়িয়ে ধরে শুতে পারবো না। সেই মা তো আর পান খেয়ে ঠোঁট উলটে উলটে আমাকে বলতে পারবে না, 'দেখ তো শুভো, ঠোঁট দুটো ঠিক লাল হয়েছে কি না!' যাক সে আর কী হবে! যার যেমন হয়! ভগবান তো সব বোঝেন, তাই আমাকে মায়ের বদলে ঠাকুমা দিয়েছেন। ক'জনের এমন সুন্দর ঠাকুমা আছে। ঠাকুমার মুখে সব সময় কর্পূরের মতো একটা গন্ধ লেগে থাকে। ঠাকুমার শরীরটা যেন ঘষা চন্দন। দুধের মতো সাদা ধবধবে কাপড়। আমার বাবার ভাগ্যটা কী ভালো, এমন যাঁর মা! অবশ্য আমার মা-ও খুব ভালো ছিলেন। আমি বলতুম, 'মা, তুমি মা দুর্গার মতো, না মা দুর্গা তোমার মতো। মা অমনি আমার গাল দুটো ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিতেন। যখন খুব দুপুর। রোদ একেবারে খাঁখাঁ করছে। গাছপালা সব ঝিম মেরে যায়। ছায়ায় বসে হলুদ ঠোঁট ফাঁক করে শালিক ভাবে, একটা সরবত পেলে বেশ হত, সেই সময় আমার ঠাকুমা উত্তরের বারান্দায় বসে একটু একটু কাঁদেন। আমি জিজ্ঞেস করি, 'ঠাম্মা, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে?' ঠাকুমা বলেন, 'শোন, অনেক—অনেক দিন বাঁচলে মানুষের ভেতর অনেক জল জমে, বর্ষার ডোবার মতো। সেই জল গরমের দুপুরে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে টসটস করে।'

'তুমি কার জন্যে কাঁদছ বলো?'

'তিন জনের জন্যে। আমার স্বামীর জন্যে, মানে তোর ঠাকুরদা। আমার বড় ছেলেটার জন্যে, তোর জ্যাঠামশাই। আর কাঁদি তোর মায়ের জন্যে। অত দেখেশুনে মেয়েটাকে নিয়ে এলুম, ছেলের বউ করে, সেই কোন কাশী থেকে। বোকা মেয়ে মরে গেল। কোনও মানে হয়। আমি বুড়ি, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে; আমি রইলুম

বেঁচে, আর তুই বেটি মরে গেলি কাপুরুষের মতো।'

মায়ের জন্যে ঠাকুমা কাঁদুক। আমি কাঁদবো না। মারা যাবার সময় মায়ের একবারও মনে হল না আমার কথা। আমাকে না বলে চলে গেল। আমি জানি, কোথাও না কোথাও মাকে রেলগাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছে। মা চুপ করে বসে আছে প্ল্যাটফর্মে বকুলগাছের তলায়। আমিও তো একদিন ওই পথ দিয়ে যাব। মেনলাইনের গাড়িতে। তখন জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলবো, 'কি গো মা! খুব তো আগে আগে এলে?'

মা অমনি 'শুভো' বলে ট্রেনটাকে ধরার জন্যে ছুটতে থাকবে। চেন টেনে ট্রেনটাকে থামাবো কি থামাবো না, সে কথা এখনই আমি বলতে পারছি না। সে যদি আমার রাগ কমে যায় তখন দেখা যাবে। আমি কাঁদি না। যে আমার কথা ভাবলো না, আমি তার কথা ভাবতে যাব কেন! ঠাম্মাটা কায়োয়ার্ড। ঠাকুমা বলল, 'তোর চোখেও জল ভাই!' সে অন্য কারণে। চশমা নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুমা বসে আছেন সেই চেয়ারটায় যে-চেয়ারে আমার বাবা কোনও দিন বসেন না। বলেন, ওই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমি অর্জন করিনি। ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বাল্বে একটা ঘষা কাঁচের গোল, সাদা ডোম পরানো। ঠাকুমার ফর্সা মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে: উল্টোদিকের দেয়ালে আমাদের সেই বিশাল ঘড়িটা, যার এত বড় একটা পেণ্ডুলাম, খুব ধীরে ধীরে সারাদিন শুধু দোল খায়। আর সময় হলেই গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, দশটা বাজল, এগারোটা বাজল।

আমার মা বেঁচে থাকলে এই সময় আমার ঠাকুমার পায়ের কাছে বসে থাকতো। ঠাকুমার কাছে মায়ের আবার খুব আদর ছিল। ঠাকুমার হাঁটুতে মায়ের মাথাটা শুয়ে থাকতো। মায়ের কী চুল ছিল! এই এতখানি একটা খোঁপা। কালো কুচকুচ। ঠাকুমা আবার মাকে বলে বলে দিতেন, বউমা, তুমি আজ বিকেলে এই শাড়িটা পরো। লাল ডুরে। নীল ফুল ছাপ। ঠাকুমা গল্প করতে করতে মায়ের মাথা থাবড়াতেন। যেন বাচ্চা মেয়েকে ঘুম পাড়াচ্ছেন। মায়ের কানে ছিল পাথর বসানো লম্বা লম্বা দুল। একটা কানের দুল দুলতো। আলো পড়ে পাথরগুলো চিকচিক করে উঠত। আজ আমার মা কোথায়!

আকাশে। অমন সুন্দর আমার মা, মরে যেতে একটু দুঃখ হল না। কেমন গল্পটল্প করে গিয়ে শুলো। কত হাসি! আবার বলা হল, এবারের পুজোয় আমরা সব দক্ষিণ ভারতে যাব। ওমা, সকালে মা আর নেই। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে। সেই ঘুম আর ভাঙল না। সবাই বললে, এই তো জীবন! আজ আছে কাল নেই ভাই। যে যাই বলুক, আমি সেই দিনটা জীবনে ভুলবো না। মা যেখানে গেছে, সেখানে আমিও তো একদিন যাব। চাঁদের আলোর শাড়ি পরে মা দেখবো বসে আছে স্বর্গের গাছের তলায়। আমি কিন্তু একটাও কথা বলব না। যেন চিনিই না! কে না কে? আমারও অভিমান আছে।

ঠাকুমা বাবাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুই খুব ভেঙে পড়েছিস?'

বাবা বসেছিলেন খাটে। মা চলে যাবার পর থেকেই বাবার চেহারা খারাপ হতে শুরু করেছে। আজ যেন ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে। চুল আরও পেকে গেছে। মুখের রঙটা কালচে হয়ে গেছে। চোখ দুটো দুটো ঢুকে গেছে গর্তে। ব্যবসা যখন করতে জানে না, কেন যে করতে গেল। বড়লোক হবে। সুমন্তবাবুর মতো বিশাল একটা কারখানা। বারাসাতে বাগানবাড়ি। ঠাকুমা বলেন, তোতে আর তোর বাবাতে তো আমি কোনো তফাৎ দেখি না। একজনের দেহটা বড় আর একজনের দেহটা ছোট। দু'জনের মন তো সমান।

বাবা ব্যবসা করবে কী—, রাত্তিরে আমার সঙ্গে যা-সব কথা হত! শুনলে আমারই হাসি পেত। আমি হাসতুম না, বাবা দুঃখ পাবে বলে। শুয়ে শুয়ে বাবা বলত, গঙ্গার ধারে চল্লিশ বিঘের মতো জমি কিনব। সে যেখানেই হোক, আর তাজমহলের মতো ছোট মাপের একটা বাড়ি তৈরি করব। রোজ ভোরবেলা সেখানে সানাই বাজবে। বাগান মানে কী? একেবারে ছবির মতো। মনোরম সুন্দর। সেই বাগানে হরিণ থাকবে। পঞ্চাশটা খরগোস থাকবে, সাদা, কালো, বাদামি। পাখি থাকবে, অন্তত একশোটা! ভেতরে একটা সরোবরও থাকবে, মাঝখানে মার্বেল পাথরটাথর দেওয়া, চূড়ামতো একটা জলটুঙ্গি। সেইখানে যাবার জন্যে তৈরি হবে একটা সাঁকো। বিশাল বিশাল রাজহাঁস হলুদ হলুদ ঠোঁট নিয়ে রাজার মতো ঘুরবে প্যাঁক প্যাঁক করে। চিড়িয়াখানায় সেবার শীতকালে গিয়ে আমরা যা যা দেখেছি, আমাদের বাগানটা ঠিক সেইরকম হবে।

ঠাকুমা বললেন, 'শোন খোকা, কত্তা আমাকে প্রায়ই বলতেন, শোনো, জীবনে সবকিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখবে। কভি আঁধেরা, কভি উজালা। এই সোনার থালা, এই শালপাতা। ভেঙে পড়ছিস কেন?'

'তুমি তো বলছ, ভেঙে পড়ছিস কেন? কাল রাত্তিরে কি বিশ্রী স্বপ্ন দেখলুম জানো! বাবা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। এক মুখ দাড়ি। সেই বড় বড় সাধুর মতো চোখ। বাবা বলছেন, কুলাঙ্গার, সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলি। রাখতে পারলি না, ইডিয়েট।'

'কত্তা অমন কথা কখনও বলতে পারেন না। ওটা তোমারই মন।'

'আমি স্পষ্ট দেখলুম। ভোরের স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন স্বপ্নই, সে তুই ভোরেই দেখিস আর প্রথম রাতেই দেখিস।'

'আচ্ছা মা, তোমার কেন মন খারাপ হচ্ছে না। আমার তো মরে যেতে ইচ্ছে করছে। উঃ, এত সুন্দর বাড়ি, বাগান। তুমি দেখেছ, উমা যে কলমের পেয়ারা গাছটা বসিয়ে গিয়েছিল, কী রকম ফল ধরেছে। কী কাণ্ড জানো, দুপুরবেলা ইয়া বড় বড় দুটো টিয়াপাখি এসে কাঁউ কাঁউ করে পাকা পেয়ারা খাচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে পাখি দুটোকে! কী গলা? আমি জানো, ভালো মনেই বললুম, খা খা, প্রাণ খুলে খা। ও মা চ্যাঁচ্যাঁ করে তিন বার ডেকে পোঁপোঁ করে উড়ে পালাল। কেন বলো তো? খাও খাও না বলে খা বলেছি বলে মানসম্মানে লেগে গেল বাবুদের, তাই না মা? টিয়া কোথা থেকে এলো বলো তো। উঃ, উমা থাকলে আনন্দে লাফাতো।'

'বউমা ছিল এ বাড়ির লক্ষ্মী। সে যাবার পর থেকেই সংসারটা কেমন যেন হয়ে গেল!'

'তুমিও তো মা এ বাড়ির লক্ষ্মী ছিলে!'

'সে যতদিন কত্তা ছিল। তার বরাতেই সব হয়েছিল। আমার শুধু নামটাই হত। কার বরাতে কে খায়!'

'মা, তোমার কী মনে হয়! আমি আবার উঠতে পারব?'

নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো।'

'তুমি একটু আশীর্বাদ করো না মা। আমার বুকটা যে ভীষণ খালি লাগছে মা।'

'আমি তো সব সময় ভগবানকে বলছি।'

আমার জীবনে একটাও কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে না। হঠাৎ কেউ এসে বলতে পারত, এই নাও টাকা, বাড়িটা তোমাকে আর বেচতে হবে না।'

'অলৌকিকে বিশ্বাস করো না। নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

'দেনাটেনা মিটিয়ে হাজার পঞ্চাশ থাকতে পারে।'

'সেই পঞ্চাশ হাজার নিয়ে আবার শুরু করো। কত্তার মুখে শুনেছি, তিনি জীবনে তিন বার দেউলে হয়েছিলেন, শেষবার পকেটে ছিল মাত্র পনের আনা।'

'মা, আমি কেবল তোমার কথা ভাবছি। শেষটা তোমার খুব কষ্ট হয়ে যাবে মা।'

বাবা খাট ছেড়ে তড়াক করে উঠে পড়লেন। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায়। মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। দুঃখ আর আনন্দ দুটোতেই বাবার চোখে জল এসে যায়। এ বছর আমি পরীক্ষায় প্রথম হলুম। বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চোখে জল। বললেন, আনন্দাশ্রু।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ঠাকুমার সামনে এসে মাথা পেতে দিয়ে বললেন, 'একটু আশীর্বাদ করো তো যাতে আমি বীর যোদ্ধা হতে পারি। জীবন মানেই তো সংগ্রাম. কি বলো মা!'

বাবা বেপাড়ায় একটা দু কামরার ঘর নিয়েছেন। আমরা সেই বাড়িটা দেখে এলুম। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এই বাড়ি আর সেই বাড়ি। সেটা যেন দেশলাইয়ের বাক্স। পুরনো-পুরনো, নোনাধরা দেয়াল। আলো কম, বাতাস কম। জায়গা কম। স্যাঁতসেঁতে গন্ধ।

ঠাকুমা কিন্তু খুব খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ, এ একেবারে কাশীর বাড়ি। এখানে পুজোপাঠ বেশ ভালোই হবে। এই ছোট বারান্দায় একটা টবে তুলসী গাছ লাগাব। তুলসী আর গঙ্গাজল। এর চেয়ে ভালো পুজো আর কিসে হয়!'

বাবার মন ভরল না। বললেন. 'শুধু তুলসী মা? আর কিছু করা যাবে না এখানে?'

'এই অল্প একটু জায়গায় আর কী হবে! একটা জবাগাছ করে

দেখা যেতে পারে। গেরুয়া জবা।'

খুব খুশি হয়ে বাবা বললেন. 'বাঃ, জবা আর তুলসী। দুই মেয়ে।'

আমাদের অত বড় বাগান। ছাদে চল্লিশটা ফুল-গাছের টব। বাবা তুলসীর পাশে জবা পেয়ে এখন কি সন্তুষ্ট! আমাদের বাড়িতে তিনটে বাথরুম ছিল। এই বাড়িতে ছোটমতো একটা। আমার খুঁতখুঁতুনি শুনে ঠাকুমা বললেন, 'একটা বাড়িতে বাথরুম যত কম থাকে ততই ভালো। শরীর ভালো থাকে। সেকালের বাড়িতে বাথরুম করা হত বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে।' ঠাকুমা হাসতে লাগলেন।

আমরা মন খারাপ করে ফিরে এলুম। বাবার মুখে কোনও কথা নেই। মাথা নিচু করে বসে আছেন। আজ তিন দিন হল, খাবার থালায় বসছেন আর উঠছেন। আমার মন খারাপ হলেও, বিছানায় শুলেই ঘুম। ঘুম আসার আগে কেবল মনে হয়, এই সুন্দর ঘরে, সুন্দর খাটে খোলা জানলার ধারে আর ক'দিনই বা শুতে পারবো। দিন তো এগিয়েই আসছে। এ-বছর আর এ-বাড়ি থেকে দুর্গাপুজো দেখা হবে না। পাশের মাঠে কেমন ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। কত গান বাজবে, আমরা আর শুনতে পাব না। আমরা এখন যেখানে যাব, তার ধারে কাছে কোথাও পুজো নেই। আমার পাশে শুয়ে আছেন ঠাকুমা। চিৎ হয়ে। ধবধবে বুকের ওপর দুটো হাত জোড় হয়ে আছে। আমি জানি ঠাকুমা একনাগাড়ে জপ করে যাচ্ছেন। আজ আবার খুব চাঁদ উঠেছে। ফটফটে চাঁদের আলো বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। নীল আকাশে ছেঁড়া রুমালের মতো টুকরো টুকরো মেঘ। মা দুর্গার চিঠি, আমি যাচ্ছি। তোমরা সব সাজাও। ম্যারাপ বাঁধো। বাবা পাশের ঘরে খুটুর খুটুর করছেন। কী করছেন কে জানে! আমি বলেছিলুম, বাবা. সাহায্য করবো? বাবা বললেন, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। আমার মনে খুব লেগেছে। আমি তো বাবার পাশে থাকতে চাই। বাবাকে সাহায্য করতে চাই। আমি তো একবারও বলিনি, বাবা, তুমি যখন ব্যবসা করতে জানো না, তখন ব্যবসা করতে গেলে কেন? ঠাকুমা তো মন খারাপ করে চোখের জল ফেলেননি। বরং উলটোটাই হয়েছে। আগে এত হাসতেন না,

এখন কথায় কথায় হাসেন। আমাদের বাতাবি লেবুর গাছে, চ্যাঁচ্যাঁ করে সেই লক্ষ্মী প্যাঁচাটা ডেকে উঠল। ঠাকুমা বলেন, যে-বাড়িতে লক্ষ্মী প্যাঁচা থাকে সে-বাড়ির খুব ভালো হয়। ধ্যাৎ! আজকাল আর কিছু মেলে না। ওই তো সুবীরকাকু! মায়ের হাত দেখে বললেন, তুমি অনেক বছর বাঁচবে। তোমার এই বাড়িটা ছাড়া, আরও একটা বাড়ি হবে। মা তো গেলেনই, বাড়িটাও চলে গেল। পরপর তিনটে হাই উঠল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম, নরম বিছানায়, চাঁদের আলোয়।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভেবেছিলুম ভোর হল বুঝি। আকাশে এতটুকু অন্ধকার নেই। সাদা। না, ভোর তো হয়নি। দেয়ালঘড়ি তখনই বাজল দুবার। রাত দুটো। সেই প্যাঁচাটা ভীষণ জোরে খচরমচর করে ডেকে উঠল। বিছানায় আমার পাশে ঠাকুমা নেই। ঠাকুমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেই আমার শোওয়া অভ্যাস। তাই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এমন তো কোনও দিন হয় না। আমি বিছানা থেকে নেমে এলুম। লাল, ঝকঝকে মেঝেতে চাঁদের আলো গড়াচ্ছে। কী সুন্দর। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। আমার মা এমন চাঁদের আলোর রাতে একটা গান গাইতেন—নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। সেই সুরটা যেন ভেসে এল বহু দূর থেকে। মা কি কোথাও বসে গান গাইছেন! আমি ঘরের বাইরে এলুম। দোতলার চওড়া বারান্দা, এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে চলে গেছে। পাশের ঘরে বাবা। বাবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তার পাশের ঘরের দরজা হাট-খোলা। আলোর একটা চাপা আভা বেরিয়ে আসছে। ওপাশের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে ঘরে। মেঝে থেকে ঠিকরে বাইরে চলে এসেছে। আমি ভয়ে ভয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই ঘরটা ছিল আমার ঠাকুরদার। যেমন ছিল ঠিক সেইরকমই আছে। খাট! খাটের ওপর সুন্দর একটা চাদর ঢাকা পুরু বিছানা। বালিশের থাক। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে রাখা ঠাকুরদার একটা বড় ছবি। খাটের চারপাশে ঝালর ঝুলছে। দরজার সামনে দাঁড়াতেই নাকে এলো ধূপের গন্ধ। খাটের সামনে মেঝেতে ঠাকুমা বসে আছেন সোজা হয়ে। আমি ঘরে ঠাকুমার পাশে চুপটি করে বসলুম। ঠাকুমার একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল।

ধরা-ধরা গলায় ঠাকুমা বললেন, 'কি রে, উঠে এলি !'

'তুমি কখন উঠে এলে ঠাম্মা ?'

'যেই দেখলুম তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস।' ঠাকুমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

'তুমি কাঁদছ ঠাম্মা ?'

'এই সময় একটু কাঁদতে ভাল লাগে ভাই। সারাদিন তো সময় পাই না! কতজন আমাকে ছেড়ে চলে গেল, তাদের আর আমি কী দিতে পারি বল চোখের জল ছাড়া, আর বেশি তো তারা কিছু নেবেও না।' ঠাকুমার কোলে মাথা গুঁজে আমিও কেঁদে ফেললুম। আমি শুনতে পাচ্ছি, কোথাও বসে আমার মা গাইছেন, নীল আকাশে চাঁদের আলোর গান।

'তুই কেন কাঁদছিস ভাই ?'

'আমার মাকে জল দিচ্ছি।'

ঠাকুমা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'কাঁদ, কাঁদ। এই সময় রাতও কাঁদে শিশিরে। সায়েববাগানের কবরে গেলে দেখবি, মার্বেল পাথরে মিহি হয়ে জমে আছে জল। জানিস তো, রাতের কান্না ভোরের ফুল হয়ে ফোটে।' অনেকক্ষণ ওইভাবে থাকার পর ঠাকুমা বললেন, 'চল ভাই, সারা বাড়িটা আমরা শেষবারের মতো দেখে নিই ভাল করে। আশ মিটিয়ে।'

আমরা ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। ঠাকুমা দেয়ালে দেয়ালে হাত বোলালেন। এ দেয়ালে, ও দেয়ালে কত ছবি। সেই সব ছবির সামনে দাঁড়ালেন। আলো জ্বালতে চেয়েছিলুম। বাধা দিলেন। বললেন, 'রাত এখন ঘুমোচ্ছে। চোখে আলো লেগে যাবে।' সব ঘরেই আজ চাঁদের আলো ধুনোর ধোঁয়ার মতো ভাসছে। সেই আভায়, অস্পষ্ট হলেও ছবিগুলো চেনা যায়। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায়, তাই আমরা দুজনে চোরের মতো পা টিপে টিপে সারা বাড়িটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। এই দোতলার একটা ঘর খুব বড়। সেই ঘরটাকে আমরা বলি হলঘর। ওই ঘরে আমার ঠাকুরদার অনেক বই সুন্দর করে সাজানো আছে! জানালার কাছে সেই পুরনো আমলের মেহগিনি কাঠের একটা সুন্দর লেখার টেবিল, একটা সুন্দর গদি-আঁটা চেয়ার। বড় একটা টেবিল ল্যাম্প। এই চেয়ারে বসে

আমার ঠাকুরদা অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন। ঠাকুমা টেবিলটায় হাত বোলালেন। আঁচল দিয়ে গোটা টেবিলটা একবার মুছলেন। এই ঘরে একসময় বড় বড় গানের আসর হয়েছে। বিয়ের পর বউভাতের দিন আমার মা এই ঘরে সেজেগুজে সিংহাসনের মতো একটা চেয়ারে বসেছিলেন। আমার অন্নপ্রাশনের দিন এই ঘরটা শেষবারের মতো সেজেছিল সুন্দর করে। ঠাকুমা সেই-সব দিনের কথা বলতে লাগলেন, যেন চোখের সামনে সব কিছু ঘটছে আর-একবার। এরপর আর কোনও আনন্দের উৎসব হয়নি। সবই দুঃখের। ঠাকুরদার শ্রাদ্ধ। মায়েব শ্রাদ্ধ। ঠাকুমা ধরা-ধরা গলায় বললেন 'ভেবেছিলুম আমার শ্রাদ্ধে শেষ হবে দুঃখের ইতিহাস! তা আব হল না। অখণ্ড পরমায়ু আমার। বটগাছের মতো।'

উল্টোদিকের জানালার কাচে চাঁদের নিয়ন লাইট। সেই আলোয় ঠাকুমার মুখটা মোমের মতো। জলের ফোঁটা চোখের কোলে এসে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে টস করে গড়িয়ে নামছে বড় একদানা মুক্তোর মতো। টেবিলের ওপর ফটো ফ্রেমে ঠাকুরদার আর একটা ছবি। সেই ছবিটি সাদা আঁচল দিযে মুছতে মুছতে ঠাকুমা বললেন, 'এইবার তুমি কোথায় যাবে।' ঠাকুমা হঠাৎ হেসে উঠলেন, 'যাবে কি? তুমি তো চলেই গেছ। তোমাকে রাখি কোথায়, তুমি আমার বুকেই থাকো।' ঠাকুমা বললেন ওই একটি মাত্র জায়গা, বুক। বুক থেকে নামা, আবার বুকেই উঠে আসা। বুক দিয়ে আগলানো। বুক খুলে ছেড়ে দেওযা।'

দেখতে দেখতে জানালার কাচের সেই নরম রুপোলি আলোর চেহারা পাল্টে গেল। দোয়েল শিস দিচ্ছে বাগানের গাছে। ঠাকুমা চমকে উঠে বললেন, 'চল, চল, পালিয়ে চল। দিন এসে গেছে রে। দিনের পৃথিবীতে হাসবি আর রাতের পৃথিবীতে কাঁদবি।'

আমি এখনও সেই দৃশ্য দেখতে পাই, ভোরের বারান্দা দিয়ে আমরা দু'জনে পালাচ্ছি। ঠাকুমা তাঁর হাতের নরম মুঠোয় আমার নরম হাত ধরে আছেন। সেই হাতও খুলে গেল একদিন। অদৃশ্য বালার মতো স্পর্শটা ঝুলে আছে।

———